তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ১৮
রকিব হাসান
Banglapdf.net
সেবা
প্রকাশনী
কিশোর থ্রিলার

ভলিউম-১৮

তিন গোয়েন্দা

৬৪, ৬৫, ৬৬

রকিব হাসান
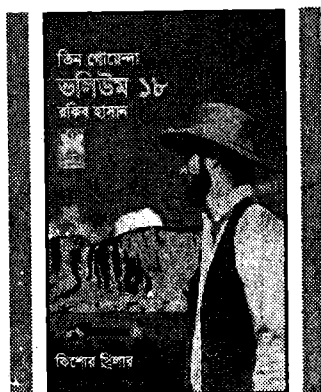
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1279-8
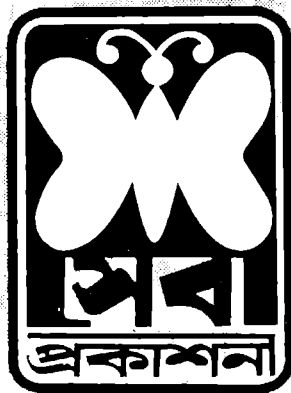
আটষট্টি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.cor

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-18
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল) ৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল) ৬১/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো) ৬৫/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া) ৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন) ৭১/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ) ৭২/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড) ৬৮/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা) ৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৬৫/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৫৫/-

তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব)
তি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)
তি. গো. ভ. ৮১ (কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২ (বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩ (খনিতে বিপদ!+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪ (মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+শুঁটকি রাজকুমার) ৪১/-

খাবারে বিষ

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৯২

রকি বীচ মেমোরিয়াল হসপিটালের আউটডোর পার্কিঙের কাছে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। গাড়ির অভাবে অনেক কষ্ট করেছে। তাই কিনে ফেলেছে আরেকটা। অবশ্যই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এবং পুরানো মডেল। একাশি মডেলের শিরোকো। গোঁ গোঁ করে দু'বার গর্জে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপার দুটো চলতে চলতে থেমে গেল মাঝপথে।

'খাইছে!' বলল সে, 'বৃষ্টি যা হচ্ছে না!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পাশে বসা কিশোর পাশা।

শুধু বৃষ্টি না, ঝড়ো বাতাসও বইছে। ঝমঝম ঝমঝম অবিরত উইণ্ডশীল্ডে আঘাত হেনে চলেছে বড় বড় ফোঁটা। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা। বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

'থামবে না। এরই মধ্যে বেরোতে হবে,' মুসা বলল। 'ভিজিটিং আওয়ারও শেষ হয়ে আসছে।'

ফারিহাকে দেখতে এসেছে ওরা। একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। ইদানীং ওর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠছে মুসার।

চুপ করে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

'কি হলো, নাম না। ফারিহা অপেক্ষা করছে।'

'করুক। বৃষ্টি যে হচ্ছে সেটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছে।' কার ওপর বিরক্ত হয়েছে কিশোর, বোঝা গেল না। সীটবেল্ট খুলল।

'আসলে মেয়েদেরকে তুমি দেখতে পারো না।'

'কথাটা ঠিক না, মুসা। তবে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান শুরু করে যখন, তখন আর ভাল্লাগে না। আর যখন কোন ব্যাপারে অহেতুক চাপাচাপি শুরু করে, না বুঝে।'

হেসে উঠল মুসা। 'জিনার সামনে বলে দেখ এসব কথা···'

'বললে কি হবে? খেয়ে ফেলবে নাকি?'

জবাব দিল না মুসা। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। উইণ্ডব্রেকারের হুড তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। মাথা নিচু করে দিল দৌড়। কিশোরও বেরোল। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে মুসার পিছু নিল।

বারান্দায় উঠে উইণ্ডব্রেকার খুলে ঝেড়ে পানি ফেলল। তারপর ভাঁজ করে হাতে নিয়ে রওনা হলো রুম নম্বর ১১১১-এর দিকে।

ঢুকে দেখল বিছানায় শুয়ে আছে ফারিহা ডিকটার। ফোনে কথা বলছে। এক

আঙুলে বার বার পেঁচাচ্ছে কোঁকড়া চুল। টিভি অন করা। মিউজিক শো চলছে। দেখে মনেই হয় না, মাত্র তিনদিন আগে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হয়েছে তার।

রকি বীচ হাই স্কুলে হাসিখুশি মিশুক মেয়ে বলে সুনাম আছে ফারিহার। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ করেই মনে হয়েছে তার, মুসা খুব ভাল ছেলে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা চলে।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে ফোনে বলল ফারিহা, 'আজ রাখি, শেলি। মুসা আর কিশোর এসেছে…কি বললে?… কিশোর?…জানি না।'

নিজের নাম শুনে শূন্য দৃষ্টিতে একবার ফারিহার দিকে তাকিয়েই আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল কিশোর।

'ও তো সব সময়ই মেয়েদেরকে এড়িয়ে চলে,' ফারিহা বলল। 'আচ্ছা, দেখি জিজ্ঞেস করে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শেলি কথা বলতে চায়। বলবে?'

ঢোক গিলল কিশোর। যত জটিল রহস্যই হোক, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যতই বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে, অভিজ্ঞ হচ্ছে, ততই যেন মেয়েদেরকে আরও বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছে ওর। ওদের কোন কিছুই যেন বোঝা যায় না। 'না' বলতে পারলেই খুশি হত কিশোর, তবু এভাবে মুখের ওপর না বলে দেয়াটা অভদ্রতা। তাই হাত বাড়াল, 'দাও।'

রিসিভার কানে ঠেকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'হালো। কিশোর পাশা বলছি।'

খিলখিল করে হাসল শেলি। 'ঘাবড়ে গেছ মনে হয়? তারপর? চলছে কেমন?'

'এই তো শুরু হলো ফালতু কথা!' মনে মনে বলল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কি চলছে?'

'বোকা নাকি? কেমন আছ জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পারছ না?'

'তাহলে কেমন আছি, সেটা সোজা করে জিজ্ঞেস করলেই হয়।'

'আ মর, জ্বালা! তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি…'

'তাহলে বলো কেন?'

হাসতে আরম্ভ করেছে মুসা আর ফারিহা। জানে, এরকমই একটা কিছু ঘটবে।

'বলি কেন? এটা একটা কথা হলো…'

ঘামতে শুরু করেছে কিশোর। ঠিক এই সময় লাল চুলওয়ালা একজন নার্স উঁকি দিয়ে বলল, ভিজিটিং আওয়ার শেষ। বেরিয়ে যেতে হবে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন কিশোর। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ফিরিয়ে দিল ফারিহার হাতে। ফারিহা বলল, 'শেলি, পরে কথা বলব। এখন রাখি…'

বলেই চলে গেছে নার্স। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দু'জন আর্দালী আর দু'জন নার্স একটা চাকাওয়ালা বেড ঠেলতে ঠেলতে ঢুকল। সঙ্গে ঢুকলেন একজন ডাক্তার। লাফিয়ে সরে গেল কিশোর।

বেডটাতে একজন রোগী। একটা মেয়ে। কিশোরদেরই বয়েসী হবে। কালো কোঁকড়া চুল। সুন্দর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জখম আছে। ব্যাণ্ডেজ লাগানো।

'ফারিহা,' ডাক্তার বললেন। 'তোমার নতুন রুমমেট।' রোগীকে ফারিহার পাশের বিছানাটায় শোয়াতে নার্সদের সাহায্য করলেন তিনি। বেহুঁশ হয়ে আছে রোগী।

'বেশি অসুস্থ?' ফারিহা জানতে চাইল।

'ওর জখমগুলো সুপারফিশিয়াল মনে হচ্ছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, কনকাশন আর মাইন্ড শক থেকে সেরে উঠছে।'

হাঁ হয়ে গেছেন ডাক্তার। অবাক হাসি ফুটল মুখে। 'ডাক্তারি পড়ছ নাকি?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তবে অবসর সময়ে যে কোন বই হাতের কাছে পেলে পড়ে ফেলি।'

নার্সেরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটার হাতে স্যালাইনের সুচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্যালাইনের সঙ্গে আরও নানারকম ওষুধ মিশিয়ে দিতে লাগল। কাজ শেষ করে সরে দাঁড়াল। চার্টে নোট লিখে দিতে লাগলেন ডাক্তার।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছে,' ডাক্তার জানালেন। 'কাউন্টিলাইন ড্রাইভে। ও কিছু না। এ রকম রাতে অ্যাক্সিডেন্ট করবেই। দিনের বেলাতেই করে বসে, যে ভাবে বেপরোয়া চালায় আজ কালকার...'

ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার দরজায় উঁকি দিল লাল চুলওয়ালা সেই নার্স। কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'যাওনি এখনও! বললাম না ভিজিটিং আওয়ার শেষ!'

'শুনেছি তো,' বিরক্ত হয়েই বলল মুসা।

'তাহলে যাচ্ছ না কেন? দারোয়ানকে খবর দেব?'

ফারিহার দিকে তাকাল মুসা। 'চলি, ফারিহা। কাল আবার আসব। রাতে ইচ্ছে করলে ফোন কোরো। কিশোরদের বাড়িতেই থাকছি আজ।'

নার্সের দিকেও নজর নেই কিশোরের, মুসা আর ফারিহার দিকেও না। সে তাকিয়ে রয়েছে নতুন রোগীর দিকে।

'অ্যাই, এসো,' ডাকল মুসা। 'কি দেখছ?'

'চার্টে নাম লিখে গেছেন ডাক্তার। জুন লারসেন। কে ও?'

'আমি কি জানি? চলো। ওই নার্সটা যদি এসে দেখে এখনও যাইনি...'

'চলো।'

মেয়েটা কে মিনিটখানেক পরেই জেনে গেল দু'জনে। এলিভেটরের দিকে চলেছে। এই সময় বিশালদেহী একজন মানুষ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ওটার ভেতর থেকে। ছুটে গেলেন নার্সরা যেখানে বসে সেদিকে। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন লাল চুলওয়ালা নার্সের ডেস্কের সামনে। মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়ে কোথায়? কোন ঘরে?'

'আরে এ তো হার্বার্ট লারসেন!' চিনে ফেলেছে কিশোর। 'চিকেন!'

'হ্যাঁ,' মুসাও চিনতে পেরেছে। 'দি চিকেন কিং! মুরগীর রাজা!'

লাল, সাদা, নীল রঙের বিচিত্র সমাহার পোশাকে। বেশির ভাগ সময়েই যা

পরে থাকেন সেই জগিং স্যুট। এই পোশাকে টিভিতেও দর্শকদের দেখা দিয়েছেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সবাই চেনে তাঁকে। হাজার হাজার বার দেখেছে টিভির পর্দায়। যে কোন চ্যানেল খুললেই কোন না কোন সময় চোখে পড়বেই বিজ্ঞাপনটা। ওখান থেকেই তাঁর ডাক নাম হয়ে গেছে চিকেন। আগের 'দি' এবং পরের 'কিং'টা বাদ দিয়ে দিয়েছে লোকে।

'জুন লারসেন...হার্বার্ট লারসেন,' বিড়বিড় করছে কিশোর। 'জুন নিশ্চয় লারসেনের মেয়ে।'

'রুম ওয়ান ওয়ান ওয়ান ওয়ান, মিস্টার লারসেন,' নার্স বলল।

'ওটা কি লাকি রুম?' লারসেন বললেন, 'আমি চাই, আমার মেয়ে লাকি রুমে থাকুক। যেটাতে কোন রোগী মারা যায়নি। কোথায় ওটা? কোন দিকে? কোন ঘরটা?'

ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। তাঁর জন্যে খারাপই লাগল কিশোরের। এগিয়ে গেল নার্সের ডেস্কের কাছে। 'মিস্টার লারসেন, ওই যে ওই ঘরটা।'

ল্যরসেন যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কিশোরকে ক্ষুদ্রই মনে হলো তাঁর কাছে, যদিও সে-ও কম লম্বা নয়। ভুরু কুঁচকে তাকালেন কিশোরের দিকে, 'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ, এই মাত্র দেখে এলাম। ওঘরে আমাদের এক বন্ধুও আছে। জুন এখন ঘুমিয়ে।'

কিছুটা যেন স্বস্তি পেলেন চিকেন কিং। সোয়েটশার্টের পকেট থেকে দুটো কুপন বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও। দুটো টিকেট। আমার দোকানে গেলে ফ্রী খেতে পারবে চিকেন। আমার নিজের তৈরি সোনালি সসে চুবিয়ে। খেলে ভুলবে না।'

নিতে দ্বিধা করছে কিশোর।

'আরে নাও নাও, তাড়া আছে আমার,' জোর করে কুপন দুটো কিশোরের হাতে গুঁজে দিলেন লারসেন। 'তোমরা ভাল সংবাদ দিয়েছ। সেজন্যেই দিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম মরেই গেছে! থ্যাঙ্ক ইউ।'

বিশাল শরীর নিয়ে বেশ দ্রুতই মেয়ের ঘরের দিকে ছুটলেন লারসেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে কুপনগুলো একটানে ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। বাধা দিতে গেল মুসা। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। 'হায় হায়, এ কি করলে!'

'গত হপ্তায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, মনে নেই? পেটের অসুখের জন্যে? ভাজাভুজি খেতে মানা করে দিয়েছেন।'

'সে তো তোমাকে দিয়েছেন। আমাকে নয়।'

'এখানে আমার তোমার বলে কোন কথা নেই। পেটের জন্যে যেটা খারাপ, সবার জন্যেই খারাপ।'

যুক্তি খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা। তবে এত ভাল একটা খাবার এভাবে নষ্ট করা হলো বলে মনে মনে রেগেই গেল কিশোরের ওপর।

আবার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল দু'জনে। স্যালভিজ

ইয়ার্ডে রওনা হলো।

'অ্যাক্সিডেন্টটা কি করে ঘটল জানতে পারলে হত,' কিশোর বলল।

কিছু বলল না মুসা। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। কিশোরের মনে কিসের খেলা চলছে ভাল করেই বুঝতে পারছে সে। পেয়ে গেছে রহস্য।

ইয়ার্ডে ঢুকল গাড়ি। সোজা এসে ওয়ার্কশপে ঢুকল দু'জনে। ট্রেলারের ভেতরে তো পুরানো হেডকোয়ার্টার আছেই, ওয়ার্কশপটাকেও এখন আরেকটা হেডকোয়ার্টার বলা যায়। নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজিয়েছে কিশোর। এককোণে একটা ডেস্কের ওপর রাখা একটা অ্যানসারিং মেশিন। ঢুকেই আগে ওটার কাছে এগিয়ে গেল সে। বোতাম টিপতেই মেসেজ টেপে শোনা গেল রবিনের পরিচিত হাসি হাসি কণ্ঠ, 'ফারিহাকে দেখতে যেতে পারলাম না। সরি। বস্ চলে গেছে শহরের বাইরে। নতুন আরেকটা ব্যাণ্ড চেক করতে গিয়েছিলাম। অফিসে ফিরে হাসপাতালে যাব ভাবছি, এই সময় ফোন করল এমিলি। ও আজকে দাওয়াত করেছিল, পার্টিতে, ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন চাপাচাপি শুরু করল, না গিয়ে আর পারলাম না। জানোই তো ওর অবস্থা। ওকে কি করে ঠেকানো যায়, বলো তো কিশোর? তোমার কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, কোন একটা পরামর্শ দিতে পারে কিনা, আচ্ছা, কাল দেখা হবে।'

'ট্যালেন্ট এজেন্সিতে বড় বেশি সময় দিচ্ছে রবিন,' গানের কোম্পানিটার কথা বলল কিশোর, যেটাতে পার্টটাইম চাকরি নিয়েছে নথি-গবেষক।

'হ্যাঁ,' মুচকি হাসল মুসা। 'আরেকটা চাকরিতেও বড় বেশি সময় নষ্ট করছে আজকাল। মেয়েদের পেছনে। রবিনটা যে এমন হয়ে যাবে, কল্পনাই করতে পারিনি।'

'কি আর করা যাবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কিশোর। 'এটা আমেরিকা। যে দেশের যা সমাজ। ও তো আর আমার মত নয় যে মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং অপছন্দ করবে...'

'তোমাকেই বা কে মানা করেছে?'

'করেনি। তবে আমার এসব ভাল লাগে না। একটা ব্যাপারেই কষ্ট হয়, রবিনকে আর আগের মত পাচ্ছি না আমরা।'

'কই, পাচ্ছি না কোথায়? তিন গোয়েন্দার কাজের সময় তো ঠিকই এসে হাজির হয়। আমি একটা কথা লিখে দিতে পারি, দেখ, ট্যালেন্ট এজেন্সিতে বেশিদিন টিকবে না ও। ব্যাপারটা সাময়িক। ও আবার ফিরে যাবে লাইব্রেরিতে, বইয়ের জগতে।'

'তাই যাওয়া উচিত। যেখানে যাকে মানায়।'

আর কথা বাড়াল না। কিছু কাজ আছে ওদের। ছোট একটা যন্ত্র মেরামত করতে বসে গেল কিশোর। ওটা দিয়ে ইলেকট্রনিক লক কম্বিনেশন পড়া সম্ভব— কিছু যন্ত্রপাতি এদিক ওদিক করে নিলে, কিশোরের অন্তত সে রকমই ধারণা। ওকে বিরক্ত করল না মুসা। একটা ফুয়েল ইনজেকটরের স্প্রেয়ার পরিষ্কারে লেগে গেল। ওর গাড়ির জন্যে কাজে লাগবে।

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। কথা বলতে বলতে কাজ করে চলল দু'জনে। কিশোরের একটা গাড়ি দরকার, সে কথা আলোচনা করল কিছুক্ষণ। আরও খানিকক্ষণ আফসোস করল রবিনকে আগের মত করে পাচ্ছে না বলে। এক সময় চলে এল চিকেন হার্বার্ট লারসেনের কথায়। জুন লারসেনের দুর্ঘটনার ব্যাপারটা এখনও মাথায় ঘুরছে কিশোরের। পুরোপুরি জানতে পারেনি বলে খুঁতখুঁত করছে মনটা।

হঠাৎ বাজল টেলিফোন। চমকে দিল দু'জনকেই। ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় মধ্যরাত। এত রাতে কে করতে পারে, বিশেষ করে শুক্রবারের রাতে?

পুরানো একটা সুইভেল চেয়ারে বসেছে কিশোর। ওটাকে ঘুরিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়াল। 'হালো, তিন গোয়েন্দা।'

'কিশোর, ফারিহা বলছি। তোমাদের স্পীকারের সুইচ দিয়ে দাও। দু'জনকেই শোনাতে চাই।'

'ফারিহা,' টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সুইচ অন করতে করতে মুসাকে জানাল কিশোর। আরও একটা বিশেষ নতুন ব্যবস্থা করেছে সে, যাতে এপাশে যতজন থাকবে, সবাই ওপাশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

মুসাও তারই মত অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, 'ফারিহা, কি হয়েছে? এত রাতে?'

আবার সেই অনুভূতিটা হলো কিশোরের, রহস্যের গন্ধ পেলে যেমন হয়। তবে নিশ্চিত হতে পারছে না।

'অদ্ভুত একটা কাণ্ড করছে জুন,' জবাব দিল ফারিহা। 'ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কথা বলছে।'

'ওরকম অ্যাক্সিডেন্টের পর প্রলাপ বকাটাই স্বাভাবিক,' কিশোর বলল।

'তা ঠিক। তবে যা বলছে, তাতে ভয় লাগছে আমার। বলছে, হাজার হাজার, লাখ লাখ লোক মারা যাবে! বার বার বলছে একই কথা।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর আর মুসা। জবাব দিতে পারছে না।

ফারিহা বলছে, 'এই শেষ নয়। ও বলছে, মুরগীতে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে! এটা ঠিক না! এটা অন্যায়! এমন ভঙ্গিতে বলছে, যেন নিজের চোখে বিষ মেশাতে দেখেছে। ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকছে বলে মনেই হয় না!'

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'সাংঘাতিক কথা!'

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোর বলল, 'কি, বলেছিলাম না? আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে?'

'বলেছ। কিন্তু কে জানত, চিকেন কিং আমার প্রিয় খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন?'

দুই

'অ্যাই, শুনছ?' কিশোরের ওয়ার্কশপে স্পীকারে ভেসে এল ফারিহার গলা। 'আছ নাকি ওখানে?'

আছে ঠিকই, তবে জিভ যেন জড়িয়ে গেছে। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। কতবার খেয়েছে চিকেন কিঙের রেস্টুরেন্টে? শতবার? হাজার বার? কিশোরই খেয়েছে এতবার, খাবারের প্রতি যার ঝোঁক নেই তেমন। আর মুসা যে কতবার খেয়েছে তার তো হিসেবই করতে পারবে না। চোখে ভাসছে, টিভির পর্দায় দেখা হার্বার্ট লারসেনের চেহারা। চেহারাটাকে নিষ্পাপ করে তুলে নিরীহ কণ্ঠে বলেন; আমার মুরগী সেরা মুরগী। খেয়ে খারাপ বলতে পারলে পয়সা ফেরত।

'চিকেন লারসেন···খাবারে বিষ মেশায়···?' বিড়বিড় করছে মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে। 'আমার বিশ্বাস হয় না!'

'হওয়ার কথাও নয়,' কিশোর বলল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'চাচী প্রায়ই বলে, আপাতদৃষ্টিতে যেটা ঠিক মনে হবে সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। কেন একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি আমরা?'

'মানে?'

'মানে, চিকেন লারসেনকে দোষ দিচ্ছি কেন আমরা? ঘোরের মধ্যে তাঁর কথাই বলছে জুন, কি করে জানছি? নাম তো আর বলেনি। অন্য কারও কথাও বলে থাকতে পারে, যে খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। মস্ত একটা শক খেয়েছে সে। নানারকম ওষুধ দেয়া হচ্ছে। ওষুধের কারণেও দুঃস্বপ্ন দেখে অনেক সময় রোগী। হতে পারে ব্যাপারটা পুরোই দুঃস্বপ্ন।'

'অ্যাই, শোনো,' ফারিহা বলল। 'জুনের মুখের কাছেই নিয়ে যেতে পারতাম। তাহলে নিজের কানেই শুনতে পারতে। কিন্তু কর্ডটা অতদূর যায় না। যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে যাচ্ছি।···শোনো। শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল মুসা।

কিশোর বলল, 'না। কি বলে?'

'আবার সেই একই কথা,' ফারিহা বলল। 'বলছে, না না, দিও না···লোক মারা যাবে! ওকাজ কোরো না!'

'ও-কে,' কিশোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। 'কাল সকাল এগারোটায় জুনের সঙ্গে কথা বলব। ভিজিটিং আওয়ার স্টার্ট হলেই চলে আসব। দেখা যাক, ঘুম ভাঙে কিনা, কিছু বলতে পারে কিনা স্বপ্নের ব্যাপারে।'

'ভালই হয় এলে। তবে আমি বাজি রেখে বলতে পারি, রহস্য একটা আছেই। পেয়ে যাবে।'

'কাল সকালে দেখা হবে, ফারিহা,' মুসা বলল।

লাইন কেটে দিল কিশোর।

সে রাতে ভালমত ঘুমাতে পারল না কিশোর। ভাবছে, কোন লোকটা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিষ খাওয়াতে চায়? কেন? চিকেন লারসেন? নাকি কোন খেপাটে সন্ত্রাসী, যার দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে জুন? নাকি লারসেনের ব্যবসার ক্ষতি করার জন্যে কেউ বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে মুরগীর মাংসে তৈরি তার বিখ্যাত খাবারগুলোতে?

রাত একটায় রবিনকে ফোন করল কিশোর। পেল না বাড়িতে। তখনও

ফেরেনি।

দুটোয় আবার করল। এইবার পেল। সব কথা জানিয়ে বলল, সকালে যেন হাসপাতালে হাজির থাকে।

কিশোরের ফোন পাওয়ার পর রবিনেরও ঘুম হারাম হয়ে গেল। সে-ও ভাবতে লাগল একই কথা, কে এ রকম পাইকারী হারে মানুষ মারতে চায়?

ফারিহাও ঘুমোতে পারছে না। জেগে রয়েছে বিছানায়। কান পেতে রয়েছে আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে। যতবারই গুঙিয়ে ওঠে জুন, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে সে, 'জুন, কে? কে মুরগীতে বিষ মেশাচ্ছে বলো তো?' কিন্তু জবাব দেয় না জুন।

মরার মত ঘুমিয়েছে কেবল মুসা। তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

পরদিন সকালে জানালা দিয়ে যখন হাসপাতালের ঘরে রোদ এসে পড়েছে, তখন সেখানে পৌঁছল কিশোর আর মুসা।

প্রথমেই লক্ষ্য করল কিশোর, ফারিহাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঘরে ফুলদানীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, আর তাতে অনেক ফুল। জুনের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে একটা স্টাফ করা মুরগী, মাথায় সোনালি মুকুট। পর্দা টেনে ঘিরে দেয়া হয়েছে জুনের বিছানা।

পর্দা টানা জায়গাটার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জুন কোথায়?' এখুনি ওর সঙ্গে কথা বলে রহস্যটার একটা সমাধান করে ফেলতে চায়। 'আর কেউ আছে?'

'শ্শ্!' ঠোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে আস্তে কথা বলতে ইঙ্গিত করল ফারিহা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'শুধু জুন। ঘুমিয়ে আছে।'

এই সময় ঘরে ঢুকল রবিন।

'সরি। দেরি হয়ে গেল। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছিল।' পুরানো ফোক্সওয়াগনটা বিক্রি করে দিয়ে আরেকটা গাড়ি কিনেছে রবিন। লম্বা, একহারা শরীর। গায়ের কটন সোয়েটারটা খুলে গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে। কয়েক বছর আগেও সে ছিল রোগাটে, হালকা পাতলা এক কিশোর। পায়ে চোট পেয়েছিল। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিল হাড়। সেটা বড় যন্ত্রণা দিত মাঝে মাঝে। এখন সব সেরে গেছে।

অনেক বদলে গেছে রবিন। লম্বা হয়েছে। গায়ে মাংস লেগেছে। চেহারায় চাকচিক্য। ধোপদুরস্ত পোশাক পরে। চাকরি করে বার্টলেট লজের ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। কারাতের ট্রেনিং নিচ্ছে। ওকে দেখলে কেউ এখন কল্পনাই করতে পারবে না এই রবিন মিলফোর্ডই পার্ট টাইম চাকরি করত রকি বীচের লাইব্রেরিতে, আর বইয়ে মুখ গুঁজে থাকত। রকি বীচ হাই স্কুলে মেয়েমহলে রবিন এখন একটা পরিচিত প্রিয় নাম।

'কোথায় আমাদের কেস?' হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ডানা মেলে উড়ে গেল না তো চিকেন প্রিন্সেস?'

'কেস ওই পর্দার আড়ালে,' মাথা নেড়ে পর্দাটা দেখিয়ে দিল মুসা। 'ওর সঙ্গে

কথা বলতে পারিনি আমরা।'

'চেষ্টা করলে কিশোর পারবে,' হেসে বলল রবিন। 'তবে যুক্তি দেখাতে গেলে মুখ খুলবে কিনা...'

'খোলার অবস্থাতেই নেই এখন,' নিচু গলায় বলল ফারিহা। 'অন্তত শান্ত তো হয়ে আছে। কাল রাতে যা করেছে না! কয়েকজন লোকও এসেছিল দেখা করতে।'

'রাত দুপুরে!' অবাক হলো কিশোর। 'লাল চুলওয়ালা ওই নার্সের চোখ এড়াল কিভাবে?'

শ্রাগ করল ফারিহা। 'রহস্যময় ব্যাপার, তাই না?'

'কারা ওরা?'

'ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসেছে চিকেন লারসেন। গোটা দুই ফ্রী কুপনও দিয়েছে আমাকে।'

'সবাইকেই খালি কুপন বিলাচ্ছে। আর কে এসেছে?'

'টম হামবার নামে একটা সুন্দর লোক।'

'নাম জানলে কি করে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কেন, গোয়েন্দা কি শুধু তোমরাই?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'জিজ্ঞেস করেছিলাম। জুনের বয়ফ্রেণ্ড ছিল এক সময়। ভোর চারটের দিকে এসেছিল সে। জুনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। যেন পাহারা দিচ্ছিল ওকে। তারপর ভোরবেলা এল আরেকজন। নাম বলল হেনা তানজামিলা। জুনের কলেজ হোস্টেলের নাকি রুমমেট সে।'

'হুঁম্‌ম্‌,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ওর কথা ভুলে যেতে পারি আমরা।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'কারণ, জুন বলেছে লোকটা খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। আর ওই টমকে নিয়েও মাথাব্যথা নেই আমার। একজন ভূতপূর্ব বয়ফ্রেণ্ড লাখ লাখ লোক মারার প্ল্যান করবে বলে মনে হয় না।'

'প্রতিশোধ নিতে চাইলেও না?'

'লাখ লাখ লোকের ওপর কিসের প্রতিশোধ নেবে?'

'আগেই তর্ক শুরু করে দিলে,' বাধা দিয়ে বলল ফারিহা। 'চার নম্বর রহস্যময় লোকটার কথা তো এখনও শোনোইনি।' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে।

জুনের বিছানা ঘিরে টানানো পর্দার দিকে তাকাল চারজনে। যেন শিওর হতে চাইছে, জুন জেগে গেছে কিনা। তারপর লোকটার কথা বলতে লাগল ফারিহা, 'চার নম্বর ভিজিটরটি একজন লোক বটেন! ভীষণ বদমেজাজী। বয়েস তিরিশ মত হবে। বেশ তাগড়া শরীর। একটা আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট গায়ে দিয়ে এসেছিল। আমার ওপর চোখ পড়তেই জ্যাকেটের কলার তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করে ফেলল। হতে পারে, চেহারাটা বেশি কুৎসিত, সে জন্যেই দেখাতে চায়নি।'

'নাম জিজ্ঞেস করেছ?' মুসা জানতে চাইল।

'করেছি। শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুপ থাকতে বলল। ধমক দিয়ে

বলল, আমি ওর নাম জেনে কি করব? তারপর জুনের বিছানার চারপাশের পর্দাটা টেনে দিল যাতে আমি কিছু দেখতে না পারি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নানারকম খুটুরখাটুর শব্দ শুনলাম। মনে হলো, জুনের ওপাশে যতগুলো ড্রয়ার আছে সব খুলে খুলে দেখেছে।'

'তাড়াহুড়ো করে, না আস্তে আস্তে?'

'তাড়াহুড়ো করে।'

হাসল কিশোর। 'তারমানে আন্দাজে কিছু করতে আসেনি। যা করতে এসেছে, জেনে বুঝেই এসেছে। কি খুঁজছিল, জানে।'

'কিন্তু পায়নি। খালি হাতে ফেরত যেতে দেখেছি।'

পায়চারি শুরু করল কিশোর। 'জুন না জাগলে আর কিছুই জানা যাবে না।'

'আর জাগলে যেন ভিজিটিং আওয়ারে জাগে,' মুসা বলল মুখ বাঁকিয়ে। 'নইলে যে নার্সের নার্স। এক্কেবারে দজ্জাল। একটা মুহূর্তও আর থাকতে দেবে না আমাদেরকে।।'

জুনের পর্দার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করল রবিন। 'অবস্থা খুব একটা খারাপ লাগছে না। খবরের কাগজগুলো মন্তব্য করছে, বেঁচে যে আছে এটাই ভাগ্য। অ্যাক্সিডেন্টে গাড়িটার নাকি সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে,' ঘুরে দাঁড়াল সে। 'দুর্ঘটনার জায়গাটা দেখেছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। একভাবে পায়চারি করে চলেছে। এই সময় একগোছা ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকল লাল চুলওয়ালা নার্স।

প্রথমে ফারিহার দিকে তাকাল সে, তারপর এক এক করে তিন গোয়েন্দার দিকে। 'তিনটে ছেলে!' ফারিহার দিকে আবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এত বন্ধু জুটিয়েছ কেন? রোগ না সারিয়ে আরও তো বাড়াবে। এতজনে দেখতে আসার কোন দরকার আছে?' জুনের বিছানার কাছে ফুলগুলো রেখে দরজার দিকে এগোল সে। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আবার আসব আমি,' যেন হুমকি দিয়ে গেল।

'কেন আসবে?' নার্স বেরিয়ে যাওয়ার পর বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা।

'ইনটারেসটিং,' রেখে যাওয়া ফুলগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'হেনরি অগাসটাস পাঠিয়েছে।'

'তাতে ইনটারেসটিঙের কি হলো?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কারণ, অগাসটাস রেস্টুরেন্টের মালিক সে। চিকেন লারসেনের প্রতিযোগী।'

'তুমি জানলে কি করে? তোমার আর কিশোরের কাছে তো কোন রেস্টুরেন্টেরই কোন মূল্য নেই।' আগের রাতে কুপন ছিঁড়ে ফেলার পর থেকেই বিরক্ত হয়ে আছে মুসা। রাগটা ঝাড়ল এখন।

হেসে ফেলল রবিন। 'মনে হচ্ছে তোমার খাওয়ায় বাদ সেধেছে কিশোর? ফ্রী কুপন দিয়ে গিয়েছিল নাকি চিকেন লারসেন'?'

'দিয়েছিল,' কিশোর জানাল। 'আজেবাজে জিনিস খেয়ে পেট নষ্ট হয়। সে জন্যে ফেলে দিয়েছি। আর কেউ কিছু মুফতে খেতে দিলেই খেতে হবে নাকি?'

শব্দ করে হাসল রবিন। মুসার রাগের কারণ এখন পরিষ্কার। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে হেনরির সঙ্গে পরিচয় হয়নি। অগাসটাস রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধনী দিনে একটা ব্যাণ্ড পার্টি পাঠাতে হয়েছিল আমাকে। আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে। টাইম যখন দিয়েছিল তার অনেক পরে এসেছিল হেনরি। ওকে ছাড়া কাজ শুরু করা যায়নি। ঝাড়া চারটে ঘণ্টা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমাদের।'

'শত্রুর মেয়েকে ফুল পাঠাল কেন কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'ওরকম করেই থাকে হেনরি। ব্যবসার কোন ট্রিকস হবে। তবে লোকটাকে বোধহয় তোমারও পছন্দ হবে না। শুনেছি, হেনরি আর চিকেন একজন আরেকজনের ছায়া দেখতে পারে না। লারসেন মরে গেলে তার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হত না। মুখেও বলে সেকথা। লারসেন অতটা খারাপ লোক নন। মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে অন্তরের ইচ্ছা একই হবে।'

'যাক,' বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতে ঘুসি মারল মুসা। 'সন্দেহ করার মত কয়েকজন পাওয়া গেল।'

'তা গেল,' বলল কিশোর। 'কিন্তু কোন অপরাধ তো ঘটেনি। সন্দেহ করে কি হবে?'

এই সময় দরজা খুললেন চিকেন লারসেন। ঘরে এত লোক দেখে যেন বরফের মত জমে গেলেন। তবে এক সেকেণ্ডের জন্যে।

তাঁর মুখের দিকে তাকাল কিশোর। গোলগাল চেহারা? চোখের কোণে কালি কেন? মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তায়? নাকি উন্মাদের দৃষ্টি? পাগলের চোখেও ও দৃষ্টি দেখেছে সে। খাবারে বিষ মিশিয়ে লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলার কথা তাঁর মেয়ে বলে ফেলেছে বলেও দুশ্চিন্তা হতে পারে। কোনটা?

দরজায় দাঁড়িয়েই তিনি বললেন, 'আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। সুযোগ পাব?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরোতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। চলে এল হলঘরে। চারপাশে একবার চোখ বোলাল কিশোর। তারপর হলের মাঝে নার্সরা যেখানে বসে সেদিকে এগোল। ডেস্কের পেছনে মাত্র একজন নার্স রয়েছে। সেই লাল চুলওয়ালা মহিলা। তার নেমট্যাগে লেখা রয়েছেঃ মারগারেট ইলারসন, আর এন।

'শুনুন,' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কাল রাতে এখানে কে ডিউটিতে ছিল বলতে পারবেন?'

'অবাক কাণ্ড!' ভুরু কুঁচকে ফেলল মারগারেট, 'তুমি জিজ্ঞেস করার কে? শুনতে চাও? আমি ছিলাম। আমি। আরেকজন যার ডিউটিতে থাকার কথা, সে হঠাৎ করে বিয়ে করে বসেছে। কাজেই দিনরাত এখন আমাকে ডিউটি দিতে হচ্ছে। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা।'

হাসল কিশোর। তাতে উত্তেজনা মিশে আছে। 'তাই নাকি। তাহলে তো জুন

লারসেনকে যারা যারা দেখতে এসেছে সবার কথাই বলতে পারবেন। ওর বাবা বাদে আর যে তিনজন এসেছিল।'

মাথা নাড়ল মারগারেট। 'না। রোগীর পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানো নিষেধ।'

আলাপ শেষ। মহিলার চোখ দেখেই সেটা আন্দাজ করতে পারল কিশোর। একটানা ডিউটি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে আছে মারগারেট। মুখ গোমড়া করে রেখেছে। তাছাড়া কথা কম বলা স্বভাব। মেজাজ ভাল থাকলেও বলত না। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আরেক দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান।

এগিয়ে এসেছে রবিন। লালচে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'ম্যা'ম, ব্যাপারটা জরুরী।'

কড়া চোখে তাকাল মারগারেট। বিনিময়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল রবিন। তারপর ভদ্র কণ্ঠে বলল, ট্যালেন্ট এজেন্সিতে যে ভাবে মক্কেলদের পটায় সেভাবে, 'চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি! এ তো অমানবিক। নাহ্, আপনার জন্যে মায়াই লাগছে আমার।'

চোখের দৃষ্টি সামান্য নরম হলো মহিলার। রবিনের দিকে তাকিয়ে যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে, ভাগিয়ে দেবে না কথা বলবে। এত ভাল একটা ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা উচিত হবে না ভেবেই বোধহয় শেষে বলল, 'তিনজন তো নয়, দু'জন এসেছিল। একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে।'

'কেন, আর্মি জ্যাকেট পরা লোকটা?' জানতে চাইল কিশোর। 'আসেনি?'

বিস্ময় ফুটল মারগারেটের চোখে। 'আমি সাফ মানা করে দিয়েছিলাম, ঢুকতে পারবে না। আর বোলো না! লোকটাকে দেখলেই গা শিরশির করে। শুঁয়াপোকা দেখলে যেমন করে!'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'দেখতেই জানি কেমন। একের পর এক প্রশ্ন করে চলল। জবাব দিতে দিতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় আমার। আর কি সব প্রশ্ন!'

'যেমন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'মেয়েটা কি বাঁচবে? যেন মরে গেলেই খুশি হয়। ওর জিনিসপত্রগুলো কোথায় রেখেছে, একথাও জানতে চাইল। আরও নানা রকম কথা। লারসেন পরিবারের লোক বলে মনে হলো না ওকে।'

'চেহারাটা দেখেছেন ভাল করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা নাড়ল মারগারেট। 'লোকের মুখের দিকে কখনোই ভাল করে তাকাই না আমি। কেবল তার জ্যাকেট আর কথাগুলো মনে আছে। বদমেজাজী যে এটুকুও বুঝতে পেরেছি। তবে তার চেহারা বলতে পারব না।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

সরে এল তিন গোয়েন্দা। কিশোর বলল, 'ধরা যাক, লোকটার নাম মিস্টার এক্স। এখন এই এক্সকে বিশেষ সুবিধের লাগছে না আমার। সন্দেহ জাগানোর মত চরিত্র। জুন হয়তো জানতে পারে লোকটার আসল পরিচয়। চলো, রুমে যাই।

দেখি, জাগল কিনা।'

'অ্যাই, ছেলেরা,' ওদের কথা শুনে ফেলেছে মারগারেট। 'জুনের অবস্থা কিন্তু খারাপ। ঘুম দরকার। ওর জাগতে সময় লাগবে।'

তাহলে আর গিয়ে লাভ নেই। অহেতুক বসে থাকা। তার চেয়ে কাজের কাজ যদি কিছু করা যায় সেই চেষ্টা করল ওরা। মুসা রয়ে গেল হাসপাতালে। ফারিহাকেও সঙ্গ দেবে, জুনের কাছে কারা কারা আসে দেখবে, আর ওর ঘুম ভাঙে কিনা খেয়াল রাখবে। কিশোর আর রবিন চলল রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে, চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বলতে।

আরেকটা ফোক্সওয়াগনই কিনেছে রবিন। গোবরে পোকার মত এই গাড়িগুলোই যেন তার বিশেষ পছন্দ। তার বক্তব্য, এই গাড়ি নাকি পথেঘাটে বন্ধ হয়ে বিপদে ফেলে না। যাই হোক, সেটা পরীক্ষার ব্যাপার। এই গাড়িটার রঙও আগেরটার মতই, লাল। সে বসল ড্রাইভিং সীটে। পাশের প্যাসেঞ্জার সীটে বসল কিশোর।

থানায় পৌছতে বেশিক্ষণ লাগল না। চীফ আছেন। ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার ফুরসত আছে তাঁর আপাতত। ওরা ঢুকে দেখল, লাঞ্চ প্যাকেট খুলছেন তিনি। চিকেন লারসেনের ফ্রাইড চিকেন।

'খাবে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'থ্যাংকস,' বলে হাত বাড়াল রবিন। তুলে আনল সোনালি মাখন মাখানো এক টুকরো মাংস।

কিশোরের দিকে তাকালেন চীফ। 'নাও?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কিশোর। খামচে ধরেছে চেয়ারের হাতল। যেন বিষ মাখানো খাবার খেতে দেখছে দু'জনকে।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্লেচার। 'কোন কারণ ছাড়া তো নিশ্চয় আসনি। কি কেস?' একটা রান তুলে নিয়ে কামড় বসালেন তিনি। চিবাতে লাগলেন আরাম করে।

'জুন লারসেনের অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে জানতে এলাম,' জবাব দিল কিশোর।

'ওতে কোন রহস্য নেই,' মুখ ভর্তি মুরগীর মাংস নিয়ে কথা বলায় স্পষ্ট হচ্ছে না কথা। কাজেই গিলে নিলেন চীফ। 'বৃষ্টির মধ্যে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিল। পাহাড়ী পথে এরপর যা হবার তাই হয়েছে।'

'অস্বাভাবিক কিছু নেই এর মধ্যে?'

'দুটো প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে। তবে অনেক দুর্ঘটনার বেলাতেই এটা ঘটে। অপরিচিত একজন ফোন করে খবরটা দিল। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমরা। অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতে দেখে থাকতে পারে। তাতে কোন রহস্য নেই। কিন্তু নাম বলল না কেন? আরেকটা ব্যাপার। দুই সেট চাকার দাগ ছিল। একসেট জুনের গাড়ির। সোজা রাস্তা থেকে নেমে গেছে। আরেকটা সেট ছিল তার পাশে। যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, তার কাছ থেকে আরও খানিকটা নিচে

নেমে গেছে।'

কি ঘটেছিল, অনুমান করার চেষ্টা করল কিশোর। দুটো গাড়ি আসছিল। একটা আগে, আরেকটা পেছনে। একটা জুনের গাড়ি। অন্যটা কার? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করল সে। ভিন্ন একটা দৃশ্য ফুটতে শুরু করেছে মনের পর্দায়।

'স্যার,' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল সে, যেন নিজেকেই বোঝাল। 'একটা সম্ভাবনার কথা কি ভেবেছেন আপনি? এমনও তো হতে পারে, জুন লারসেনকে তাড়া করেছিল কেউ?'

তিন

'তাড়া করেছিল?' কোল্ড ড্রিংকের গ্লাসটা তুলে নিয়েছিলেন চীফ, আস্তে করে নামিয়ে রাখলেন আবার সেটা। 'কি ভাবছ তুমি, কিশোর, বলো তো? অতি কল্পনা করছ না তো?'

'একটা সম্ভাবনার কথা বললাম, স্যার, হতেই তো পারে,' সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'ধরুন, পাহাড়ী পথ ধরে নামছেন আপনি। জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আপনার সামনের গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গেল। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে পড়তে শুরু করল। আপনি তখন কি করবেন?'

চীফ বলার আগেই বলে উঠল রবিন, 'অবশ্যই ব্রেক করব, যত জোরে পারি। থামানোর চেষ্টা করব আমার গাড়িটা। স্কিড করে যতটা যাওয়ার যাবে গাড়ি, তারপর থেমে যাবে।'

'যেখানে দ্বিতীয় সেট চাকার দাগ দেখেছি সেখানে,' রবিনের সঙ্গে একমত হলেন চীফ।

'তারপর কি করবে?' রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর।

'তারপর পিছিয়ে নিয়ে যাব আমার গাড়িটাকে। যাতে ওটাও আগেরটার মত পিছলে পড়তে না পারে। এবং তারপর যাব আগের গাড়িটার কি অবস্থা হয়েছে, লোকজন বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্যে।'

'ঠিক তাই,' সন্তুষ্টির হাসি হাসল কিশোর। 'দ্বিতীয় গাড়িটা কি তা করেছে? সাহায্য করতে গেছে জুনকে? বেঁচে আছে কিনা অন্তত সেটুকু দেখার চেষ্টা কি করেছে?'

'না,' স্বীকার করলেন চীফ। 'যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে ওরকম কিছু করেনি। পথের পাশে নরম মাটি ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল। ওখানে চাকার দাগ পাইনি। জুতোর দাগ পাইনি। কেউ নামলে জুতোর দাগ পড়তই। আমার বিশ্বাস, প্রথম গাড়িটাকে পড়তে দেখে গাড়ি থামিয়েছিল বটে দ্বিতীয় গাড়িটা, তবে চুপ করে বসে ছিল ওটার আরোহী।'

'তাহলে কে সেই মানুষ?' কিশোরের প্রশ্ন। 'যে একটা গাড়িকে পড়ে যেতে দেখেও সাহায্যের হাত বাড়ায়নি? বেচারা ড্রাইভারের কি হলো, তা পর্যন্ত দেখার

চেষ্টা করেনি?' নিজেই জবাব দিল প্রশ্নগুলোর, 'হতে পারে, সেই লোক জুন লারসেনকে তাড়া করেছিল। গাড়িটা পড়ে যাওয়ায় খুশিই হয়েছিল। মেয়েটা মরেছে না বেঁচে আছে সেটা দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি।'

'ভাল বলেছ,' চীফ বললেন। 'তথ্য-প্রমাণ কিছু দেখাতে পারবে?'

'সেই চেষ্টাই করব,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'দেখি, বের করতে পারি কিনা। রবিন, এসো।'

দরজার কাছে যাওয়ার আগেই ওদেরকে ডাকলেন চীফ। 'বেশি কষ্ট করার দরকার নেই। জুন বেঁচেই আছে। ও জেগে গেলেই ওর মুখ থেকে সব শুনতে পারব আমরা।'

ঠিকই বলেছেন চীফ। কি ঘটেছে জানার জন্যে তদন্তের প্রয়োজন নেই। কেউ তাকে অনুসরণ করছিল কিনা, হয়তো লক্ষ্য করেছে জুন। আর তাড়া করে থাকলে তো কথাই নেই। এমনও হতে পারে, ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে ওর গাড়ি। হতে পারে, যে ফেলেছে, সেই লোকই খাবারে বিষ মিশিয়ে লাখ লাখ লোককে মারার ফন্দি করেছে।

সব প্রশ্নের জবাবই হয়তো আছে জুনের ঘুমন্ত মাথায়। এখন শুধু তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা। তারপরই জবাব পেয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু আসল কথাটা হলো, জাগার পর সত্যি কথাগুলো বলবে তো জুন? যদি তার বাবা এসবে জড়িত থাকে? বলবে? বাবাকে বাঁচানোর জন্যে মুখ বুজে থাকবে না?

থানা থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল দুই গোয়েন্দা। খিদে টের পেল কিশোর। সে কথা বলল রবিনকে।

'ভুল করলে তো না খেয়ে,' রবিন বলল। 'ডাক্তার তো কত কথাই বলবে। কত কিছু নিষেধ করবে। সব শুনলে কি চলে?'

'বলাটা সহজ,' মুখ কালো করে বলল কিশোর। 'পেটের যে কি অবস্থা হয়েছিল আমার, তোমার হলে বুঝতে। কি কষ্টটাই যে করেছি! এখন খাবার দেখলেই বিষ মনে হয় আমার!'

'পেট যখন আছে, ফুড পয়জনিং হবেই। সবারই হয়। তাই বলে কি খাওয়া ছেড়ে দেব?'

'তা কি দিয়েছি নাকি? বেছে বেছে খাচ্ছি। আর এতে বেশ ভালই লাগছে আমার। পেটে আর কোন অশান্তি নেই।'

'আচ্ছা, বাদ দাও ওসব কথা। তোমার যা ইচ্ছে খেয়ো। এখন কি করব, বলো।'

'কাজ একটাই করার আছে। কোন লোকটা জুনকে ফলো করেছিল, তাঁকে খুঁজে বের করা। কাল রাতে হাসপাতালে যে তিনজন দেখতে এসেছিল তাদের একজনও হতে পারে।'

'টম, হেনা, আর মিস্টার এক্স, এই তিনজনের একজন?'

'হ্যাঁ। হেনরি অগাসটাসের ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে আমাদের, লারসেনের

শত্রু যখন। হেডকোয়ার্টারে ফিরে কম্পিউটারেই সেটা করার চেষ্টা করব। জিনিসটা যখন কিনলামই, কাজে লাগাই। ডাটাসার্ভে খোঁজ করে ওদের বিজনেস ফাইলগুলো বের করে নেব। দেখি, হেনরি আর তার রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে কি তথ্য দেয় কম্পিউটার। ওদের ডাটাবেজ হলো দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল। তথ্য জানাতেও পারে।'

'তুমি তো কম্পিউটার নিয়ে বসবে। আমি...'

'জানার চেষ্টা করবে, কাল রাতে হাসপাতালে জুনকে দেখতে আসার আগে কোথায় কি করেছে টম।'

'মাপ চাই। সময় নেই আমার। এজেন্সিতে যেতে হবে।'

'বেশ। তাহলে মুসাকে ফোন করে বলো, ও-ই চেষ্টা করুক। অহেতুক ফারিহার সঙ্গে বসে বসে বকবক করার চেয়ে একটা কাজ অন্তত করুক।'

'বেশ। হেনা আর মিস্টার এক্সের ব্যাপারে কি হবে?'

'হেনার ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই,' কিশোর বলল। 'ওর কোন মোটিভ আছে বলে মনে হয় না। তবু, ওকেও একবার ফোন করব সময় করে। আর মিস্টার এক্সকে এভাবে খুঁজে বোধহয় বের করতে পারব না। সে এসবে জড়িত থাকলে এক সময় না এক সময় দেখা আমাদের হয়েই যাবে।'

অনেক খিদে পেয়েছে কিশোরের। গুড়গুড় করছে পেটের ভেতর। রবিনকে অনুরোধ করল সুপারমার্কেটে নিয়ে যেতে। কিছু ফল কিনল কিশোর। গাড়িতে এসে বসে খেতে শুরু করল। ইয়ার্ডের দিকে গাড়ি চালাল রবিন। কিশোরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তার কাজে। অফিসে গিয়ে মুসাকে ফোন করে জানাল কিশোর কি করতে বলেছে।

বিশেষ গুরুত্ব দিল না মুসা। কাজেই ফারিহার কাছ থেকে উঠতে উঠতে অন্ধকার হয়ে গেল। তখন আর টমের ঠিকানা খুঁজে বের করার সময় নেই। অত অন্ধকারে কে একটা গোবেচারা বয়ফ্রেণ্ডের ঠিকানা খোঁজার মত ফালতু কাজ করতে যায়? রোববারের আগে আর কাজটা করতে পারল না মুসা। গাড়ি এনে রাখল লরেল স্ট্রীটে, ২৮ নম্বর বাড়ির সামনে, যেখানে বাস করে টমাস হামবার।

রকি বীচের কয়েক মাইল উত্তরে মেলটনের শান্ত সুন্দর পরিবেশে বাড়িটা। পথের পাশে একসারি সাদা কাঠের বাড়ি। সামনে চওড়া বারান্দা আর ছোট আঙিনা।

টমাসদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো বনেভিল কনভারটিবল গাড়ি। বারান্দার রেলিঙের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে সোনালি চুলওয়ালা এক তরুণ। পরনে রঙচটা নীল জিনস, গায়ে সাদা টি-শার্ট। মুসা আঙিনায় ঢুকতেই লাফ দিয়ে রেলিং থেকে নামল সে।

'এসো!' চিৎকার করে ডাকল সে। এক হাত সামনে বাড়ানো, আরেক হাত পিঠের পেছনে। 'দিনটা মাটি হতে বসেছিল আমার! তুমি আসাতে সেটা আর হলো না!' মুসা বারান্দার কাছাকাছি যেতেই পেছনের হাতটা সামনে চলে এল। শক্ত করে ধরা একটা মোটর সাইকেলের চেন।

ব্যাপার কি? গতি বেড়ে গেল মুসার হৃৎপিণ্ডের। হঠাৎ করে, কোন কারণ ছাড়াই একটা উন্মাদ হামলা করতে আসছে কেন তাকে! চেনের একটা মাথা হাতে পেঁচানো, আরেক মাথা ঝুলছে সাপের লেজের মত। স্থির হয়ে গেছে মুসা। কারাতের কৌশল ব্যবহার করবে? না পিছিয়ে যাবে?

'এবার শুধু তুমি আর আমি,' লোকটা বলল। 'এই তো চেয়েছিলে, তাই না?' বলেই শপাং করে বাড়ি মারল কাঠের রেলিঙে।

না, কারাতের কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। ওই চেনের এক বাড়ি মাথায় লাগলে সাতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে। পিছাতে শুরু করল সে।

'শিক্ষা আজ ভাল করেই দিয়ে দেব!' চিৎকার করে উঠল আবার লোকটা। লাফিয়ে বারান্দা থেকে আঙিনায় নামল। বেশি বড় শরীর না। অর্থাৎ গায়েগতরে মুসার চেয়ে ছোট। খাটোও, স্বাস্থ্যও খারাপ। কিন্তু চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে, আর মাথার ওপরে তুলে বনবন করে ঘোরাচ্ছে চেনটা।

'আপনি ভুল করছেন,' মুসা বলল। সে পিছাচ্ছে আর লোকটা এগোচ্ছে। লোকটার পায়ে চামড়ার বুট। গরিলার মত বাঁকা করে রেখেছে কাঁধ।

'আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল আবার। 'আমি এসেছি টমাস হামবারের খোঁজে,' মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। 'আমি জুন লারসেনের বন্ধু।'

থমকে গেল কালো বুট। থেমে গেল চেনের পাক।

'সত্যি বলছ?' লোকটা বলল।

'কসম,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। সতর্ক রয়েছে। লোকটা হঠাৎ আক্রমণ চালালে যাতে ঠেকাতে পারে।

'সরি,' চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়ল লোকটা। ঢিল হয়ে গেল যেন সমস্ত শরীর। 'আমিই টমাস হামবার। জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাকে। চুরি করে বাড়িতে ঢুকে পড়ে ওরা। ভবঘুরে। একটা লোক তো শাসিয়েই গেছে সুযোগ পেলেই আমার গাড়িটা চুরি করে নিয়ে যাবে।'

রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ঝরঝরে বনেভিলটা দেখাল টম।

ওটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। অবশেষে হেসে রসিকতা করল, 'এমনিতেই ওটা দিয়ে দেয়া উচিত। হাহ্, হাহ্! চাকা তো বসে গেছে। আর যে হারে তেল লিক করছে...'

'ব্যাটারিও ডাউন হয়ে আছে দুই হপ্তা ধরে,' যোগ করল টম। হাসছে সে-ও। 'তবু, ওদেরকে নিতে দেব কেন? কেড়ে রেখেছি অনেক কষ্টে। ব্যাটারা হাড়-মাস জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার। কি বলছি বুঝতে পারছ?' বারান্দার রেলিঙের দিকে চোখ পড়তে বলল, 'রেলিংটারই সর্বনাশ করলাম!...হ্যাঁ, জুনের সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো তোমার, বলো তো?'

'আসলে, পরিচয় হয়নি এখনও,' সত্যি কথাটাই বলল মুসা। 'আমার বান্ধবী আর ও একই রুমে রয়েছে হাসপাতালে।'

'ও, হ্যাঁ, দেখেছি একটা মেয়েকে,' মুসাকে ঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে এল টম। চেন ঘোরাচ্ছে না। রাগও দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে। ওকে দেখতে আর

ভয়ঙ্কর লাগছে না তখনকার মত। বরং ভদ্র, শান্ত একজন কলেজের ছাত্রের মতই লাগছে। ভেতরে আসবাবপত্রের চেয়ে পোস্টারই বেশি।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম,' মুসা বলল। 'শুক্রবার রাতে অত দেরি করে হাসপাতালে গিয়েছিলেন কেন?'

'খবরটাই পেয়েছি দেরিতে। জুনের রুমমেট হেনা ফোন করে আমাকে জানাল জুন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কয়েক মাস হলো ওর সঙ্গে আর ততটা দেখা হয় না, ঘনিষ্ঠতা নেই। তবু, একসময় তো ছিল, সেই সুবাদেই গেলাম দেখতে। হুঁশ ফিরেছে ওর?'

'না। বেহুঁশ ঠিক বলা যায় না, নার্স তাই বলল। গভীর ঘুম বলা যেতে পারে। ডাক্তারের কথা, অনেক বেশি ঘুম দরকার এখন ওর।'

একটা মুহূর্ত আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল টম। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ল, যার সঙ্গে কথা বলছে সে পুরোপুরি অপরিচিত তার। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জুনকে যদি না-ই চেনো, তাহলে এসব প্রশ্ন করছ কেন?'

'ফারিহা, আমার গার্লফ্রেণ্ড বলল, অদ্ভুত একটা কিছু ঘটছে। সেটারই তদন্ত করছি। চিকেন হার্বার্ট লারসেনকে চেনেন?'

'তাকে চিনব না। জুনের সঙ্গে আমার গোলমালটা বাধানোর জন্যে সে-ই তো দায়ী।'

'মানে? আপনাকে পছন্দ করতেন না তিনি?'

'কি করে করবে? সারাক্ষণই তর্ক বেধে থাকলে কি আর পছন্দ করে কেউ? আমি নিরামিষ ভোজী। মাছ খাই না, মাংস খাই না, মুরগীও ভাল লাগে না। খাবার জন্যে প্রাণী হত্যা আমার মতে অপরাধ। আর বেচারা প্রাণীগুলোকে খুন করে যারা ব্যবসা করে তারা তো রীতিমত অমানুষ। লাগত এসব নিয়েই। শেষ দিকে তো আমাকে দেখলেই জ্বলে উঠত লারসেন। আস্তে আস্তে এসব নিয়ে জুনের সঙ্গেও কথা কাটাকাটি শুরু হলো আমার। শেষে যখন বলল, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বাপের ব্যবসা দেখবে জুন, ব্যস, হয়ে গেল। সব খতম। কাটাকাটি।'

'আরেকটা কথা। ভোর রাত চারটের সময় আপনি হাসপাতালে ঢুকলেন কি করে? ঢুকতে দিল?'

'নার্সকে মিথ্যে বলেছি আমি। বলেছি, জুনের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছে,' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল টম। 'কথাটা সত্যি হলে খুশিই হতাম।'

শেষ বিকেলে রবিন আর কিশোরকে তদন্তের ফলাফল জানাল মুসা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে রয়েছে তিনজনে। রবিনের ফোক্সওয়াগনের ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে সে। কিছু জিনিস খারাপ হয়েছে, যার ফলে গোলমাল করছে ইঞ্জিন, সেটাই দেখছে আর কথা বলছে। ফ্যান বেল্টটা প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। বদলানো দরকার। পুরানো বাতিল মালের অভাব নেই ইয়ার্ডে। অন্য একটা ইঞ্জিনের বেল্ট খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে মুসা। লাগিয়ে দিয়ে দেখল চলে কিনা। চলছে। অন্তত আগেরটার চেয়ে ভাল। আঙুল দিয়ে টেনেটুনে দেখে বলল, 'শ' দুই মাইল চালাতে পারবে। তারপর ঢিল হয়ে যাবে। রবিন, নতুন একটা কিনে নিয়ো।'

ওসব ফ্যান বেল্টের কথার ধার দিয়েও গেল না এখন কিশোর। বলল, 'আমার কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় লাগছে যে ব্যাপারটা, তা হলো, টমের একটা গাড়ি আছে।'

'কিশোর,' রবিন বলল। 'মাঝে মাঝে এত দুর্বোধ্য লাগে না তোমার কথা, কি বলব! মুসা বলছে এক কথা, তুমি চলে গেলে আরেক কথায়। কেন, কারও গাড়ি থাকতে পারে না?'

'মাথায় কথা রাখতে পারো না, সে জন্যেই তোমাদের কাছে এত কঠিন লাগে। কেন, ভুলে গেলে, জুনের গাড়িটাকে তাড়া করেছিল আরেকটা গাড়ি?'

'টমকে বাদ দিয়ে রাখতে পারো। ওর গাড়িটার চলারই ক্ষমতা নেই। টায়ারগুলো বসা। ব্যাটারি ডাউন হয়ে আছে দুই হপ্তা ধরে।'

'সত্যি কথা না-ও তো বলতে পারে?'

'বলেছে,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'কারণ আমারও সন্দেহ হয়েছিল। তাই ওর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'ও। তার পরেও আরেকটা ব্যাপার বাকি থেকে যায়। লোকটার মেজাজ ভীষণ খারাপ। তোমাকে যে চেন নিয়ে মারতে এসেছিল, সেটাই তার প্রমাণ।'

শ্রাগ করল মুসা। ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল। ইঞ্জিনের থ্রটল পরীক্ষা করার জন্যে ইগনিশনে মোচড় দিল। মিনিট খানেক ঠিকমতই গুঞ্জন করল ইঞ্জিন, তারপরে বিচিত্র একটা শব্দ করল, মনে হলো বলছেঃ হুপ্লা-হুপ্লা-গ্যাক!

'এ রকম করছে কেন?' রবিনের প্রশ্ন। হেসে বলল, 'ইঞ্জিনটাকে জিজ্ঞেস করো তো, এ কথার মানে কি?'

'বলতে চায়, আমাকে কিনে ভুল করেছ। বেচে দিয়ে আরেকটা কেন। আমি বুড়ো মানুষ, আর পারি না।'

'অনুরোধ করো না, আর কটা দিন যেন আমাকে একটু সাহায্য করে। আর কিছু পয়সা জমিয়ে নিই। ওকে মুক্তি দিয়ে দেব।'

'চেষ্টা করলে কিছুটা ভাল হয়তো করা যায়,' মুসা বলল। 'তবে সময় লাগবে। আপাতত এভাবেই চালাও আগামী হপ্তায় দেখি। তার পর? আমার কথা তো বললাম। কিশোর, হেনা তানজামিলা আর হেনরি অগাসটাসের খবর কি?'

হাসল কিশোর। 'হেনাকে ফোন করেছিলাম। অ্যাক্সিডেন্টটা যখন হয়, তখন আরও ছ'জন লোকের সঙ্গে এলিভেটরে আটকা পড়েছিল। চমৎকার অ্যালিবাই। তবে হেনরি অগাসটাসের ব্যাপারটা চমকে দেয়ার মত। ব্যবসায়ে চিকেন লারসেনের সব চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ সে। দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল বলছে, এই কিছুদিন আগে চিকেনের পুরো ব্যবসাটা কিনে নিতে চেয়েছিল হেনরি।'

'তাই? আশ্চর্য!' অবাক হলো রবিন। 'তাহলে তো রাস্তা থেকে ফেলার কথা লারসেনকে। তার মেয়েকে ফেলতে যাবে কেন?'

'জানি না,' গাল চুলকাল কিশোর। 'অন্য ভাবে শাস্তি দিতে চেয়েছে হয়তো লারসেনকে। কিংবা ওর মেয়েকে মেরে ফেলে মন ভেঙে দিতে চেয়েছে। যাতে ব্যবসা নিয়ে আর মাথা না ঘামায় লারসেন।'

'লারসেনের মুরগীতে হেনরিই বিষ মেশাচ্ছে না তো?'

'না-ও হতে পারে। চিকেন নিজেই মেশাতে পারে। আর আরেকজন চরম সন্দেহভাজন লোক তো রয়েই গেছে। সেই লোকটা, যে হাসপাতালে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল। ফারিহাকে নাম বলেনি।'

এই সময় হেডকোয়ার্টারে ফোন বাজতে আরম্ভ করল। ধরতে গেল মুসা।

'তিন গোয়েন্দা। মুসা আমান বলছি,' স্পীকারের সুইচ অন করে দিল সে।

ফারিহা ফোন করেছে হাসপাতাল থেকে। মাত্র তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল সে। আর তা-ই তিন গোয়েন্দাকে গাড়ির দিকে ছুটে যেতে বাধ্য করার জন্যে যথেষ্ট। সে বলেছে, 'জুনের ঘুম ভেঙেছে!'

চার

রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে হাসপাতালে ছুটল তিন গোয়েন্দা। ভটভট ভটভট করে কোনমতে চলল গাড়ি। যতটা স্পীড দেয়া সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। পথে তিনবার বন্ধ হলো ইঞ্জিন। নেমে নেমে ঠিক করতে হলো মুসাকে।

হাসপাতালের সামনে গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। দিল দৌড়। তার পেছনে ছুটল অন্য দু'জন। অ্যাক্সিডেন্টের রাতে কি ঘটেছিল, আজ জানতে পারবে জুনের মুখ থেকে।

'অ্যাই, যাচ্ছ কোথায়! থাম!'

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। সেই লাল চুল নার্স, মারগারেট ইলারসন।

'সরি, যেতে পারবে না,' আজ আর কর্কশ ব্যবহার করল না। হাসলও মৃদু। 'মেয়ের সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার লারসেন। ডাক্তার পরীক্ষা করছেন জুনকে। তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' রবিনের দিকে তাকাল। 'খারাপ না লাগলে আমার এখানেই এসে বসতে পারো।'

হলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। পাঁচ মিনিট কাটতেই যেন পাঁচটা বছর লাগল। তারপর দশ মিনিট। এই অপেক্ষা যেন পাগল করে দেবে তাকে।

আর বসে থাকতে পারল না। এককোণে নিচু একটা টেবিলে কিছু পত্রপত্রিকা পড়ে আছে। এগিয়ে গেল সেগুলোর দিকে।

'এত তাড়া কিসের তোমাদের?' নার্স জিজ্ঞেস করল।

'আছে। অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে জানতে চাই,' ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল কিশোর।

'কিছুই বলতে পারবে না ও। মনে করতে পারবে না। অ্যামনেশিয়ায় ভুগছে।'

অ্যামনেশিয়া! ওই একটি শব্দই যেন হাজার টনী পাথরের মত আঘাত করল কিশোরকে। এত আশা, এত প্রতীক্ষা, সব যেন নিমেষে অর্থহীন হয়ে গেল।

অবশেষে জুনের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন লারসেন। বাইরে এলেন

না, দরজায়ই দাঁড়ালেন। পরনে গাঢ় লাল জগিং স্যুট, হলুদ স্ট্রাইপ দেয়া। বুকের কাছে আঁকা কমলা রঙের মুরগী।

'যাই, হ্যাঁ,' মেয়েকেই বললেন বোঝা গেল। 'কাল আবার আসব। বাড়ি নিয়ে যাব তোকে। কিচ্ছু ভাবিসনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হেসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন লারসেন। হাসিটা মুছে গেল পরক্ষণেই। আনমনে বিড়বিড় করে কি বললেন। মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই বোধহয় হাসি হাসি করে রেখেছিলেন মুখ। তিন গোয়েন্দার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটিবারের জন্যেও ফিরে তাকালেন না।

'কি বলছেন শুনতে পারলে হত,' নিচু গলায় বলল মুসা।

'কি যে করি জাতীয় কিছু বললেন বলে মনে হলো,' আন্দাজ করল রবিন।

'চলো,' জুনের ঘরের দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।

বিছানায় উঠে বসেছে জুন। বয়েস উনিশ-বিশ হবে। পিঠে বালিশ ঠেস দেয়া। এলোমেলো চুল। অনেক সময় একটানা ঘুমানোয় ফুলে আছে মুখ। তবে বড় বড় নীল চোখজোড়া স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার।

'এসেছ,' মুসার দিকে তাকিয়ে যেন ওই একটি শব্দেই হুঁশিয়ার করে দিতে চাইল ফারিহা। রবিন আর কিশোরও বুঝল ওর ইঙ্গিত। জুনের দিকে ফিরল সে, 'জুন, এই হলো আমাদের তিন গোয়েন্দা। ও কিশোর পাশা…ও মুসা আমান, আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড।'

'হাই,' খসখসে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল জুন। 'তোমাদের কথা অনেক শুনেছি।'

হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এখন কেমন লাগছে?'

'আর কেমন। মনে হচ্ছে দালানের তলায় চাপা পড়েছিলাম। একটা হাড়ও আস্ত নেই। সারা গায়ে ব্যথা। বাবা যে কাল কি করে বাড়ি নিয়ে যাবে কে জানে।'

'ও কিছু না। ঠিকই যেতে পারবে। কাল সেরে যাবে, দেখ।'

এসব কথা ভাল লাগছে না কিশোরের। আসল কথায় যেতে চায়। কিছুটা অধৈর্য ভঙ্গিতেই ফারিহার বিছানার পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসল জুনের বিছানার পাশে। 'তোমার অ্যাক্সিডেন্টটার কথা জানতে এসেছিলাম।'

'ফারিহা বলেছে, তোমরা আসবে। তবে আগেই একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমার অ্যামনেশিয়া হয়েছে।'

'কিছুই মনে করতে পারছ না?'

'শেষ কথা মনে করতে পারছি, দু'দিন আগে সকালে আমার বেড়ালটাকে খাইয়ে বাবার অফিসে গিয়েছিলাম। আর কিছু মনে নেই। তবে ডাক্তার ভরসা দিয়েছে এই স্মৃতিবিভ্রম সাময়িক। শীঘ্রি আবার সব মনে করতে পারব। যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে স্মৃতি।'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি,' রবিন বলল। 'অনেক সময় কথা মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে যায় এসব অবস্থায়।'

'তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের কথা কিছুই মনে করতে পারছ না?' কিশোর তাকিয়ে রয়েছে জুনের মুখের দিকে। 'তোমার বাবার অফিসে কি জন্যে গিয়েছিলে?'

'কলেজ থেকে সবে ব্যবসার ওপর ডিগ্রী নিয়েছি,' জুন জানাল। 'তাই বাবার ব্যবসাটায় ঢোকার চেষ্টা করছি। এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করছি। যতই বই পড়ে শিখে আসি না কেন, হাতে কলমে কাজ করাটা অন্য জিনিস।'

'গত শুক্রবারে শেষ কোন ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিলে,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মনে করতে পারো?'

'না।'

'ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে কিছু কথা বলেছ। মনে করতে পারো?'

মাথা নাড়ল জুন।

রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'চলো, বাইরে গিয়েই কথা বলি।'

হলে বেরিয়ে এল তিনজনে। ভোঁতা গলায় কিশোর বলল, 'কোন লাভ হলো না।'

'ফারিহা আশা দিয়েছে,' মুসা বলল। 'হবে।'

'হবে না। বসে বসে টেলিভিশন দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না ওর।'

'আমার তো এখন মনে হচ্ছে, কোন রহস্যই নেই,' নিরাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ফারিহার কথাই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ও এমনিতেও বাড়িয়ে কথা বলে,' ফস করে বলে বসল রবিন।

রেগে গেল মুসা। 'ওর মাথায় আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি। কথা খুব ভাল মনে রাখতে পারে। কয়েক মাস আগেও কোন মেয়ে কোন পোশাকটা পরেছিল, কোন লিপস্টিক লাগিয়েছিল, ঠিক বলে দিতে পারে।'

'খুব ভাল,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'যদি কোনদিন তিন গোয়েন্দা বাদ দিয়ে তিন ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে যাই, তাহলে ওকে আমাদের সহকারী করে নেব।'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

'রাগ কোরো না,' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'জুন একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। মাথায় গোলমাল হওয়াটা স্বাভাবিক। ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকাটা আরও বেশি স্বাভাবিক। এখন তো ধরেছে অ্যামনেশিয়ায়। ওর প্রলাপ বিশ্বাস করে রহস্য খুঁজতে যাওয়াটা কি ঠিক?'

'কেন, তোমার অনুভূতি কি এখন অন্য কথা বলছে...'

'অ্যাই, রাখ রাখ,' হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেছে রবিন। 'একটা কথা...'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'কী?'

'একটা কথা খেয়াল করোনি? অ্যাক্সিডেন্টের দিনের কথা শুধু মনে করতে পারছে না জুন। কেন পারছে না? কেন একটা দিন স্মৃতি থেকে মুছে গেল?'

তাই তো! ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। তবে মনোযোগ দিতে পারল না। চেঁচিয়ে কথা বলছে নার্স মারগারেট, 'আমার কাজ আপনি করবেন? হাসলেন। এক ঘণ্টায়ই কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করবে।' কানে রিসিভার

ঠেকিয়ে মাথা কাত করে কাঁধ উঁচু করে রিসিভারটা ধরে রেখেছে সে। দুই হাত মুক্ত রেখেছে কাজ করার জন্যে। কিছু ফর্মে স্ট্যাম্প দিয়ে সীল মারছে। 'আপনি আমাকে বিরক্ত করে ফেলেছেন, বুঝলেন। আধ ঘন্টা পর পরই জিজ্ঞেস করছেন জুন কেমন আছে। আরও তিরিশজন রোগী আছে এখন আমার হাতে। সবার আত্মীয়রাই যদি এভাবে ফোন করত, এতক্ষণে পাগলা গারদে পাঠাতে হত আমাকে। কেমন আছে জানতে চাইছেন তো? বলতে পারব না। হাসপাতালে এসে দেখে যান।'

রেগে গেছে মারগারেট। চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে আরও রেগে গেল, 'ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস করুন। ধরুন।' খটাস করে রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গটমট করে হেঁটে রওনা হলো।

'জুন কেমন আছে, এতবার জিজ্ঞেস করছে কেন?' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

'কারণ, বেশি উদ্বিগ্ন,' জবাব দিল মুসা।

'উদ্বেগটা কি জুনের অসুখের কারণে? না সে মুখ খুলেছে কিনা জানার জন্যে?' কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। 'মিস্টার এক্সও হতে পারে।'

'এক কাজ করো না,' পরামর্শ দিল রবিন। 'গলার স্বর তো নকল করতেই পার। কথা বলো ওর সঙ্গে। লোকটার কণ্ঠস্বর চিনে রাখো। ডাক্তার হয়ে যাও।'

'ঠিক বলেছ!' দুই লাফে টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল নার্স আসছে কিনা। তারপর রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, 'হালো, ডক্টর পাশা বলছি।' হঠাৎ করেই যেন অনেক বেড়ে গেছে তার বয়েস, ভারি হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর, কারও বাবারও বোঝার সাধ্যি নেই, তার বয়েস চল্লিশের কম।

'কই, এ নাম তো শুনিনি?' ওপাশ থেকে জবাব এল। মসৃণ কণ্ঠ। মাঝবয়েসী একজন মানুষ। দ্রুত কথা বলে। 'এ হাসপাতালে ওই নামের ডাক্তার আছে?'

'তাহলে আমি এলাম কোত্থেকে? নতুন এসেছি। আপনি জুন লারসেনের খোঁজ নিতে চাইছিলেন তো মিস্টার...'

কিশোর আশা করেছে, নামটা বলবে লোকটা। বলল না। জিজ্ঞেস করল, 'ও কেমন আছে?'

'ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া এ খবর কাউকে জানানো নিষেধ। আপনি ওর কে হন?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিল লোকটা, 'আমি ওদের পারিবারিক বন্ধু।'

'ঘনিষ্ঠ?'

'দেখুন, এত প্রশ্ন করছেন কেন? আমি একটা সহজ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, জুন কেমন আছে?'

'হুঁশ ফিরেছে। বিপদ কেটেছে।'

'ও,' লোকটা খুশি হয়েছে না শঙ্কিত হয়েছে বোঝা গেল না ঠিকমত। তবে

উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে মনে হলো কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলতে হবে জুনকে? কি নাম বলব?'

'না, কিছু বলতে হবে না, ডক্টর। থ্যাঙ্ক ইউ,' লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।

'কি বলল?' কিশোরকে চুপ হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তেমন কিছুই বলল না,' আস্তে করে রিসিভারটা ডেস্কে রেখে দিল আবার কিশোর।

তরুণ একজন ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল নার্স। রিসিভার কানে ঠেকিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল। 'রেখে দিয়েছে! লোকটার মাথা খারাপ!'

দুই সহকারীকে নিয়ে সরে এল কিশোর। নিচু গলায় বলল, 'নাহ্, রহস্য একটা আছে, মানতেই হচ্ছে! কিছু একটা ঘটছে! কি, সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'তার মানে কেসটা ছাড়ছ না?' হেসে বলল রবিন। 'আরেকটু হলেই হতাশ করেছিলে আমাকে। কোন রহস্যের সমাধান না করে ছেড়ে দেবে কিশোর পাশা, ভাবাই যায় না।'

'ছাড়ব একবারও বলিনি। মনে হয়েছিল, কোন রহস্য নেই। এখন ভাবছি, ভয়ানক কোন বিপদ ঝুলছে জুনের মাথার ওপর। সেটা জানতে হবে যে ভাবেই হোক। ওর কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।'

তবে থাকাটা সম্ভব হলো না। তিনজনেরই কিছু না কিছু কাজ আছে। বসে থাকে না ওরা কেউই। মুসা আবার গাড়ির ব্যবসা শুরু করেছে। তবে গাড়ি বেচাকেনার চেয়ে মেরামতের দিকেই নজর দিয়েছে বেশি। নিক ওঁকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে ইঞ্জিনের ব্যাপারে (গাড়ির জাদুকর দ্রষ্টব্য)। ওর পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের করভেট গাড়িটার ইগনিশন নাকি ঠিকমত কাজ করছে না, মেরামত করে দেবে কথা দিয়েছে সে। বিনিময়ে অবশ্যই পারিশ্রমিক নেবে।

রবিনকে যেতে হবে ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। একটা ক্লাব একটা রক ব্যাণ্ড চেয়ে পাঠিয়েছে। সেটা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আর কিশোর কথা দিয়েছে মেরিচাচীকে, পাশের বাড়ির মিসেস ব্যালানটাইনকে বাগানের ঘাস কাটায় সাহায্য করবে। মিসেস ব্যালানটাইন মেরিচাচীর বান্ধবী। কিশোর আগ্রহী হয়েছে অবশ্য অন্য কারণে। ওই মহিলারও পেটের চিরকালীন অসুখ আছে। কি কি খেলে ভাল থাকেন, বলতে পারবেন কিশোরকে।

কাজেই সেদিন আর জুনের কাছে থাকা হলো না কারোরই।

পরদিন সকালে হাসপাতালে মুসার সঙ্গে দেখা হলো কিশোরের। আগেই এসে বসে আছে মুসা। কারণ, ফারিহাকে সেদিন ছেড়ে দেয়ার কথা। আর জুনের বাবা বলেছেন, মেয়েকে এসে নিয়ে যাবেন সেদিনই।

হাসপাতাল ছাড়তে নারাজ ফারিহা। কারণ, জুনের প্রলাপ রহস্য ভেদ করার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু থেকেও লাভ নেই। জুন তো আর থাকছে না। তাছাড়া ভাল হয়ে গেলে হাসপাতালই বা ওদেরকে রাখবে কেন?

জুনের শরীর অনেক ভাল হয়েছে। তবে স্মৃতি ফিরে আসেনি। বিছানায় বালিশ ঠেস দিয়ে বসে বাবার আসার অপেক্ষা করছে সে। বকবক করছে, 'বাবাকে তো চিনি। আসবে সেই জগিং স্যুট পরেই। আজ হয়তো দেখা যাবে গরিলা সেজেই এসেছে। ওরকম রোমশ পোশাকও অনেক আছে তার। ব্যাণ্ড পার্টি ন নিয়ে এলেই বাঁচি। সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা স্বভাব।'

দশ মিনিট পর দরজায় দেখা দিলেন লারসেন। 'হাই, খুকি, চিনতে পারছ আমাকে?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন। বাদামী জগিং স্যুট পরেছেন। একটা প্লাস্টিকের তীর ঢুকিয়ে রেখেছেন চুলের মধ্যে। ওই লোকটাও পাগল, মনে হলো মুসার।

'বাবা,' জুন বলল। 'না চেনার কোন কারণ নেই। মাত্র চব্বিশটা ঘণ্টা মনে করতে পারছি না আমি। বিশ বছর নয়। নিশ্চয় চিনতে পারছি তোমাকে। যা আনতে বলেছিলাম এনেছ?'

হাতে করে একটা ছোট স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন লারসেন। মেয়ের সামনে এনে রাখলেন সেটা। খুলল জুন। নীল সিল্কের একটা পাজামা বের করে তুলে ধরে বলল, 'এটা কি?'

'কি আবার, পাজামা,' হাসি হাসি গলায় বললেন লারসেন। 'নীল ব্লাউজটাও নিয়ে এসেছি। দেখ। এগুলো আনতেই তো বলেছিলি, নাকি?'

'যেটাতে বলেছিলাম সেটাতে খোঁজোনি,' হেসে বলল জুন। 'অন্য ওয়ারড্রোব থেকে এনেছ। এই কাপড় পরে বাইরে বেরোনো যায়? তুমিই বলো?'

চোখের সানগ্লাসটা ঠেলে কপালে তুলে দিলেন লারসেন। মেয়ের হাত থেকে নিলেন পাজামাটা। 'কেন, পরা যাবে না কেন? এ জিনিস পরে পার্টিতেও যেতে পারিস। স্বচ্ছন্দে। খারাপটা কি দেখলি?'

'মা বেঁচে থাকলে তোমার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারত এখন। এ জিনিস পরে বাইরেই বেরোয় না মেয়েরা। আর পার্টিতে যাওয়া!'

'কেন, অসুবিধেটা কি? শরীর ঢাকা থাকলেই হলো,' বলতে বলতে ফারিহার দিকে চোখ পড়ল লারসেনের। তুড়ি বাজিয়ে বললেন, 'ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা। ওর একটা কাপড় পরে নিলে পারিস। এই মেয়ে, একশো পনেরো হবে না তোমার ওজন?'

থ হয়ে গেল ফারিহা। 'আপনি জানলেন কি করে?'

'জানব না মানে? তিরিশ গজ দূর থেকেও যে-কোন মুরগী দেখলে বলে দিতে পারি ওটার ওজন। আর তুমি তো মানুষ। তোমার পোশাক জুনের লাগবেই। একই গড়ন।'

'বাবা,' অস্বস্তি বোধ করছে জুন। 'চুপ করো তো। ফারিহা, কিছু মনে কোরো না। বাবার ধারণা, দুনিয়ার সবাই এক। কেউ কিছু মনে করে না,' আবার বাবার দিকে ফিরল। 'বাবা, এটা তোমার অফিসের ইন্টারকমের বোতাম নয়, যে টিপে যা বলবে তাই হয়ে যাবে।'

'আমি কিচ্ছু মনে করিনি,' হেসে বলল ফারিহা। 'নাও না। লাগলে নাও আমার একটা কাপড়। অনেক আছে স্যুটকেসে। পরে ফেরত দিয়ে দিয়ো।'

'আচ্ছাহ্!' হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন জুন। তার বাবার আনা পোশাকগুলো পরে বেরোনোর কথা ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার। স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করল। 'কিছু মেকআপও ধার দিতে হবে। পারবে? আমার আব্বাজান আমার মেকআপ বক্সটা আনতেও ভুলে গেছেন,' নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো গালে। 'তোমার তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, বাবা। তোমার অ্যামনেশিয়া হলো কি করে?'

বোকার হাসি হাসলেন বাবা। 'আমারটা চিরকালের, জানিসই তো···তোর মা এ জন্যে কত বকাবকি করত···'

'জানি।'

নিজের স্যুটকেসটা বয়ে জুনের এলাকায় নিয়ে এল ফারিহা। বিছানায় নামিয়ে রেখে বলল, 'নাও, যা ইচ্ছে বেছে নাও।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বাড়ি গিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

'অত তাড়া নেই। যখন খুশি দিয়ো।'

'অ্যাই, শোন,' জুন বলল। 'আমি জানি বাড়ি গিয়ে কি করবে বাবা। দু'দিনের মধ্যেই একটা পার্টি দেবে। আমার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে উৎসব। এক কাজ করো না, তোমরাও চলে এসো। সবাইকেই দাওয়াত,' তিন গোয়েন্দার কথাও বলল সে। 'পার্টিটা দারুণ হবে, আমি এখনই বলে দিতে পারি। তোমার কাপড়গুলো তখনই নিয়ে যেয়ো।'

'আচ্ছা।'

'খারাপ লাগল না তো? এসে নিয়ে যেতে বললাম বলে?'

'আরে না না, কি যে বলো। বরং খুশি হয়েছি। সত্যি।'

হাসতে গিয়েও চেপে রাখল কিশোর। অতি আগ্রহটা প্রকাশ করল না। মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যাওয়ার জন্যে। চিকেন কিং লারসেনের বাড়িতে দাওয়াত পাওয়ার সৌভাগ্য হবে, লোকটাকে আরও কাছে থেকে দেখতে পাবে, কল্পনাই করেনি কোনদিন। কিছুটা দেখেছে যদিও এই হাসপাতালে, আরও অনেক কিছু দেখা বাকি। জুনের পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে ভাল সুযোগ আপাতত আর কিছু হতে পারে না।

পাঁচ

বিছানার কিনারে বসে পায়ে মোজা টেনে দিল কিশোর। লারসেনের বাড়িতে আজ পার্টির দাওয়াত। অস্বস্তি লাগছে তার। জটিল রহস্যের তদন্ত করতে হবে বলে ভয়টা, তা নয়, ভয় হলো এ ধরনের পার্টিতে অনেক ধরনের মানুষের সমাগম হয়। তাতেও খারাপ লাগত না। কিন্তু পার্টিটা একটা মেয়ের। তাতে ছেলেরা যেমন আসবে, তেমনি আসবে মেয়েরাও। ওদের সঙ্গে এমন সব কথা বলতে হবে ভদ্রতার খাতিরে, এমন আচরণ করতে হবে, যা সে করতে চায় না। মোটকথা ন্যাকামি এবং ভণিতা তার ভাল লাগে না।

উঠে গিয়ে ওয়ারড্রোব থেকে একটা উজ্জ্বল রঙের পোলো শার্ট বের করে গায়ে দিল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের সুন্দর চেহারা এখন ওর জন্যে বিরক্তির কারণ। কোঁকড়া কালো চুল। গভীর কালো চোখে কেমন এক ধরনের মায়া, যেন স্বপ্ন ভরা। এই চোখের দিকে তাকিয়েই মেয়েরা···ধূর! আর ভাবতে চায় না!

আগে মোটামুটি সহজভাবেই মিশতে পারত মেয়েদের সঙ্গে। ইদানীং যতই বড় হচ্ছে, কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে ওর স্বভাব। ভাল অভিনেতা সে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় শুরু করল। ধরা যাক, একটা মেয়ে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল ওর সঙ্গে। বলল, 'এই যে, কিশোর পাশা। তোমার সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম। তুমি খেয়াল করোনি। কিন্তু গত আধ ঘণ্টা ধরে তোমাকে লক্ষ করছি আমি।'

'কে বলল লক্ষ করিনি? আমি সব দেখি। আমার চোখে কিছুই এড়ায় না, জবাব দেবে কিশোর।

'একটা চিকেন নেবে?' সৌজন্য দেখিয়ে কাগজের প্লেটে করে চিকেন লারসেনের একটা বিশেষ খাবার বাড়িয়ে ধরল মেয়েটা।

'না, ধন্যবাদ,' আয়নার দিকে তাকিয়ে কল্পিত মেয়েটাকে বলল কিশোর। 'আমি খাব না। আজেবাজে জিনিস খেতে মানা করে দিয়েছে ডাক্তার।'

'তাই নাকি? তোমার ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে আমার,' হাসি দিয়ে বলল মেয়েটা। 'এ রকম মনের জোরওয়ালা মানুষ আমার ভাল লাগে।'

তার মানে কিশোরকেও ভাল লাগে, এটাই বোঝাতে চাইল মেয়েটা। ধরা যাক, তখন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি জুনের বন্ধু?'

'আসলে, আমি এসেছি খাবারে বিষ মেশানোর একটা ঘটনার তদন্ত করতে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। 'মানে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। 'তুমি গোয়েন্দা! কোন্ খাবারে বিষ মিশিয়েছে?'

'এখনও হয়তো মেশায়নি। হয়তো মেশানোর পরিকল্পনা করেছে। সম্ভবত মুরগীতে।'

আরও অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। 'সর্বনাশ!' কঠিন একটা প্রশ্ন করে বসল, 'কেন মেশাবে? লক্ষ লক্ষ লোককে কে, কি কারণে মারতে চাইছে?'

'জবাবটা এখনও জানি না। হতে পারে হেনরি অগাসটাস লারসেনকে ব্যবসা থেকে তাড়াতে চাইছে। ওরকম আরও হাজারটা কারণ থাকতে পারে। কোনটা যে ঠিক, এখনও বলতে পারছি না।'

'তোমার অনেক বুদ্ধি,' কিশোরের কল্পনায় বলল মেয়েটা।

'জানি। অনেকেই বলে সে কথা।'

'গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে তো অনেক বিপদে পড়তে হয়। পিস্তল চালাতে জানো? কারাতে, জুডো এসব···'

'কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারি। জুডো শিখছি। পুরোপুরি শেখা হয়নি এখনও।'

'কিন্তু হয়ে তো যাবে,' থেমে গেল মেয়েটা। দাঁত দিয়ে নখ কাটল। তারপর আসল কথাটা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন গার্লফ্রেণ্ড আছে?'

এই রে! সেরেছে! আমতা আমতা করে বলল কিশোর, 'ইয়ে...মানে...'

'কিশোর! তোমার হলো?'

চমকে বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন। নেভি ব্লু কাপড়ে লাল স্ট্রাইপ দেয়া পোলো শার্ট গায়ে। পরনে ধবধবে সাদা প্যান্ট। সুন্দর লাগছে ওকে।

'কার সঙ্গে কথা বলছিলে?' গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কারও সঙ্গে না,' জবাব দিল কিশোর। 'কেসটা পর্যালোচনা করছিলাম,' লাল হয়ে গেছে মুখ।

কোন চিন্তা মাথায় থাকলে একা একা কথা বলে কিশোর, ভাবনাগুলোই বিড়বিড় করে ভাবে, জানা আছে রবিনের। তাই আর এ নিয়ে মাথা ঘামাল না।

বেল এয়ারে চিকেন লারসেনের বিরাট বাড়ি। আগেই হাজির হয়ে গেছে মুসা আর ফারিহা। কিশোরদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'বাড়ি দেখেছ!' দুই বন্ধুকে দেখেই বলে উঠল মুসা। 'গেট থেকে পুল পর্যন্ত যেতেই বাস লাগবে! আরিব্বাপরে বাপ!'

তিনতলা বিশাল বাড়িটায় আটচল্লিশটা ঘর। আইভি লতায় ছাওয়া দেয়াল। কত কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন চিকেন কিং, বাড়িটা দেখলেই আন্দাজ করা যায়। আরেকটা জিনিস স্পষ্ট, কি ব্যবসা করে টাকা কামিয়েছেন তিনি। সর্বত্র মুরগীর ছবি। যেখানে সুযোগ মিলেছে, মুরগীর ছবি আঁকা হয়েছে। যেখানে আঁকার জায়গা নেই, যেমন লনে, সেখানে রবারের মুরগী বানিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাড়ির পেছনে পুলের ধারে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে কম করে হলেও দু'শো জন তো হবেই। পুলটার চেহারাও বিচিত্র। মুরগীর আকৃতিতে তৈরি। তার পাশে ফ্রাইড চিকেন খেতে খেতে হাসাহাসি করছে একদল ছেলেমেয়ে।

'আমরা কিন্তু এখানে শুধু মজা করতে আসিনি,' ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। 'ফারিহা, গোয়েন্দা হওয়ার খুব শখ তো তোমার। ট্রেনিং নিতে শুরু করো। যা বলব ঠিক তাই করবে। জুনের কাছ থেকে কাপড়গুলো নেবে না, ভুলে যাওয়ার ভান করে থাকবে। তাতে আরেকবার ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে।'

'আচ্ছা,' ঘাড় কাত করে বাধ্য মেয়ের মত বলল ফারিহা। 'চলো, জুনের কাছে যাই। তোমরা যে এসেছ দেখা করা দরকার।'

ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল চারজনে। সবার হাতেই কাগজের প্লেট। এমন ভঙ্গিতে খাচ্ছে, যেন জীবনে এই প্রথম মুরগীর স্বাদ পেয়েছে। এই আরেকটা জিনিস বিরক্ত লাগে ওর। মানুষগুলো এমন করে কেন? পোশাক-আশাকে তো কাউকেই দরিদ্র বলে মনে হচ্ছে না। তার পরেও অন্যের বাড়ির খাবার পেলে এমন

হ্যাংলামো করে! বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল সে।

'কিশোর,' রবিন বলল। 'একটা অন্তত খাও। একটাতে তো আর মরে যাবে না।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। মাথা নাড়ল, 'না, খাব না।'

'তুমি আসলেই একটা গোঁয়ার···'

'হাই,' খানিক দূর থেকে বলে উঠল একটা মেয়ে। কিশোরদেরই সমবয়সী। খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল। এক হাতে মুরগীর প্লেট, আরেক হাতে খালি একটা কাপ, সোডা ওয়াটার ছিল, খেয়ে ফেলেছে। আঁতকে উঠেছিল কিশোর, তাকেই ডাকছে ভেবে। যখন দেখল রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

'তুমি আসার পর থেকেই তোমাকে দেখছি,' রবিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল মেয়েটা।

রবিনও হাসল। 'তোমাকে তো চিনলাম না?'

চোখ কপালে তুলল মেয়েটা। 'হায় হায়, বলো কি! আমাকে চেনো না? আরে আমি, আমি, ভাল করে দেখো তো চিনতে পারো নাকি?'

ব্যস, শুরু হয়ে গেছে ন্যাকামি। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

কিন্তু রবিন দিব্যি হেসে চলেছে। মেয়েটার কথার জবাব তার মত করেই দিচ্ছে।

মরুকগে! একটা লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। চিকেন লারসেনকে দেখতে লাগল। নাইট ক্লাবের কমেডিয়ানের মত আচরণ করছেন বিশালদেহী মানুষটা। একটু পর পরই গমগম করে উঠছে তাঁর ভারি কণ্ঠ। হা হা করে হাসছেন। পুলের পানির ওপর দিয়ে যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সে হাসি।

হঠাৎ আরেকটা কণ্ঠ কানে আসতেই ঝট করে সেদিকে ফিরল কিশোর। ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। সাদা স্যুট পরা একটা মানুষ, নিজের পরিচয় দিচ্ছে সোনালি চুলওয়ালা এক মহিলাকে। একটা বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ফেলিক্স আরোলা।'

'নোরা অরলিজ,' মহিলা নিজের নাম বলল।

'ভালই হলো দেখা হয়েছে,' লোকটা বলল।

যতই শুনছে ততই নিশ্চিত হচ্ছে কিশোর, এই কণ্ঠ সে শুনেছে। চিনতে পারছে।

কথায় কথায় নোরা জিজ্ঞেস করল, লোকটা কি করে।

'মার্কেট রিসার্চ। কিছু বিশেষ খাবার চালানোর চেষ্টা করছি। খেয়ে দেখবেন? দেব? খুব ভাল লাগবে।'

'দিন। এতই যখন বলছেন।'

কাগজে মোড়ানো ছোট একটা ক্যাণ্ডি বের করে দিল আরোলা।

ভাল করে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'অদ্ভুত নাম! মিরাকল টেস্ট!' মোড়কে লেখা নাম পড়ে বলল মহিলা।
'আমাদের কোম্পানির নতুন আবিষ্কার,' আরোলা বলল হেসে।
মোড়ক খুলল নোরা। চকলেট রঙের একটুকরো মিষ্টি খাবার। তাতে মাখন মেশানো। দেখতে পাচ্ছে কিশোর।
'কিন্তু ক্যাণ্ডি যে আমি খাই না?' নোরা বলল।
'ভয় নেই,' অভয় দিয়ে বলল আরোলা। 'এতে ক্যালোরি বাড়বে না। জিরো ক্যালোরি। ওই যে মিরাকল কথাটা লেখা আছে না, খামোকা নয়। খেয়েই দেখুন।'
মহিলার হাত ধরে প্রায় জোর করে ক্যাণ্ডিটা তার মুখে ঠেলে দিল আরোলা। 'খান। বুঝবেন, না খেলে কি স্বাদ মিস করতেন।'
অবশেষে কামড় দিয়ে ছোট একটুকরো ভেঙে মুখে পুরল নোরা। 'বাহ্! দারুণ তো!'
খাবার লোভে নয়, কি এমন মজা সেটা বোঝার জন্যে জিভ প্রায় বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। রহস্যময় লাগছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল আরোলা। একটা বিজনেস কার্ড আর একটা ক্যাণ্ডি কিশোরের হাতেও গুঁজে দিল সে।
মোড়ক খুলে মুখে পুরে দিল কিশোর। মসৃণ, মাখন মাখন এক ধরনের স্বাদ।
'কেমন লাগছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।
'তিন ধরনের স্বাদ একসঙ্গে,' জবাব দিল কিশোর। 'চকলেট, মার্শম্যালো আর মিন্ট। সত্যিই ক্যালোরি নেই? কি করে সম্ভব?'
'সম্ভব। ফ্লেভারটাই আসল। মিরাকল টেস্ট কি আর সাধে বলা হয়েছে। ক্যালোরি ছাড়া ক্যাণ্ডি, সাংঘাতিক আবিষ্কার, কি বলো?'
বড় বড় হয়ে গেছে কিশোরের চোখ। সত্যিই চমৎকার স্বাদ। তারপর বলছে ক্যালোরি ফ্রী। কি করে সম্ভব? এতই আগ্রহী হয়েছে সে, আরোলার কণ্ঠস্বরের কথাই ভুলে গেল ক্ষণিকের জন্যে।
ওর কোন সন্দেহ নেই, এই লোকই ফোন করেছিল হাসপাতালে। নার্সকে বিরক্ত করেছিল। বার বার জুনের খবর জানতে চেয়েছিল।
'তোমার কার্ড নেই নিশ্চয়?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল আরোলা। 'সমঝদার খানেওয়ালা তুমি, বুঝতে পারছি। তোমাকে টেস্ট করিয়ে ভাল করেছি। নামঠিকানা জানা থাকলে ভাল হত।'
হেসে উঠল মহিলা। 'ওর আর কি কার্ড থাকবে? টিনএজার। হাই স্কুলে পড়ে বোধহয়। ব্যবসা-ট্যবসা কি আর করে?'
কে বলেছে কার্ড নেই?—কথাটা প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল কিশোরের। সামলে নিল সময়মত। আর যাকেই দিক, এই মুহূর্তে ফেলিক্স আরোলাকে তিন গোয়েন্দার কার্ড দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। সতর্ক হয়ে গেলে লোকটা তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না। অনেকগুলো প্রশ্ন করার ইচ্ছে আছে কিশোরের। এই যেমন, কেন হাসপাতালে ফোন করেছিল? কেন রহস্যময় আচরণ করেছে ফোনে? জুন আর লারসেনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

এই সময় সেখানে এসে হাজির জুন। আরোলার হাত ধরল। 'আরেকটা ক্যাণ্ডি দিন। এত ভাল ভাবিইনি। একটার পর একটা যে খেতে চাইব, একথা কিন্তু একবারও বলেননি।'

তাকে আরেকটা ক্যাণ্ডি দিল আরোলা। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'ওরও ভাল লেগেছে। ও খুব সমঝদার, বুঝে গেছি...'

'থামুন থামুন,' তাড়াতাড়ি হাত তুলল জুন। 'ওকে আপাতত পাবেন না। কাজে লাগাতে চান তো? হবে না। কারণ এখন ওকে আমি দখল করেছি। ওকে আর ওর দুই বন্ধুকে। ওরা তিন গোয়েন্দা। আমাকে সাহায্য করছে। অ্যাক্সিডেন্টের দিন কি কি ঘটেছিল আমার, বের করার চেষ্টা করছে।'

ভেতরে ভেতরে চমকে গেলেও মুখটাকে স্বাভাবিক রাখল কিশোর। তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে মস্ত ক্ষতি করেছে জুন।

'তাই নাকি?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ সরু সরু হয়ে এল আরোলার। 'তোমাকে দেখে কিন্তু কিছুই মনে হয়নি।'

মুসা আর রবিনকে এখন দরকার। জলদি। কোন ধরনের একটা সূত্র পেতে যাচ্ছে কিশোর, সেটা কি, এখনও বুঝতে পারছে না অবশ্য।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। আরোলাকে 'এক্সকিউজ মি' বলে রওনা হলো ভিড়ের ভেতর দিয়ে, দুই সহকারীর খোঁজে। 'মুরগী পুলের' ঠোঁটের কাছে জটলা করছে কিছু লোক, তার মাঝখানে যেন 'কিং হয়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন চিকেন কিং লারসেন। সবার মাথার ওপর দিয়ে চোখে পড়ছে তাঁর মাথা। পড়বেই। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা মানুষ খুব কমই আছে। চট করে চোখে পড়ার আরেকটা কারণ তাঁর পোশাক। উজ্জ্বল কমলা রঙের জগিং স্যুট, বুকের কাছে এমব্রয়ডারি করে আঁকা রয়েছে একটা মুরগী।

'বললাম তো জানি না,' প্রায় চিৎকার করে কথা বলছেন লারসেন। 'ছাড়া পেলেই কেন যে রাস্তা পেরিয়ে আরেক দিকে দৌড় দিতে চায় মুরগীরা, এ রহস্য আমিও ভেদ করতে পারিনি,' তারপর হহ্ হহ্ হ করে জোরে জোরে হাসলেন তিনি। কি মজা পেল শ্রোতারা ওরাই জানে, হো হো করে হাসতে লাগল।

'মিস্টার চিকেন,' একজন বলল। 'আচ্ছা বলুন তো, মাখন মাখানো মুরগীর মাংসের কেক নিয়ে কবে গোলমালটা হয়েছিল?'

'উনিশশো ছিয়াশিতে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন লারসেন। 'ওরকম খাবার সহ্য করতে পারছিল না আসলে লোকে, বেশি রিচ...'

'ছিয়াশি নয়, পঁচাশি,' ফস করে বলে বসল কিশোর। জবাবটা মুখে এসে গেছে, না বলে পারল না। 'আপনার ভুল হয়েছে, স্যার।'

একসঙ্গে সবগুলো মুখ ঘুরে গেল কিশোরের দিকে। চিকেন লারসেন সহ।

'আমার মনে আছে,' আবার বলল কিশোর। 'সে বছরই আপনি একটা ফোয়ারা বানিয়েছিলেন। তার পাশে হোস পাইপের ব্যবস্থা করেছিলেন। আপনার রান্না করা মুরগী খাওয়ার পর বাচ্চারা যাতে পানি ছিটিয়ে মজা করতে পারে।'

'তুমি তো একটা জিনিয়াস হে!' এগিয়ে এলেন লারসেন। ভালুকের থাবার

মত বিশাল থাবায় চেপে ধরলেন কিশোরের হাত।

ঝাঁকাতে গিয়ে কিশোরের মনে হলো, ওই হাত নাড়ার সাধ্য তার নেই।

'তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল, বুঝতে পারছি,' লারসেন বললেন। 'এক কাজ করো না। আমি কি কি করেছি, সেই ইতিহাসগুলো তুমিই বলে দাও। সবাই শুনুক। আমিও শুনি। নিজের পুরানো দিনের কথা শুনতে ভালই লাগে মানুষের।'

'বেশ,' ছোট্ট কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'উনিশশো ছিয়াশি সালে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অয়েলে চিনি মিশিয়েছিলেন আপনি। আপনার রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে লম্বা একটা মুরগীর মিছিল পার করিয়েছিলেন। মুরগীগুলোর গলায় ঝুলছিল লাল রঙের মলাটের টুকরো। তাতে সোনালি অক্ষরে লেখা ছিলঃ চিকেন লারসেনের জন্যে আমি সব করতে রাজি।'

'নাহ্, এই ছেলেটাকে আমি পালকপুত্র করে নেব!' জনতার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন লারসেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, 'জুন, তোর একটা নতুন ভাই জোগাড় করেছি!'

মুরগীর ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনায় মগ্ন কিশোর আর লারসেন, মুসা আর ফারিহা তখন জুনের সঙ্গে আলাপ করছে। পুলের নিচু ডাইভিং বোর্ডের ওপাশে রয়েছে ওরা।

'দারুণ পার্টি দিয়েছ,' ফারিহা বলল। 'এত্তো লোক! কারা ওরা?'

'জানি না। কোত্থেকে দাওয়াত করে এনেছে বাবা, বাবাই জানে, 'জুতো খুলে পানিতে পা ডোবাল জুন। 'যাকে পায় তাকেই দাওয়াত করে বসে বাবা, কিংবা ফ্রী কুপন দিয়ে দেয়, স্বভাবই এরকম। আমি হয়েছি ঠিক উল্টো। ভালমত না জেনে না বুঝে কিছু করতে পারি না। এই স্মৃতিবিভ্রমের ব্যাপারটা খেপিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কেবলই মনে হয়, কেন মনে করতে পারি না! লোকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেঃ তুমি ভাল হওয়ায় খুশি হয়েছি। যারা বলে তাদেরকে চিনতে পারি না। অসহ্য লাগতে থাকে!'

'লম্বা একটা লোককে দেখেছ কখনও, মনে পড়ে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'কুৎসিত চেহারা। আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরে?'

মাথা নাড়ল জুন। 'নাহ্। কেন?'

'তোমাকে ওর কথা বলতেই ভুলে গেছি,' ফারিহা বলল। 'আমরা ওর নাম রেখেছি মিস্টার এক্স। যে রাতে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সে রাতে হাসপাতালে তোমার ঘরে এসেছিল সে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, লোকটা তোমার অপরিচিত। হওয়ার কারণ আছে। আর একটিবারও আসেনি সে এরপর।'

ভুরু কুঁচকে গেল জুনের। চোখে ভয় দেখা দিল বলে মনে হলো মুসার।

'থাক অসব কথা,' হাত নেড়ে বলল সে। 'তোমার গাড়িটার কি অবস্থা, জুন? আমি ইঞ্জিনের কাজ জানি। চাইলে আমার সাহায্য নিতে পারো।'

'আমার গাড়ি? সোজা ওটাকে জাংকইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা। একবার চোখের দেখাও দেখতে দেয়নি আর আমাকে। তার ধারণা, অপয়া গাড়ি।'

'অ্যাক্সিডেন্টের দিন যা ঘটেছিল কিছুই মনে করতে পারছ না?' ফারিহা

জিজ্ঞেস করল।

'না। দিন গেলে হয়তো মনে পড়বে। আগামী হপ্তায়ও পড়তে পারে।'

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে কিশোরের ওয়ার্কশপে আলোচনা করতে বসল তিন গোয়েন্দা। মুসা আর রবিন পিজা চিবুচ্ছে। কিশোর এক টুকরো ফ্রুটকেক নিয়ে এসেছে ফ্রিজ থেকে, মেরিচাচীর তৈরি। তাতে পেটের ক্ষতি হবে না।

'হাসপাতালে ঘন ঘন ফোন না হয় করলই ফেলিক্স আরোলা,' মুসা বলল একসময়। 'তাতে কি?'

'ওর বলার ধরনটাই পছন্দ হয় না আমার,' স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। 'সেজন্যেই সন্দেহটা জেগেছে।'

'বেশ, তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেব আমরা,' রবিন বলল। লম্বা চুমুক দিল কোকাকোলার বোতলে। 'তো, কাল তাহলে যাচ্ছ চিকেন লারসেনের ওখানে?'

'যেতে তো বলেই দিয়েছে,' কিশোর বলল। 'পালকপুত্রই প্রায় করে নিয়েছে পার্টিতে। আমিও যতটা সম্ভব খাতির জমিয়েছি। কায়দা করে অনুমতি আদায় করে নিয়েছি, তাঁর রিসার্চ ল্যাব আর মেইন অফিসে ঢোকার।'

'কি পাবে বলে মনে হয়?' মুসার প্রশ্ন। 'বিষের বাক্স?' আঙুলে লেগে থাকা মাখন চেটে খেতে লাগল সে।

'কি পাব জানি না। সব নির্ভর করে কতটা গভীরে ঢোকার সুযোগ পাব আমরা, কতখানি দেখতে পারব, তার ওপর।'

'যেতে পারলে খুবই ভাল হত,' রবিন আফসোস করল। 'কিন্তু...'

'পারছ না, এই তো? ট্যালেন্ট এজেন্সিতে যেতে হবে। তা যাও।'

'আজকাল আর আমাকে দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না তিন গোয়েন্দার,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'ভাবছি এজেন্সির চাকরিটা ছেড়েই দেব...'

'তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না। দেখাই যাক না, কি হয়?'

খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল তিনজনে। ওয়ার্কশপ বন্ধ করে দিল কিশোর। রবিন আর মুসাকে এগিয়ে দিতে চলল লোহার বিশাল গেটের দিকে। ওদের গাড়িগুলো পার্ক করা রয়েছে ওখানে। লালচে হয়ে এসেছে আকাশ। তবে বেশিক্ষণ সে রঙ থাকল না।

'অ্যাই, দেখো,' হাত তুলল মুসা। 'রাস্তার ওপারে!' ব্লকের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের পোরশে কনভারটিবল। 'কম করে হলেও ষাট হাজার ডলার দাম। দুর্দান্ত জিনিস।'

গাড়ি দেখছে না কিশোর, তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। বনেটের ওপর ঝুঁকে রয়েছে যে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখেছ। আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। আমাদের মিস্টার এক্সও ওই পোশাকই পরেছিল...'

তাই তো! গাড়ির দিকেই নজর ছিল কেবল মুসার, আর কোনদিকে নয়। বরফের মত জমে গেল যেন সে। একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই দৌড় দিল সেদিকে।

পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় ফিরল লোকটা। মুসাকে দেখেই বনেট নামিয়ে

গিয়ে টান দিয়ে খুলল ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা।
'অ্যাই, শুনুন! দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে বলল মুসা।
কিশোর আর রবিনও ছুটতে শুরু করেছে তার পেছনে।
কিন্তু থামল না আর্মি জ্যাকেট পরা লোকটা। তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল।
চোখের পলকে ঘুরে গেল মুসা। ছুটল তার নিজের গাড়ির দিকে। একটানে দরজা খুলে ভেতরে বসেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সাঁই সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে তুলে নিয়ে এল রাস্তায়। পিছু নিল পোরশের।
'চল বেটা, জলদি কর,' নিজের শিরোকোকে অনুরোধ করল মুসা। 'ওটাকে ধরা চাই। পালাতে না পারে।'
কিন্তু মোড়ের কাছে পৌঁছে ব্রেক চেপেই বোকা হয়ে গেল সে। কিছুই হলো না। কাজ করছে না ব্রেক। প্যাডাল চেপে অযথাই পাম্প করে চলেছে সে, কিন্তু চাপ লাগছে না কোন কিছুতে।
পঞ্চাশ মাইল তুলে ফেলেছিল গতিবেগ। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি সামনের চৌরাস্তার দিকে। ট্র্যাফিক পোস্টের লাল আলো জ্বলছে।

ছয়

একটা মুহূর্তের জন্যে প্যাডাল চাপা বন্ধ করছে না মুসা। কাজ তো করা উচিত! সে নিজে সব কিছু চেক করে। ব্রেক ফ্লুইড ঠিক আছে কিনা নিয়মিত দেখে।
কিন্তু, কথাটা সত্যি, ব্রেক কাজ করছে না। কোনমতেই চাপ দিচ্ছে না চাকায়। গতিরোধ করার চেষ্টা করছে না। পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ফলে গতি তো কমছেই না, আরও বাড়ছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চৌরাস্তায় গিয়ে পড়বে। ভাগ্য ভাল হলে কোন গাড়ির গায়ে গুঁতো না লাগিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। তবে লাগার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ লাল আলো জ্বলছে তার দিকটায়। অন্যদিকের গাড়িগুলো চলাচল করছে। ওগুলোর চালকদের জানার কোনই উপায় নেই যে মুসার গাড়ি ব্রেক ফেল করেছে।
মুসার মনে হচ্ছে তার গলার ভেতরে একটা আস্ত আপেল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। বেরও করতে পারছে না, গলা দিয়ে নামাতেও পারছে না। ঘেমে ভিজে গেছে হাতের তালু।
কিন্তু মাথাটা এখনও ঠাণ্ডাই রেখেছে। ভেজা তালু দিয়ে চেপে ধরল গিয়ারশিফট নব। একটানে নামিয়ে নিয়ে এল ফোর্থ গিয়ার থেকে সেকেণ্ড গিয়ারে। গতি কমানোর জন্যে। ইতিমধ্যে সামনের পোরশেটা মোড় নিল গতি না কমিয়েই। রাস্তায় ঘষা খেয়ে আর্তনাদ তুলল টায়ার। ঘুরে গেল গাড়িটা। দ্রুত সরে যেতে লাগল।
গতি কমছে শিরোকোর, তবে যথেষ্ট নয়। চৌরাস্তাটা আর মাত্র একশো গজ দূরে। হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপাশের গাড়িগুলো। এপাশের হলুদ সিগন্যাল

এখনও জ্বলেনি।

জোরে হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করল একটা নীল হোণ্ডা।

ধপ ধপ করে লাফাচ্ছে মুসার হৃৎপিণ্ড। গিয়ার আরও নিচে নামাল সে। তারপর চেপে ধরল হ্যাণ্ডব্রেক। একই সঙ্গে ডানে কাটল স্টিয়ারিং।

নিমেষে রাস্তা থেকে একটা শূন্য জায়গায় নেমে এল গাড়ি। কিছু বাড়িঘর উঠবে ওখানে, তারই প্রস্তুতি চলছে। মাটি এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। তাতে আরও কিছুটা গতি কমল গাড়ির। লম্বা ঘাসের ভেতরে পড়ে আছে কয়েকটা সিমেন্টের স্ল্যাব, সেগুলোতে ধাক্কা লেগে থেমে গেল শিরোকো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। সীটবেল্ট বাঁধা না থাকলে উইণ্ডশীল্ডে গিয়ে বাড়ি লাগত মুসার মাথা।

মরতে মরতে বাঁচলাম! ভাবল সে। লম্বা দম নিতে লাগল নিজেকে শান্ত করার জন্যে। তারপর দরজা খুলে নেমে এল টর্চ হাতে। গাড়ির পাশে বসে পড়ে নিচে আলো ফেলে দেখতে লাগল ক্ষতিটা কোথায় হয়েছে। হুঁম্, তাহলে এই ব্যাপার! ব্রেকের ফ্লুইড লাইন কাটা! ইগনিশন থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। গোধূলি শেষ হয়ে অন্ধকার নামতে আরম্ভ করেছে তখন। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে চলল সে।

দুই ক্যান সোডা ওয়াটার গেলার পর অনেকটা শান্ত হলো মুসার কাঁপুনি। হেডকোয়ার্টারের ট্রেইলারটা যে জঞ্জালের স্তূপের ভেতর লুকানো, তার বাইরে তিনটে পুরানো লোহার চেয়ারে বসেছে রবিন আর কিশোরের সঙ্গে।

'যাক,' কিশোর বলল। 'অবশেষে মিস্টার এক্সের দেখা মিলল।'

'ব্যাটা শয়তান,' এখনও রাগ কমেনি মুসার। 'ব্রেকের লাইন ও-ই কেটে রেখেছিল। এমন ভান করছিল, যাতে আমি ওকে ফলো করি। কিংবা আমরা সবাই করি। এবং করলেই গিয়ে বাড়ি খাই পাহাড়ে।'

'তিন গোয়েন্দার নাম মুছে যেত তাহলে। কিংবা দুই গোয়েন্দা হয়ে যেত এতক্ষণে।'

'আমি ভাবছি,' রবিন বলল। 'লোকটা কে? আমাদের পিছে লেগেছে কেন?'

'আর কি করেই বা জানল, যে আমরা তদন্ত করছি?' যোগ করল কিশোর।

'এটা আরেক রহস্য। পার্টিতে কিন্তু দেখিনি ওকে।'

'আর্মি জ্যাকেট পরা ওরকম কাউকে চেনে না জুন,' মুসা বলল। 'তারমানে...'

'সে লারসেন পরিবারের কেউ নয়,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। 'কারও হয়ে কাজ করছে।'

'কার?'

জবাব দিতে পারল না কেউ। তিনজনেই প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে ঘুমাল সে রাতে।

পরদিন সকালে ইয়ার্ডের গেটের বাইরে একটা অপরিচিত গাড়ি হর্ন দিতে লাগল, আর টেলিফোনটাও বেজে উঠল একই সঙ্গে। অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে কিশোর। ওসিলোস্কোপ দিয়ে ওর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা

করছিল সে। ফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। একটা রহস্যের সমাধান হলো। অপরিচিত হর্নটা মুসার গাড়ির। অচেনা, তার কারণ শিরোকোটা আনেনি মুসা। নিয়ে এসেছে আরেকটা, ওর মায়েরটা।

টেলিফোনটাও অবাক করল কিশোরকে।

'কিশোর, আমি জুন লারসেন বলছি। আমার ব্রিফকেস!'

ইঙ্গিত কিংবা সঙ্কেত খুব ভালই বোঝে কিশোর, কিন্তু জুনের কথা তাজ্জব করে দিল ওকে। তবে সে প্রশ্ন করার আগেই জুন বলল, 'এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছি আমি। তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ব্রিফকেসটা, পাচ্ছি না,' লম্বা দম নিল সে। 'এর আগে পর্যন্ত ওটার কথা ভুলেই ছিলাম। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর মনে পড়েছে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। 'তোমার স্মৃতি ফিরতে আরম্ভ করেছে।'

'মনে হয়,' জুন বলল। 'যাই হোক, ব্রিফকেসটা পাচ্ছি না। কেন ওটা এত খুঁজছি তা-ও বুঝতে পারছি না। ভেতরে বোধহয় জরুরী কিছু ছিল।'

'আমি আর মুসা তোমার আব্বার অফিসে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।'

'অফিসেও ফেলে রেখে আসতে পারি। খুঁজতে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু কদিন যেতে বারণ করে দিয়েছে বাবা। বলেছে রেস্ট নিতে। আচ্ছা, একটা কথা, শুক্রবারে অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার আগে আমি কোথায় ছিলাম, বের করতে পারবে?'

ঠিক এই কাজটা করার কথাই ভাবছিলাম, মনে মনে বলল কিশোর। জুনকে বলল, 'দেখি, খোঁজখবর করব। কখন কোথায় যাও, লিখেটিখে রাখার অভ্যাস আছে, ক্যালেণ্ডারে? থাকলে ভাল হত। একটা সূত্র পেতাম।'

'রাখি। নীল রঙের মরক্কো লেদারে মোড়া একটা সুন্দর ডায়েরীতে। ব্রিফকেসেই রাখি ওটা।'

গাড়ির হর্ন বাজাতে আরম্ভ করল আবার মুসা, তালে তালে, একটা বিশেষ ছন্দ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা নিয়ে সব রকমে ভেবে নিই,' কিশোর বলল জুনকে। 'রাতে ফোন করব।'

'আচ্ছা। আমারও কিছু মনে পড়লে জানাব তোমাকে,' লাইন কেটে দিল জুন।

বাইরে বেরোল কিশোর। ততক্ষণে বনেট খুলে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মুসা। ইঞ্জিন সামান্যতম গোলমাল করলে সেটা দেখা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

'জুন ফোন করেছিল,' কিশোর জানাল। 'ওর ব্রিফকেসটা নাকি পাচ্ছে না। জরুরী কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে ওর।'

কিশোরের দিকে না তাকিয়েই মুসা বলল, 'আমি শিওর, মিস্টার এক্স ওটাই খুঁজছিল হাসপাতালে।'

মুখ তুললে দেখতে পেত উত্তেজনায় চোয়াল ঝুলে পড়েছে কিশোর পাশার। 'একটা সাঙ্ঘাতিক কথা বলেছ তো! মনেই হয়নি আমার!'

গাড়িতে উঠে বসল দু'জনে। রওনা হলো চিকেন লারসেনের স্যান

ফারনানদো ভ্যালির অফিসে। যাওয়ার পথে দেখতে পেল ঢালের নিচে তরাইয়ে তেমনি পড়ে আছে মুসার গাড়িটা।

একটা পেট্রল স্টেশনে থামল মুসা। মেরিচাচীর বোনপো নিকি পাঞ্চকে ফোন করার জন্যে। যাকে এক ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল তিন গোয়েন্দা। গাড়ির জাদুকর বলা যায় লোকটাকে। দিন কয়েক হলো আবার ফিরে এসেছে রকি বীচে। গাড়ি মেরামতের একটা গ্যারেজ করার কথা ভাবছে এখানে। উঠেছে ম্যালিবু বীচে এক বন্ধুর সঙ্গে একটা কটেজ ভাড়া করে। গরমকালটা কাটাবে এখানে, গাড়িটাড়ি মেরামত করবে, ব্যবসাটা জমে গেলে চিরস্থায়ীই হয়ে যাবে।

'নিকিভাই?' ফোনে বলল মুসা। 'মুসা। আমার গাড়িটা একটু দেখবেন?'

'কোনটা? শিরোকোটা?'

'হ্যাঁ। গাড়িটা পড়ে আছে। তুলে নিয়ে গিয়ে মেরামত করে নিন, কয়েক দিনের জন্যে চালাতে দেব। একটা গাড়ি আপনার দরকার বলেছিলেন না?'

নিকির সঙ্গে আলোচনা করে গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে আবার গাড়িতে ফিরে এল মুসা।

চিকেন লারসেন করপোরেশনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি রাখল। ছয়তলা একটা আধুনিক বাড়িতে লারসেনের অফিস।

চিকেন করপোরেশনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল মুসা। জায়গাটা দেখে হাসি পেল দু'জনেরই। এখানেও লারসেনের বিচিত্র রুচির নিদর্শন স্পষ্ট। আধুনিক ছ'তলা একটা বাড়ি আর এক চিলড্রেন পার্কের মিশ্রণ যেন। ভিজিটরস গেটে তালা দেয়া। ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হয়। ইন্টারকমে কথা বলতে গেল মুসা। মুরগীর আকৃতিতে তৈরি ইন্টারকম দেখে হাসি পেল। কেন ঢুকবে, প্রশ্ন করা হলে খাবারের অর্ডার দিল সে। চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা বলল। ভাবল, আগে ভেতরে ঢুকি তো, তারপর দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।

ইলেকট্রনিক সিসটেমে হাঁ হয়ে খুলে গেল গেট। লাল-হলুদ রঙ করা বাড়িটার দিকে গাড়ি চালাল মুসা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কাজ করেন লারসেন। চওড়া হাসি দিয়ে স্বাগত জানালেন ওদের। পরনে লাল জগিং স্যুট। কিশোরকে দেখেই বললেন, 'একটা ধাঁধার জবাব দাও। বলো তো কোন্ সালে পেষানো মুরগীর মাংসে গাজর মেশাতে আরম্ভ করেছি?'

'উনিশশো সাতাশি সালে। ছোট ছোট টিনে ভরে সাপ্লাই দিতেন।'

'অ্যাই, কি বলেছিলাম! বলিনি, ছেলেটা পারবেই!' কাছাকাছি যত লোক আছে সবাইকে শোনানোর জন্যে চেঁচিয়ে বললেন লারসেন। গলা তো নয়, মাইক। 'তুমি একটা পাগল, পুত্র, সন্দেহ নেই, তবে আমার মত পাগল। দাঁড়াও, আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা দু'জনে যে কোন সময় ঢুকতে পারবে। আমাদের এখানে সিকিউরিটি খুব কড়া,' চাপড় মেরে কিশোর আর মুসার পিঠে স্টিকার লাগিয়ে দিলেন তিনি।

কিশোরের পিঠে কি লাগানো হয়েছে, দেখে মুসা তো থ। সন্দেহ হতে নিজের

পিঠেরটা দেখাল কিশোরকে। হো হো করে হেসে উঠল কিশোর। লেখা রয়েছেঃ মুরগীর ঠোকর। জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিঠে কি?' মুসা জানাল, 'মুরগীর খামচি।' ওদের সঙ্গে সঙ্গে লারসেনও হাসতে লাগলেন।

হাসি থামলে বললেন, 'খেতে এসেছ বলে তো মনে হয় না। তা কি দেখতে এসেছ, বলো তো? মুরগী বেচে লাভ করা আমার প্রথম ডলারটা? ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। আমার অফিসে। আমার প্রথম স্ত্রীর ছবিটাও বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। হাহ হাহ হা!'

'আসলে,' কিশোর বলল। 'অফিসগুলো দেখারই লোভ। আপনারটা। আরও কিছু। এবং বিশেষ করে জুনের নতুন অফিসটা।'

'আমি দেখতে চাই খাবার কি করে বানানো হয়,' মুসা বলল। 'আর কি কি জিনিস দেয়া হয় মাংসের সঙ্গে।'

'ও, আমার পাগল বিজ্ঞানীগুলোকে দেখার শখ তোমার?' হাসলেন লারসেন। 'বেশ। খাঁচা থেকে বের করার ব্যবস্থা করছি ওদেরকে। তারপর,' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'একটা স্পেশাল খাবার দেব তোমাকে। চেখে দেখার জন্যে।'

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমি খাবারের কিছু বুঝি না!' বুড়ো আঙুল দিয়ে মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে দেবেন।'

কিশোর আর মুসাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললেন লারসেন। 'আমার নতুন জিনিসটা দেখলে বুঝবে। বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আমি নিজেই পারিনি। অথচ আমারই আবিষ্কার।'

এলিভেটরে করে উঠে এল তিনজনে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন লারসেন। মাঝে মাঝে কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে থামছেন। এই সুযোগে যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই কথা বলার চেষ্টা করছে কিশোর, জুনের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে। একজন অ্যাকাউনটেন্ট জানাল, সে সেদিন ওকে দেখেছে। তবে ব্রিফকেসের ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না। কয়েকজন জানাল, কাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পার্কিং লটে জুনের মাসট্যাং গাড়িটা দেখেছিল। তবে জোরাল কোন সূত্র কেউই দিতে পারল না।

অবশেষে দুই গোয়েন্দাকে মাটির তলার ঘরে নিয়ে এলেন লারসেন। বন্ধ কাচের দরজার ওপাশে বিশাল গবেষণাগার। ঢোকার অনেকগুলো দরজা। যারা ঢুকছে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা রয়েছে। অপরিচিতজন কিংবা যাদের ঢোকার অনুমতি নেই তাদেরকে ঢুকতেই দেবে না। সাবধান বাণী লেখা রয়েছে দরজার কপালে।

একটা ইলেকট্রনিক বক্সে একটা প্লাস্টিকের কার্ড ঢুকিয়ে দিলেন লারসেন। খুলে যেতে লাগল কাচের দরজা। মুসা আর কিশোরকে বললেন, 'আমি যা বলব, সঙ্গে সঙ্গে তাই বলবে। কোড। হ্যাঁ, বলো, মুরগীর বাচ্চার কথা কাউকে বলব না।'

তোতাপাখির বুলি আওড়ানোর মত করে বলল দু'জনেই।

'হ্যাঁ, হয়েছে,' তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন লারসেন, গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ, কেঁপে উঠল যেন গবেষণাগারের কাচের দেয়াল, 'ডন!'

এগিয়ে এল একজন বেঁটে, মোটা, টাকমাথা লোক। চোখে গোল্ডরিম চশমা। গায়ে ল্যাবরেটরির সাদা পোশাক। পকেটে একসারি মুরগীর মডেল ঝোলানো, সামরিক বাহিনীর লোকে মেডেল যেভাবে ঝোলায় সে ভাবে। কাছে এসে অনেকটা মিলিটারির মতই স্যালুট করল।

পরিচয় করিয়ে দিলেন লারসেন, 'ডন বারোজ,' বিশাল থাবা দিয়ে চাপড় মারলেন লোকটার পিঠে। বাঁকা হয়ে গেল লোকটা। 'কল্পনাই করতে পারবে না আমার এখানে আসার আগে কোথায় কাজ করত ডন।'

নিশ্চয় ডিজনিল্যাণ্ডে, ভাবল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'পেনটাগন,' জবাব দিলেন লারসেন। 'ওয়াশিংটনে ছিল ওর ল্যাবরেটরি, পেনটাগনের পাঁচ ব্লক দূরে। তাহলে পেনটাগনই ধরা যায়, যদিও ওখানে কাজ করেনি। কাছাকাছি ছিল তো। হাহ হাহ।'

আসলে, পেনটাগন রয়েছে ভারজিনিয়ার আরলিংটনে, পটোম্যাক নদীর ধারে। চুপ করে রইল কিশোর। ভুলটা ধরিয়ে দিল না।

কাঁচুমাচু হয়ে গেছে বেচারা ডন। ভয়ে ভয়ে রয়েছে আবার কখন পিঠে আন্তরিকতার চাপড় পড়ে। একে একে গোয়েন্দাদের নাম বলে গেলেন লারসেন। হাত মেলাল ডন। ঘেমে গেছে হাতের তালু। ঠাণ্ডা।

'ডন একজন সুগন্ধ বিশারদ,' লারসেন বললেন। 'আমার আর অ্যাণ্ড ডি-র হেড,' ভুরু কোঁচকালেন তিনি। 'বুঝলে না? রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট। খুব ভাল কাজ জানে। আমি যা জানি তা-ও শেখাব। ওস্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। চিকেন ডন বারোজ হয়ে যাবে তখন। হাহ হাহ হা! ডন, ধর, ছেলেরা ড্রিপিং চিকেন খেতে চায়? দিতে পারবে?'

কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ দেখা দিল ডনের চোখে। 'ওরা সিভিলিয়ান, স্যার?'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' অভয় দিলেন লারসেন। 'কোন বছর সেই খাবারটা বানিয়েছিলাম, যেটার নাম দিয়েছিলাম উইং অন আ স্ট্রিং? একটুকরো সাবানের ওপর দড়ি পড়ে থাকতে দেখে যে খাবারটা তৈরির ভাবনা মাথায় এসেছিল আমার?'

'নাইনটিন এইটি ফাইভ,' জবাব দিল ডন।

'তারিখ?'

মাথা নাড়ল ডন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'বাইশে জুন, উনিশশো পঁচাশি।'

'দেখলে তো?' হেসে বললেন লারসেন। 'কাকে নিয়ে এসেছি? ওকে আমি পালকপুত্র বানিয়েছি এ জন্যেই। জুনকেও বলে দিয়েছি। ছেলেটা একটা চলমান রেফারেন্স বুক। একেবারে কম্পিউটারের মেমারি।' ডনের দিকে তাকালেন, 'আর সন্দেহ নেই তো তোমার? যাও, ড্রিপিং চিকেন নিয়ে এসো।'

'যাচ্ছি, স্যার,' এবার আর স্যালুট করল না ডন, তবে ভাব সাব দেখে মনে হলো করতে পারলেই খুশি হত। সেই সঙ্গে খটাস করে বুট ঠুকতে পারলে তো

আরও। তবে ঘুরে যখন রওনা হলো, সাধারণ মানুষের মত না হেঁটে মার্চ করে এগোল। ল্যাবরেটরির রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চাবি বের করে তালা খুলল।

'ড্রিপিং চিকেনটা কি জিনিস?' জানতে চাইল মুসা।

'বললে বুঝবে? আচ্ছা, বলি,' লারসেন বুঝিয়ে দিলেন, 'মুরগীর মাংস থেকে পুরোপুরি হাড় আলাদা করে ফেলে, মেশিনে পিষে ফেলা হয়। বিস্কুটের গুঁড়ো মিশিয়ে ভেজে পুরো বাদামী করে ফেলে তার ওপর মাখিয়ে দেয়া হয় সোনালি রঙ করা মাখন। বুঝলে?'

'ছবি দেখতে পাচ্ছি,' কিশোর জবাব দিল।

'ছবি?'

'ও কিছু না।'

'আরও কিছু জিনিস মেশানো হয়,' লারসেন বললেন। 'যেগুলো বললেও বুঝবে না। কাজেই, থাক।'

'আমার আর শোনারও দরকার নেই,' জিভে পানি এসে গেছে মুসার।

'আমার ওই নতুন খাবারে বিশেষ একটা জিনিস মেশানো থাকবে, প্রতিটি বড়ার মধ্যে,' লারসেন বললেন। 'লোকে মজা করে খাবে। তারপরই খাবে ধাক্কা। বুঝতেই পারবে না কিসে আঘাত করল ওদেরকে।'

খাওয়া লাগল না, কথাটা শুনেই ধাক্কা খেলো দুই গোয়েন্দা। ভীষণ চমকে গেল। ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। পরস্পরের দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত আগেও ড্রিপিং চিকেন খাওয়ার জন্যে লোভ ছিল দু'জনের। এমনকি কিশোরও ভাবছিল, পেট এখন ভাল হয়ে গেছে, খানিকটা খাবার চেখে দেখবেই। লারসেনের কথা শোনার পর ইচ্ছেটা উবে গেছে। লোকে কেন ধাক্কা খাবে? কেন বুঝতে পারবে না কিসে আঘাত করেছে ওদেরকে? আর খাওয়ার মধ্যে আঘাতের কথা আসে কেন? ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানো হবে না তো?

খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। নতুন একটা খাবার আবিষ্কার করেছেন লারসেন। তার পরপরই ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখল জুন। কাকতালীয় হতে পারে...কিন্তু কিশোরের মনে হতে লাগল, এই খাবারটাই জুনের আতঙ্কের কারণ। কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। কানের পর্দায় যেন ভাসতে লাগল কিশোরেরঃ মুরগীতে বিষ মেশাচ্ছে সে! লাখ লাখ লোক মারা যাবে!

রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল ডন, 'খুব সুন্দর হয়েছে! আর বেশ গরম!'

'এসো,' দুই গোয়েন্দাকে বললেন লারসেন। 'আমার গিনিপিগ বানাতে চাই তোমাদেরকে। তোমরাই প্রথম চেখে দেখো, কেমন হলো ড্রিপিং চিকেন।'

সাত

চোখে অনেক আশা নিয়ে কিশোর আর মুসার দিকে তাকালেন লারসেন। যেন বোঝার চেষ্টা করছেন, ওদেরকে যে সম্মানটা দেয়া হচ্ছে সেটা ওরা বুঝতে পারছে কিনা।

ঘড়ি দেখল মুসা। 'লাঞ্চটাইম তো হয়নি এখনও।'

'ডাক্তার বলেছেন,' কিশোর বলল। 'কোন রকম রিচ ফুড না খেতে। ভাজাভুজি তো একেবারে বারণ। পেটের অবস্থা ভাল না আমার।'

'ওই ডাক্তার ব্যাটাদের কথা শুনো না!' প্রায় গর্জে উঠলেন লারসেন। 'ওরা তো কত কথাই বলে। সব শুনলে না খেয়ে উপোষ করে মরতে হবে রোগীকে। এসো। এখনও গরম গরম রয়েছে ড্রিপিং চিকেন। এই সুযোগ হারালে পরে পস্তাবে··· বুঝতে পারছ না, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে। কোথায় পাঠানো হবে।'

'ঠিকই পারছি! নরকে!' ভাবল মুসা।

তর্ক করে লাভ হবে না। সন্দেহ না জাগিয়ে লারসেনকে কোন কিছু বলেই নিরস্ত করা যাবে না এখন। কি আর করে? ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে এগোল দু'জনে।

একটা ট্রে হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ডন। দুই গোয়েন্দাকে ইশারা করল তার অফিসের দিকে যেতে। সে এগোল সেদিকে। লারসেন গেলেন না। ডনকে বললেন, ট্রেটা রেখেই যাতে চলে আসে। কাজ আছে।

ডনের অফিসে ঢুকল কিশোর আর মুসা। স্টেইনলেস স্টীল আর কাচের তৈরি সুদৃশ্য আধুনিক টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ডন। স্যাণ্ডউইচের মত দেখতে চমৎকার খাবার। গরম। ধোঁয়া উড়ছে।

'দেখতে তো খুবই ভাল,' কিশোর বলল।

'পাগল হয়ে গেলে নাকি?' মুসা বলল, 'ওগুলো বিষাক্ত! খাওয়া একদম উচিত হবে না। এক কাজ করি, পকেটে ভরে ফেলি।'

নিজের প্যান্টের দিকে তাকাল কিশোর। আঁটো জিনস। পকেটে ঢোকানো যাবে না, আর জোরজার করে কোনমতে ঢোকালেও উঁচু হয়ে থাকবে। স্পষ্ট বোঝা যাবে। মাথা নাড়ল, 'হবে না।'

'তাহলে? ওয়েস্টবাস্কেটেও তো ফেলতে পারব না। দেখে ফেলবে।'

'উঁচু হয়ে থাকলেও পকেটেই ঢোকাতে হবে। আর কোন উপায় নেই। আমি পরেছি জগিং স্যুট, পকেটই নেই।'

'কাউচের নিচে ফেলে দিলে কেমন হয়?'

'তাতেও লাভ হবে না। যে হারে গন্ধ বেরোচ্ছে, ওরা গন্ধ পেয়ে যাবে। বের করে ফেলবে। পকেটেই রাখতে হবে। ঢোকাও। জলদি!'

আর কোন উপায় না দেখে পকেটেই ঢোকাতে বাধ্য হলো কিশোর। আঠাল ঝোলের মত জিনিস পকেটের কাপড় ভেদ করে পা বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

'আমি দরজায় চোখ রাখছি,' মুসা বলল। 'তুমি খোঁজ। দেখো, কিছু বেরোয় কিনা।'

খুঁজতে লাগল কিশোর। জুনের ব্রিফকেসটা। ডেস্কের পেছনে, নিচে, ড্রয়ারে, কোথাও পাওয়া গেল না। ফাইল কেবিনেটে তালা দেয়া। ওর ভেতরে দেখা গেল না।

ব্রিফকেস খোঁজা বাদ দিয়ে অন্য সূত্র মেলে কিনা দেখতে শুরু করল সে। ডনের ডেস্ক ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখল একটা পাতা নেই, ছয় দিন আগের তারিখের।

মুসা শুনে বলল, 'সেদিন শুক্রবার। জুন যে দিনের কথা মনে করতে পারছে না, যে দিন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যোগাযোগ আছে কিনা বের করা দরকার,' এই সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল। এগিয়ে আসছে।

ঠোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে চুপ করতে ইশারা করল মুসা।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল ডন। প্রথমেই তাকাল ট্রের দিকে। শূন্য। 'বেশ বেশ, খেয়েছ তাহলে? কেমন লাগল আমাদের ড্রিপিং চিকেন?'

'ওই জিনিস জীবনে খাইনি,' সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।

'আমাদের জেনারেল শুনে খুব খুশি হবেন,' লারসেনের কথা বলল ডন। 'একটা জরুরী কাজে চলে গেছেন। তোমাদেরকে বলতে বলেছেন।'

'ড্রিপিং চিকেন কার আবিষ্কার? আপনার?'

'না,' মাথা নাড়ল ডন। ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসল। 'এই একটা আইটেমের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন জেনারেল। যেতে অনেক মানা করেছিলাম, শুনলেন না। বলেছি, চেষ্টা করলে এখানেই বানাতে পারব আমরা। সোজা আমাকে বলে দিলেন, তিনি বস্, যা করার তিনিই করবেন। গেলেন ফেলিক্স আরোলার কাছে, মিরাকল টেস্টের মালিক। অথচ আমরা দু'জনে, চিকেন কিং আর কেমিক্যাল কিং মিলেই বানিয়ে ফেলতে পারতাম।'

'তার মানে কি আছে এতে আপনি জানেন না?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নিশ্চয় জানি। গবেষণা করাই তো আমার কাজ। পরীক্ষা করে বের করে ফেললাম কি কি মেশানো হয়েছে। সে কথা জানালাম জেনারেলকে। খুশি হয়ে আরেকটা মোরগ আমাকে পুরস্কার দিয়ে দিলেন জেনারেল,' পকেটে ঝোলানো দশ নম্বর রুপার মুরগীটা দেখাল ডন। 'তবে স্বীকার করতেই হবে, যা আছে সব ক্লাসিক জিনিস। তোমাদেরকে অবশ্যই বলব না। বিজনেস সিক্রেট।'

'আমরা শুনতে চাইও না,' কিশোর বলল। 'যা দেখলাম তাতেই খুশি আমরা। চিকেন লারসেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই তো একটা সৌভাগ্য। কি বলো, মুসা? আট দিন আগেও তো আমরা চিনতাম না, তাই না?'

শূন্য দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। দেখল, কিশোরের নজর ডেস্ক ক্যালেণ্ডারের দিকে। 'ভুল করলে। আট নয়, ছয় দিন আগে,' হাসল সহকারী গোয়েন্দা।

'আট দিন,' জোর দিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'ভুল,' ডনের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ক্যালেণ্ডার উল্টে যে পাতাটা নেই সেইখানটায় এসে থামল। 'ছয়দিন। গত শুক্রবার। আমি শিওর...আরে, পাতাটা কোথায়?'

'নেই,' এমন ভঙ্গিতে বলল ডন, যেন জানাই আছে নেই যে। 'মুদী দোকান

থেকে আনা জিনিসের লিস্ট লিখে রাখি ক্যালেণ্ডারে। মাঝে মাঝে পাতা ছিঁড়ে সাথে করে নিয়ে যাই।'

'ঠিক আছে, যা দেখার দেখলাম,' কিশোর বলল। 'চলি। বাড়ি গিয়ে কাপড় বদলানো দরকার।'

হাসি চাপতে গিয়ে কেশে ফেলল মুসা। নিশ্চয় কিশোরের কাপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রস, আঠা লাগছে চামড়ায়, ভীষণ অস্বস্তিকর। রসের রঙ এখন বাইরে থেকে দেখা না গেলেই হয়। পকেটের উঁচু জায়গাটা চেপে ধরে রেখেছে কিশোর।

বেরিয়ে এল দু'জনে। প্রথমেই ময়লা ফেলার যে ড্রামটা পেল তাতে ফেলে দিল ড্রিপিং চিকেন। তারপর বাড়ি রওনা হলো।

সেই বিকেলে ছয় বাক্স চীনা খাবার নিয়ে আসা হলো। চীনের দেয়ালের মতই যেন সাজিয়ে রাখা হলো কিশোরের ওয়ার্কশপে বাক্সগুলো। তিন গোয়েন্দাই হাজির। চিকেন লারসেনের অফিসে গিয়ে কি কি করে এসেছে রবিনকে বলছে মুসা, মাঝে মাঝে কথা জুগিয়ে দিচ্ছে কিশোর।

তারপর চলল খাবারে বিষ মেশানো নিয়ে আলোচনা।

'ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানোর উদ্দেশ্যটা মোটামুটি আঁচ করা যায়,' রবিন বলল। 'তার পরেও চারটে প্রশ্ন থেকে যায়। কে মেশাল, কোথায় মেশাল, কখন মেশাল, কেন মেশাল? আরেকটা সম্ভাবনাও থেকেই যায়। হেনরি অগাসটাস এতে জড়িত, এবং খারাপ কিছু করছে।'

'জুনের ব্রিফকেসটা পেলে হত,' কিশোর বলল। 'কিছু না কিছু পাওয়া যেতই ওতে।'

'গত শুক্রবারে জুনকে কেউ দেখেছে বলেও বলল না,' মুসা বলল। 'একজন বুড়ো লোক বাদে। তবে তার কথাও বিশ্বাস করা যায় না। কথাবার্তা কেমন অগোছাল। ভুল করে একদিনের কথা আরেকদিন বলে দিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে।'

'এই খাবার এনেছ কেন?' আচমকা প্রশ্ন করল রবিন।

'কেন, খেতে ইচ্ছে করে না বুঝি?' প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়েই সারল মুসা।

'কোন্ রেস্টুরেন্ট থেকে?'

'যেটা থেকে সব সময় আনি। ডেই ডং।'

'তাহলে আর বসে আছি কেন? খেয়ে ফেলি।'

একটা বাক্স টেনে নিয়ে খুলল। খুলে একটা প্যাকেট হাতে নিয়েই স্থির হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' জানতে চাইল মুসা। 'ফরচুন কুকির বিজ্ঞাপন করেছে নাকি বড় বড় কথা বলে?'

মোড়কের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। নীরবে বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে।

হাতে লেখা একটা নোট। দেখার জন্যে কিশোরও ঝুঁকে এল। লেখা রয়েছেঃ

এইমাত্র যে খাবার খেলে, তাতে বিষ মেশানো থাকতে পারত।

এবার নেই। পরের বার থাকতেও পারে। কাজেই সাবধান! অন্তত চিকেন কিঙের খাবার থেকে দূরে থাকবে!

আট

পড়ার পরেও অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তাকিয়েই রয়েছে কাগজটার দিকে। তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল কিশোর। প্রায় খাবলা দিয়ে তুলে নিয়েছে বাক্সের বাকি দুটো ফরচুন কুকি। দুটোর মোড়কেই একই হুঁশিয়ারি লেখা রয়েছে।

চিংড়ি মেশানো ফ্রাইড রাইসের বাক্সটা টেনে নিয়েছিল রবিন, এই হুঁশিয়ারি পড়ার পর ঠেলে সরিয়ে দিল টেবিলের কোণে। 'খিদে গেছে! বিষ খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে থাকা ভাল!'

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল মুসা।

'কাকে করবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ডেই ডং রেস্টুরেন্ট। কার কাজ জানা দরকার।'

'করা উচিত,' রবিন বলল।

'না,' নিষেধ করল কিশোর। 'দরকার নেই।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কারণ আমি জানি কি ঘটেছে।'

'কী?'

'চুপ করে আছ কেন?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন।

'রেস্টুরেন্টের কোন একজন ওয়েইটার ওই কাগজ দিয়ে কুকি মুড়ে দিয়েছে। এবং সেটা করেছে, কেউ একজন এসে তাঁকে পাঁচটা ডলার হাতে গুঁজে দিয়ে করতে বলেছে বলে। ওয়েইটারকে বলেছে, এটা একটা রসিকতা। ওয়েইটারও কিছু বুঝতে পারেনি। করে দিয়েছে কাজটা।'

'তুমি কি করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি, ব্যস। বিশ্বাস করতে পারো আমার কথা।'

'নিশ্চয় করি…' রবিন শুরু করল।

মুসা শেষ করল, 'কারণ তোমার অনুমান সাধারণত ভুল হয় না। আরও একটা ব্যাপার জানি, কথা লুকাতে তুমি ওস্তাদ।'

'বেশ, দোষই যখন দিলে, বলেই ফেলি,' কিশোর বলল। 'আমি জানলাম, অর্থাৎ বুঝতে পারলাম, তার কারণ এ রকম রসিকতা আমিও করেছি। ফরচুন কুকিতে।'

'কি লিখেছিলে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'ভাল কথাই লিখেছিলাম। লোককে হাসানোর জন্যে। এটার মত হুঁশিয়ারি নয়। বিষ খাওয়ানোর ভয় দেখাইনি লোককে।' একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল কিশোর। 'ভাবছি, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবধান করা হলো আমাদেরকে। প্রথমবার করল মুসার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে। আর এবার তো লিখেই হুমকি

দিল। প্রথমে মনে করেছিলাম, ব্রেক নষ্ট করার ব্যাপারটার সঙ্গে খাবারে বিষ মেশানোর যোগাযোগ নেই। এখন মনে হচ্ছে, আছে। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে, বিশ্বাস না করে আর পারা যাচ্ছে না। আরও সতর্ক থাকতে হবে। নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর।'

'যে-লোক এই কাজ করছে,' মুসা অনুমান করল। 'সে আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরে, পোরশে কনভারটিবল গাড়ি চালায়। ঠিক?'

'হলে অবাক হব না। আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখে সে।'

কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে উঠল। চমকে দিল তিনজনকেই। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। কানে ঠেকিয়ে বলল, 'তিন গোয়েন্দার কিশোর পাশা বলছি।'

'তোমাকেই খুঁজছি!' অন্য প্রান্তে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ। 'চিকেন হার্বার্ট লারসেনের সঙ্গে কথা বলছ তুমি, পুত্র।'

রিসিভারের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে দুই সহকারীকে ফিসফিস করে জানাল গোয়েন্দাপ্রধান, 'চিকেন!'

'কি জন্যে করেছে জিজ্ঞেস কর,' মুসা বলল। 'কুকির মোড়কের লেখাটার কথাটা জানে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস কর।'

মাথা নেড়ে মুসাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর।

'শোনো,' লারসেন বললেন। 'একটা সুখবর আছে তোমাদের জন্যে। কাল ড্রিপিং চিকেনের বিজ্ঞাপন তৈরি হবে। টিভিতে যাবে। চিকেন হিস্টরি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। হলে তোমাকে ছাড়া পারব না।'

নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর। ঠিক এ রকম সুযোগই চাইছিল সে। চিকেন লারসেনের কাছাকাছি থেকে তাঁর ওপর নজর রাখতে পারে এমন কিছু।

'কখন? কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আল্টা ভিস্টা ড্রাইভের মালটিন মিক্স স্টুডিওতে। একটায়। সময়মত হাজির হয়ে যাবে আমার টিম।'

কেটে দেয়া হলো লাইন।

সেদিন অনেক রাতে, মুসা আর রবিন চলে যাওয়ার পর চিকেন লারসেনের বিজ্ঞাপনগুলো রেকর্ড করে রাখা একটা ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে দেখতে বসল কিশোর। বড় একটা ডেস্কে বসেন তিনি। ওপরে জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো, খুবই অগোছাল। যেন একাধারে ওটা একটা অফিস, লাইব্রেরি আর গেম রুমের মিশ্রণ। নানা ধরনের বেশ কিছু বিজ্ঞাপন আছে। কিশোরের পছন্দ 'হেট আ হ্যামবারগার উইক' নামের বিজ্ঞাপনটা, যেটাতে একটা গরুর মুখে গলিত মাখন ছিটিয়ে দেন লারসেন। আরেকটা ভাল বিজ্ঞাপন আছে। সেটাতে ক্যামেরার দিকে সারাক্ষণ পিঠ দিয়ে থাকেন, কারণ তিনি বোঝাতে চান রেগে গেছেন, জন্মদিনের তারিখ ভুল করে ফেলেছেন বলে।

তবে তার সব চেয়ে পছন্দ, যেটাতে লারসেন দুটো নতুন ধরনের খাবার

পরিবেশন করেন। একটার নাম ক্র্যাকলিন ক্রাঞ্চি, আরেকটা বার্নিং বারবেকু। লাস ভেগাস-এর এক মন্ত্রীর বিবাহবার্ষিকীতে ভোজ দেয়া হয়। তাতে আস্ত দুটো মুরগীকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্না করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়া
হয়। একটাকে পরানো থাকে বরের পোশাক, আরেকটাকে কনের। কাপড় দিয়ে নয়। মাখন আর খাবার উপযোগী অন্যান্য মালমশলা দিয়ে। সেখানে উপস্থিত থাকেন চিকেন লারসেন। নানা রকম মজার মজার কথা বলেন।

টেপটা শেষ হয়ে গেলে ভিসিআর বন্ধ করে শুতে গেল কিশোর। কিন্তু অস্থির একটা রাত কাটাতে হলো। ভাবনার মধ্যে কেবলই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল জুনের কথা। ঘোরের মাঝে কি বাবার কথাই বলেছিল সে? লারসেনই খাবারে বিষ মেশানোর পরিকল্পনা করেছেন? তিনিই যদি করে থাকেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছেন?

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় একটায় বেভারলি হিলের কাছে মালটিন মিক্স স্টুডিওতে হাজির হলো রবিন আর কিশোর। দুই মিনিট পরে মায়ের গাড়িটাতে করে এল মুসা আর ফারিহা।

'এই দেখ,' কিশোরকে বলল রবিন। 'গাড়ি নেই দেখে তোমার কত অস্থিরতা। মুসারটা যে থেকেও নেই? খালি খালিও তো গজগজ করো...'

'ও তো ওর মায়েরটা নিয়ে এসেছে।'

'তুমিও ইয়ার্ডেরটা নিয়ে আসতে পারো।'

'ওই ভাঙা পিকআপ কে চালাতে যায়,' এক মুহূর্ত চুপ থাকল কিশোর। 'বেশ, মুসার গাড়িটা যতদিন ঠিক না হয়, চুপ থাকব। হলেই আবার শুরু করব।'

'তোমাকে কে কিনে নিতে মানা করেছে?'

এই প্রশ্নটা করলেই চুপ হয়ে যায় কিশোর। কারণ সে যেভাবে যে জিনিস চায়, সেটা অল্প পয়সায় জোগাড় করা কঠিন। ও চায়, এমন একটা গাড়ি, যাতে অনেক ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজানো থাকবে। গোয়েন্দাগিরির অনেক সুবিধে হবে। অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে সে সব। অত টাকাও নেই, আপাতত কিনতেও পারছে না। কিন্তু ক্ষোভটা ঠিকই প্রকাশ করতে থাকে। কিংবা হয়তো ক্ষোভের মাধ্যমেই অটো সাজেশন দেয় নিজেকে, আর কিছুদিন ধৈর্য ধর, কিনব, কিনব!

স্টুডিয়োয় ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল জুনের সঙ্গে। মাথায় একটা রূপার মুকুট পরেছে। আর মুকুটের ওপর অবশ্যই বসে আছে একটা রূপার মুরগী।

'এসেছ,' কিশোরকে দেখে হেসে বলল জুন। 'বাবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। নতুন কোন খবর আছে?'

'না। তবে কাল রাতে কিছু ফরচুন কুকি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে বুঝেছি, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

'গুড। আমার ব্রিফকেসটা যত তাড়াতাড়ি পারো বের করে দাও। ভেতরে কি ছিল এখনও মনে করতে পারছি না। তবে ওটা আমার চাই। মনে হচ্ছে ওটাতে জরুরী কিছু আছে।'

তারপর তিন গোয়েন্দা আর ফারিহাকে নিয়ে চলল স্টুডিওর কাচে ঘেরা একটা

অংশে, প্রোডাকশন বুদে। চিকেন লারসেনের অফিসের অনেকেই আছে ওখানে, ডন বারোজ সহ।

বিজ্ঞাপনের জন্যে সেট সাজানো হয়েছে। টেবিলে চিঠির স্তূপ, শূন্য কফির কাপ, রবারের মুরগী, রোস্ট করা মুরগীর ছবি—তৃতীয় শ্রেণীর আর্টিস্ট দিয়ে আঁকানো হয়েছে ইচ্ছে করেই, আর হ্যালোউইন চিকেন কস্টিউম পোশাক পরা জুনের শিশুকালের একটা ছবি।

অবশেষে মাইক্রোফোনে পার্সোন্যাল অ্যাসিসটেন্টকে ডাকলেন পরিচালক, 'আমরা রেডি। চিকেন লারসেনকে ডেকে আনাও। দেখো, মেকআপ হয়েছে কিনা।'

'মিনিটখানেক পরে ঢুকলেন লারসেন। পরনে লাল জগিং স্যুট, সাদা এবং নীল স্ট্রাইপ দেয়া। ওপরের ঠোঁট আর নাক জুড়ে আটকানো রয়েছে রবারের তৈরি একটা মুরগীর ঠোঁট। হাতে রূপার তৈরি বড় একটা অ্যানটিকের ট্রে, রূপার ঢাকনা দেয়া। তীব্র আলোয় এসে সামান্য কুঁকড়ে গিয়ে বুদের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন।

'আমার লোক আছে?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আছে, মিস্টার লারসেন,' পরিচালক বললেন। স্যুইভেল চেয়ারে বসেই ঘুরে তাকালেন কিশোরের দিকে। চিকেন লারসেনের অফিশিয়াল টেন ইয়ার অ্যানিভারসারি টি-শার্ট গায়ে দেয়ানো হয়েছে তাকে। শার্টে একটা মুরগীর ছবি আঁকা, মাথার জায়গায় মুরগীর মাথার পরিবর্তে আঁকা হয়েছে লারসেনের মুখ।

'ডন বলেছে,' কিশোরকে বললেন লারসেন। 'ড্রিপিং চিকেনের স্যাম্পল খেয়ে খুব খুশি হয়েছে। আজ সবার জন্যেই প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসা হয়েছে।'

ফিসফিস করে মুসা বলল কিশোরের কানে, 'অত ভাল প্যান্টটা পরে আসা উচিত হয়নি আজ।'

আরাম করে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিলেন লারসেন।

পরিচালক ঘোষণা করলেন, 'দয়া করে চুপ করুন সবাই। ড্রিপিং চিকেন। টেক ওয়ান!'

ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন টিভি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন লারসেন।

'বন্ধুরা,' বলছেন তিনি। 'আমি, আপনাদের প্রিয় চিকেন লারসেন বলছি। আপনারা জানেন, অহেতুক আপনাদের সামনে হাজির হই না আমি। হই তখনই, যখন আপনাদের পকেট খালি করে আমার পকেট ভরানোর কোন একটা উপায় বের করে ফেলি। বিশ্বাস করুন, এই বার আগের চেয়ে অনেক বেশি খসাব আমি, কিছুতেই ধরে রাখতে পারবেন না। চাকা আবিষ্কারের সময় আমি সেখানে হাজির ছিলাম না। পেনিসিলিন আবিষ্কারের সময় ছিলাম না। এমনকি পেপার ক্লিপ জাতীয় জিনিসগুলো যখন আবিষ্কার হয়, তখনও সেখানে হাজির ছিলাম না। ইতিহাসের অসব বিস্ময়কর মুহূর্তগুলোতে আমার কোন প্রয়োজন পড়েনি। কিংবা হয়তো প্রয়োজন হয়েছিল. খবরও দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই খবর আমাকে বলতে

ভুলে গেছে আমার সেক্রেটারি। আর এই সন্দেহেই আমি তাকে চাকরি থেবে
বিদেয় করে দিয়েছি। হাহ হাহ হা! তবে আজকে আমি আর শুধু ইতিহাস তৈরি
করতেই যাচ্ছি না, ইতিহাসকে খেয়ে ফেলতে চলেছি।'

রূপার ট্রের ওপর থেকে ঢাকনা সরালেন লারসেন। ধোঁয়া উঠতে লাগল স্তূপ
করে রাখা ড্রিপিং চিকেন থেকে। খাবারের চেহারা দেখেই উহ আহ শুরু করে দিল
প্রোডাকশন বুদের লোকেরা।

একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে গেলেন লারসেন। এগিয়ে
গেল ক্যামেরা, কাছে থেকে ছবি তোলার জন্যে। ঢোক গিলল তিন গোয়েন্দা
সত্যিই কি তিনি খাবেন?

'সেই সভ্যতার গোড়া থেকেই যে কাজ করার চেষ্টা করে এসেছে মানুষ
পারেনি, সেটাই সফল করেছি আমি। সৃষ্টি করেছি ড্রিপিং চিকেন। প্রতি কামড়
খাবার রসময় করে তুলবে রসনাকে। আরও ব্যাপার আছে। প্রতিটি স্যাণ্ডউইচের
ভেতরে একটা বিশেষ জিনিস ভরে দিতে বলেছি আমার রাঁধুনিকে। এমন কিছু, য
লোকে কল্পনাই করতে পারবে না। দেয়া হয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে
পারছি না, দেখতে চাইছি, এখনই দোকানে ছুটছেন কেনার জন্যে। কিনে গপগপ
করে গিলতে থাকুন। এই ভাবে...'

বলেই হাঁ করে বিরাট এক কামড় বসালেন লারসেন। বড় একটুকরো
স্যাণ্ডউইচ কেটে নিয়ে চিবাতে লাগলেন। রঙিন রস গড়াতে শুরু করল ঠোঁটের দু
কোণ থেকে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসি হাসলেন।

'কাট!' চিৎকার করে আদেশ দিলেন পরিচালক। 'দারুণ হয়েছে!'

কয়েকটা আলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয়া হলো। উত্তেজনা কমে গেল বুদের
লোকের। ফারিহা বলল গোয়েন্দাদেরকে, 'ঐতিহাসিক একটা লেকচার দিলেন
লারসেন!'

কিন্তু ওর কথায় কান নেই তিন গোয়েন্দার। স্টুডিওর কাচের দেয়ালের ভেতর
দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে লারসেনের দিকে। চিবানো ড্রিপিং চিকেন গেলেননি তিনি
মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন ওয়েস্ট বাস্কেটে।

মনে হলো, যেন তিনি জানেন বিষ রয়েছে ওই খাবারে। মানুষের শরীরের
জন্যে ক্ষতিকর, মারাত্মক বিষ।

নয়

টেলিভিশনের ব্যাপারে ভালই জ্ঞান আছে কিশোরের। বুঝতে পারছে, ড্রিপিং
চিকেনের শুটিং শেষ হয়নি। তাই বলে এটাও ভাবেনি, আরও পাঁচ ঘণ্টা ধরে
চলবে। আরও বিশবার অভিনয় করলেন লারসেন। প্রতিবারেই বড় করে কামড়
বসালেন স্যাণ্ডউইচে, প্রতিবারেই পরিচালক 'কাট' বলার পর মুখ থেকে বের করে
ফেলে দিলেন।

সব শেষ হওয়ার পর লারসেন চিৎকার করে বললেন, 'এসো, এবার পার্

হোক!' উপস্থিত সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন ড্রিপিং চিকেন চেখে দেখার জন্যে। একপাশে একটা মাইক্রোওয়েভ রাখা আছে। খাবার গরম করে নেয়ার জন্যে। টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে বুদে যত ধরনের লোক আছে সবাই ছুটে এল ওই খাবার খাওয়ার জন্যে।

তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

কেউ মারা গেল না। কারও পেট ব্যথা করল না, পেট চেপে ধরল না কেউ। বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই দেখল না। এক ধরনের গোঙানিই শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে, আহ উহ করছে লোকে, সেটা খাবারের স্বাদের কারণে।

ধীরে ধীরে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, যেখানে রূপার ট্রেতে রাখা আছে ড্রিপিং চিকেন। আর মাত্র দুটো স্যাণ্ডউইচ বাকি। একটা নেয়ার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে, কাঁধের ওপর দিয়ে রবিন বলল ফিসফিসিয়ে, 'কে কে স্যাণ্ডউইচ নেয়নি, লক্ষ্য করেছ?'

ঘুরে তাকাল কিশোর।

'ডন বারোজ আর চিকেন লারসেন,' রবিন বলল। 'কেন খাচ্ছে না?'

দ্বিধা করতে গিয়েই সুযোগটা হারাল কিশোর। অল্প বয়েসী এক মহিলা এগিয়ে এসে 'এক্সকিউজ মী' বলে সরিয়ে দিল তাকে, প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিল প্লেটের অবশিষ্ট দুটো স্যাণ্ডউইচ। 'ভাবছিলাম, একটা নিয়ে যাব, আমার এক বন্ধুর জন্যে। কিন্তু এতই মজা, নিতে ইচ্ছে করছে না,' বলে কিশোরের মুখের ওপরই কামড় বসাল একটাতে। আরেকটাও খাবে, বোঝা যাচ্ছে।

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর কিশোর। নিরাশার দৃষ্টিতে।

কোনমতে কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বলল, 'থাক, অত ভাবনা নেই। খেতে ইচ্ছে করলে যখন তখন গিয়ে লারসেনের রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আসতে পারব।'

শেষ হয়ে আসছে পার্টি। বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বদ্ধ জায়গায় থেকে দম আটকে আসছিল, খোলা বাতাসে বেরিয়ে যেন বাঁচল। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে ফারিহা আর জুনের জন্যে।

বেরিয়ে এল দু'জনে। কথা বলতে বলতে আসছে। কিশোরদের কাছে এসে ফারিহা তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমি জুনদের বাড়িতে যাচ্ছি। কাপড়গুলোর জন্যে।'

এটা ভাল লাগল না কিশোরের। সে চায়, কোন একটা ছুতো রেখে দিক ফারিহা, যাতে দরকার পড়লেই জুনের ওখানে যেতে পারে। জুন আরেক দিকে ফিরতেই মাথা নেড়ে ফারিহাকে ইশারা করল সে। বুঝল মনে হলো ফারিহা। কারণ কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর গিয়ে উঠল জুনের গাড়িতে।

'গাড়ি বটে একখান,' মুসা বলল। 'চিকেনমোবাইল নাম রেখে দেয়া যায়।' অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যাডিলাক কনভারটিবলটা। হলুদ আর কমলা রঙের বডি। হুডের ওপর বড় করে আঁকা রয়েছে মুরগীর ছবি আর চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের নাম। সামনের গাড়িকে সরার জন্যে হর্ন টিপলেন লারসেন। কুক্কুরুক-কুক করে মোরগের ডাক দিয়ে উঠল বাঁশিটা।

'যাচ্ছেন কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হয়তো ডিনার খেতে,' জবাব দিল মুসা।

'মুসা, পিছু নেয়া দরকার,' গাড়িটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। 'তুমি যাও। আমি আর রবিন ডন বারোজের পিছু নেব। দেখি কে কোথায় যায়?'

মুসা রওনা হয়ে গেল। রবিনের ফোক্সওয়াগনে উঠল কিশোর। ডন গাড়ি নিয়ে রওনা হতেই তার পিছু নিল। ওর গাড়িটাও বিচিত্র। লম্বা শরীরের একটা লিঙ্কন টাউন কার। দুই পাশে আঁকা লারসেন রেস্টুরেন্টের মনোগ্রাম।

কয়েক ঘণ্টা ধরে তার পেছনে লেগেই রইল রবিন আর কিশোর। প্রথমে সাগরের ধারের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার খেলো ডন। একা। তারপর গেল শুগারলোফ ক্যানিয়নে পাহাড়ের কোলে তৈরি একটা ছোট বাড়িতে। অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। আরও বাড়িঘর আছে ওখানে। কিন্তু এত দূরে দূরে, দেখে মনে হয় ওখানে যারা বাস করে তারা পড়শীদের এড়িয়ে চলে। কিংবা নিঃসঙ্গ থাকতে ভালবাসে।

ডনের বাড়ির নিচে পাহাড়ের উপত্যকায় গাড়ি রাখল রবিন। দু'জনেই ভাবছে, এরপর কি করবে?

'ভেতরে তো ঢুকছে না,' রবিন বলল। দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘন ঝোপে ঢুকে নজর রাখছে। 'পেছনে চলে যাচ্ছে কেন?'

'চলো, দেখি,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

আরেকটা মিনিট সময় দিল ওরা ডনকে। তারপর এগোল। লম্বা ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে বাড়ির পাশ ঘুরে সরু একটা পথ ধরে চলল ডন যেদিকে গেছে। বাড়ির ভেতর অন্ধকার। পেছন দিকে এসে দেখল, বাইরেটা আলোকিত করার ব্যবস্থা রয়েছে গাছের ডালে বাল্ব ঝুলিয়ে।

'বেড়া,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'আকার-আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে ওপাশে সুইমিং পুল আছে।'

তার কথা শেষও হলো না, ঝপাং করে শব্দ হলো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

'আয়, জলদি আয়,' ডনের গলা শোনা গেল। 'ওরকম করছিস কেন?···ওয়ান···টু···থ্রী···নাম!'

আরেকবার ঝপাং শোনা গেল।

'ওর সঙ্গে কারা আছে?' রবিনের প্রশ্ন। তাকাল কিশোরের দিকে।

'চলো, দেখি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রবিন। এগোল দু'জনে। আস্তে করে গেট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। একটা আউটডোর শাওয়ার আর স্নানের উপযোগী ছোট একটা ঘর আড়াল করে রেখেছে পুলের গভীরতম অংশটা। পা টিপে টিপে ঘরটার দিকে এগোল দু'জনে। পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখার ইচ্ছে।

হঠাৎ প্লাস্টিকের একটা হোস পাইপে পা বেধে গেল কিশোরের। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চোখের পলকে আবিষ্কার করে ফেলল দুই গোয়েন্দা, কাদেরকে গোসল করাচ্ছিল ডন। প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। পানিতে দাপাদাপি করে দ্রুত সাঁতরে

উঠে এল কুকুরদুটো। যা তা কুকুর নয়। ডোবারম্যান পিনশার!

'ধর! ধর!' চিৎকার করে আদেশ দিল ডন। 'নিশ্চয় চোর!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে গেটের দিকে ছুটল কিশোর। কনুই যে ছড়ে গেছে খেয়ালই করল না। ওর আগেই ছুটতে শুরু করেছে রবিন। ছুটছে আর চিৎকার করছে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু কে শুনবে ওদের চিৎকার? সব চেয়ে কাছের পড়শী রয়েছে মাইলখানেক দূরে।

বাড়ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। গেটটা কোথায়? সরিয়ে ফেলল নাকি কেউ? আসলে, এতই ভয় পেয়েছে ওরা, সামনে কয়েক ফুট দূরের গেটটাও যেন চোখে পড়ছে না। ওদের মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে কেবল দৌড়েই চলেছে, পথের শেষ আর মিলছে না।

অবশেষে গেটের কাছে পৌঁছল রবিন। কিশোর বেরোতেই ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিল ওটা। ভেতরে আটকা পড়ল কুকুরগুলো। একটা মুহূর্ত নষ্ট করল না ওরা। গাড়ির দিকে ছুটল।

এবারও আগে পৌঁছল রবিন। ড্রাইভিং সীটে বসেই ঠেলে খুলে দিল প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা। কিশোর উঠে দরজা লাগানোর আগেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করে দিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি। 'ওফ, বড় বাঁচা বাঁচলাম!' এখনও হাঁপাচ্ছে রবিন।

কথা বলতে পারছে না কিশোর, এতই হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়বে হৃৎপিণ্ডটা।

পুরোপুরি শান্ত হতে হতে গাড়িটা সরে চলে এল কয়েক মাইল দূরে। বলল, 'লাভ হলো না। দেখতে পারলাম না কিছু। একটা কথাই জেনে এলাম, ডনের বাড়িতে সিকিউরিটি খুব কড়া। কেন? চলো, হেডকোয়ার্টারে। ওখানে বসেই আলোচনা করব।'

অনেকক্ষণ পর ওয়ার্কশপে বসে ডনের বাড়িতে ঢোকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মুসা এবং ফারিহাকে জানাল কিশোর আর রবিন।

এরপর মুসার রিপোর্ট করার পালা এল। সে বলল, 'চিকেন লারসেনকে অনুসরণ করে তো গেলাম। ভেগ আউট রেস্টুরেন্টটা চেনো তো? ওখানে ঢুকল। একটা শেফ'স সালাদ কিনে নিয়ে সোজা গেল ফেলিক্স আরোলার অফিসে।'

'মিরাকল টেস্টে?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'হ্যাঁ। আরোলার অফিসটা লং বীচে। ল্যাবরেটরি আছে, একটা গুদামঘর আছে।'

'নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন?'

'দারোয়ানগুলোকে তো তেমন কড়া মনে হলো না। নিরীহ, গোবেচারা চেহারা। তবে ঢোকার মুখে সিকিউরিটি সিসটেম ভীষণ কড়া। অনেকগুলো অ্যালার্ম আর একটা কম্পিউটার কীপ্যাড পেরিয়ে যেতে হয়।'

ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর। কিছু জিজ্ঞেস করল না, তবে ভঙ্গিটা তোমার-কি-খবর?

'ব্যবস্থা করে এসেছি,' মাথা কাত করে হাসল ফারিহা। 'কাপড়গুলো আমাকে ফিরিয়ে দিল জুন। কি করি ভাবতে লাগলাম। শেষে কায়দা করে ওগুলোতে কফি ফেলে দিলাম। যেন হঠাৎ করে হাত ফসকে পড়ে গেছে এমন ভাব করলাম। ও কিছু বোঝেনি। আহা উহু করল খানিক। শেষে বলল, ধুয়ে দেবে। কিছুতেই আমাকে আনতে দিল না। কাল আবার যাব আনার জন্যে।'

'পরের দিন গেলেও পারো,' কিশোর বলল। 'কিংবা তার পরের দিন। যাক, ভাল কাজই করে এসেছ,' হঠাৎ ওয়ার্কশপের দরজার দিকে ঘুরে তাকাল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল মুসাকে। তার সঙ্গে যেতে বলল। দ্রুত এগিয়ে গেল দু'জনে। দু'পাশের দরজার কাছে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। তারপর হ্যাঁচকা টানে তার কাছের দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর।

বাইরে অন্ধকার। কেউ নেই। জুতোর বাক্সের চেয়ে বড় একটা বাক্স পড়ে আছে। বাদামী কাগজে মোড়া। লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। হাতে লেখা একটুকরো কাগজ লাগানো রয়েছে; কিশোর পাশার জন্যে।

পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। জুতোর ডগা দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। তারপর ঠেলে সরিয়ে দিল।

'বেশ ভারি।'

ঝুঁকে তুলে নিল বাক্সটা কিশোর। 'হ্যাঁ, ভারিই।'

'খুলবে নাকি?' কিশোরকে ওটা বয়ে আনতে দেখে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না না, খুলো না!' বাধা দিল ফারিহা। 'বোমাটোমা থাকতে পারে!'

একটা মিনিট চুপ করে রইল কিশোর। কান পেতে শুনছে বাইরে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। অনুমান করার চেষ্টা করছে বাক্সের ভেতর কি আছে। বাইরে কি কেউ অপেক্ষা করছে এখনও? সতর্ক রয়েছে মুসা আর রবিন। টান টান হয়ে আছে স্নায়ু। বিপদ দেখলেই প্রতিরোধ করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সুতোটা খুলল। হাতের তালুতে রেখে আরেকবার আন্দাজ করার চেষ্টা করল। যা-ই আছে, বাক্সটা কাত করলেই নড়ছে ভেতরে। আস্তে আস্তে বাদামী কাগজের মোড়ক খুলল সে। বুঝতে পারেনি, মুখের দিকটা কাত করে রেখেছিল। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ পড়ল পায়ের ওপর।

চিৎকার করে উঠল ফারিহা।

কিশোরের মুখ সাদা হয়ে গেল।

কিশোরের জুতোয় পড়েছে কালচে লাল রক্তের ফোঁটা। বাক্সের ভেতর থেকে বেরোল একটা মরা মুরগী, সদ্য গলা কেটে খুন করা হয়েছে। ভেতরে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, রক্তের ছোপ লেগে আছে।

কাগজটার ভাঁজ খুলল কিশোর। লেখা রয়েছে ঃ

কিশোর পাশা—

তোমার স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল। বেশ মোটাতাজাও হয়েছ, জবাই করার উপযুক্ত। মুরগী মোটাতাজা হলেই তো জবাই করে লোকে।

খাঁচার বাইরে আছ, বাইরেই থাকো। ঢোকার চেষ্টা কোরো না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিও না। শেষবারের মত সতর্ক করলাম!

দশ

থ্রপ! থ্রপ! থ্রপ! গ্যারেজের দরজায় বার বার বলটা ছুঁড়ে মারছে মুসা। সুন্দর সকাল। উজ্জ্বল রোদ। কয়েকবার ওরকম করে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠে জালের ভেতর দিয়ে বলটাকে গড়িয়ে দিল সে। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। 'অ্যাই, কিশোর, কি ভাবছ? খেলবে?'

'আমি ভাবছি কাল রাতের কথা। গলাকাটা মুরগীর কথা।'

'জানি আমি। হপ্তাখানেক দুঃস্বপ্ন দেখার জন্যে যথেষ্ট। সে জন্যেই তো খানিকটা ব্যায়াম করছি। ব্যায়াম দুশ্চিন্তা দূর করে। তোমার জুতো থেকে রক্ত মুছেছ?'

বীভৎস দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল আবার কিশোরের। কাটা গলা থেকে টপ টপ ঝরছে রক্তের ফোঁটা। মানুষের গলা কাটলেও ওরকম করেই ঝরবে। যেমন ধরা যাক, তার…

আরেকবার বলটা নিয়ে নেটের দিকে দৌড়ে গেল মুসা।

'দুশ্চিন্তাটা আপাতত থাক না,' কিশোর বলল। 'ব্যায়াম না হয় না-ই করলাম। ভাবছি, কে পাঠাল ওটা? চিকেন লারসেনের কাছ থেকে দূরে থাকতে কে বলছে আমাকে? লারসেন নিজে এই কাজ করেছে এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনি বরং আমাদেরকে কাছে ঘেঁষতেই বলেন। আমাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করানোরও ইচ্ছে আছে।'

'কিশোর, জবাবগুলো কি আমার কাছে চাইছ?' মাথা নাড়ল, 'আমাকে মাপ করে দাও। ওকাজগুলো তুমিই সার। ধাঁধা সমাধানের ব্যাপারে যে আমি কত বড় এক্সপার্ট, ভাল করেই তো জানো।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলটা নিল মুসার হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে মারল জাল সই করে। নেটের ধারেকাছে গেল না বল।

'হচ্ছে,' ভরসা দিল মুসা। 'একটু প্র্যাকটিস করলেই পারবে…'

'এক মাইল দূর দিয়ে গেল, আর তুমি বলছ পারব…'

ড্রাইভওয়েতে ঢুকল রবিনের ফোক্সওয়াগন। ভটভট ভটভট করছে ইঞ্জিন। হর্ন বাজাল একবার সে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

'অ্যাই, কেমন আছ তোমরা?' এগিয়ে এসে বলল সে। 'সকালের কাগজ দেখেছ?' ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'পয়লা পাতার বিজনেস সেকশনটা দেখো।'

বল নিয়ে ব্যস্ত হলো মুসা। বার বার জালের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

কিশোর পড়তে লাগল লেখাটা।

'চমৎকার,' কয়েক মিনিট পর মুখ তুলে বলল সে। 'একেবারে সময়মত

দিয়েছে। তাহলে এই ব্যাপার। লারসেনের রেস্টুরেন্ট কেনার জন্যে খেপেই গেছে মনে হচ্ছে হেনরি অগাসটাস। হুম্‌ম্‌...একটা ফোন করা দরকার।'

পাঁচ মিনিট পর মুসাদের বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মুখে বিচিত্র হাসি।

'কাকে করেছিলে?' জানতে চাইল মুসা।

'হেনরি অগাসটাসকে। মনে হলো, ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার সময় হয়েছে। চিকেন লারসেনের রেস্টুরেন্ট কিনে নিতে না পারলে খাবারে বিষ মিশিয়ে সে তাঁর ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা করতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক।'

'সে কি বলল?'

'তার সঙ্গে কথা হয়নি। নেই অফিসে। সেক্রেটারি বলল, শহরের বাইরে গেছে। কোথায়, জানো?'

'আমি জানব কি করে? আমি তো এখানে বল খেলছিলাম।'

'পিটালুমায়,' ঘোষণা করল যেন কিশোর। 'স্যান ফ্র্যান্সিসকোর উত্তরে। ওখানেই চিকেন লারসেনের মুরগীর খামার।'

ঘন্টাখানেক পরেই স্যান ফ্র্যান্সিসকো যাওয়ার প্লেনে চাপল কিশোর আর মুসা। জুনকে ফোন করেছে রওনা হওয়ার আগে। তদন্ত করতে যা খরচ হবে, দিতে রাজি হয়েছে জুন। ও কল্পনাও করতে পারেনি, ওর বাবার ব্যাপারেও খোঁজ নিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

রবিন সঙ্গে আসতে পারেনি। সেই একই কারণ। অফিসে কাজ বেশি, ঝামেলা। দুটো বিবাহ উৎসবে একই ব্যাণ্ডের বাজনা বাজানোর কথা একই দিনে, ব্যবস্থা করাটা বেশ কঠিন। সময়ের একটু হেরফের হলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে। আর ব্যর্থতার দোষটা তখন এসে পড়বে ওর ঘাড়ে। এসব চাপ যখন পড়ে, তখনই ভাবতে আরম্ভ করে সে, ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটা ছেড়েই দেবে।

স্যান ফ্র্যান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল কিশোর। মুসাকে নিয়ে চেপে বসল। ওখান থেকে উত্তরে ঘণ্টাখানেকের পথ পিটালুমা। চিকেন লারসেনের খামার খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না। বিরাট এক র‍্যাঞ্চ ছিল একসময়ে ওটা। ওই এলাকার সবাই চেনে।

দেখতে মোটেও মুরগীর খামারের মত লাগল না। বরং মোটরগাড়ির কারখানা বললেই বেশি মানায়। বড় বড় দুটো বাড়ি আছে, দুটোই দোতলা, আর অনেক বড়। ঘিরে রেখেছে তারের বেড়া।

বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। শনিবার বলেই বোধহয় কাউকে দেখা গেল না। গেটে পাহারা নেই। নিজেরাই গেটের পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকল। প্রথম বাড়িটার দিকে এগোল পঞ্চাশ গজ মত। চট করে তাকিয়ে দেখে নিল এদিক ওদিক, কেউ দেখছে কিনা। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। কিংবা বলা যায় নিজের কানকে। ভেতরে অনেক মুরগী থাকবে জানত। কিন্তু এত বেশি থাকবে, আর ওগুলোর মিলিত কঁক কঁক এত জোরাল হবে, কল্পনাই করতে পারেনি। কানে তালা

লেগে যাবার জোগাড়। গ্রীন হাউসের মত কাচের ছাত দিয়ে আলো আসছে। পুরো এয়ারকণ্ডিশন করা। ফলে তাপমাত্রার কোন হেরফের হচ্ছে না।

দরজার কাছে দেয়ালে অনেকগুলো হুক লাগানো। তাতে ঝুলছে লারসেন কোম্পানির পোশাক। যারা মুরগীর সেবা-যত্ন করে তাদের ইউনিফর্ম। দুটো নামিয়ে নিয়ে পরে ফেলল দু'জনে। কোম্পানির কর্মচারীর ছদ্মবেশে শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি।

প্রথমেই যেটা বুঝতে পারল, তা হলো, এই বিল্ডিঙে মানুষের চলাফেরার বড়ই অসুবিধে। মুরগীর পাল তো আছেই, তার চেয়ে বেশি অসুবিধে করছে মেঝেতে বসানো লাল প্লাস্টিকের পাইপ। কয়েক ইঞ্চি পর পরই। যেন লাল খুঁটির মত বেরিয়ে আছে, কিংবা গজিয়ে আছে। হাঁটার সময় ওগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হয়। খাবার সরবরাহ করা হয় ওসব পাইপ দিয়ে। প্রতিটি পাইপের মুখের কাছে কায়দা করে লাগানো রয়েছে লাল প্লাস্টিকের পাত্র, আঠারো ইঞ্চি পর পর। পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে পাইপের সাহায্যে। পানি খেতে অসুবিধে হয় না মুরগীগুলোর। পুরো ব্যবস্থাটাই এমন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা মুরগীগুলো নিজেই সারতে পারে, বাইরের কারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সে জন্যেই কোন লোককে দেখা গেল না আশপাশে।

অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঘরটাকে। একেক ভাগে রয়েছে একেক বয়েসের আর আকারের মুরগী। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাত মিশতে পারছে না কোনমতেই। এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে ঘুরে বেড়াতে লাগল দু'জনে।

'কিছু কিছু মুরগী খুব অদ্ভুত, তাই না?' মুসা বলল। 'ওই যে ওটাকে দেখো। ডানা কি রকম ছোট। এত ছোট ডানার মুরগী আর দেখিনি।'

'একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় এটা করা হয়,' কিশোর বলল। 'একে বলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের প্রজনন ঘটিয়ে, খাবারের পরিবর্তন করে ওরকম করা হয়। এতে ডানা ছোট হয়ে যায়, বুকের মাংস যায় বেড়ে। অনেক বেশি মাংস পাওয়া যায় ওগুলো থেকে।'

'এমন ভারি করা করেছে, নড়তেই তো পারছে না...'

এই সময় তিনজন লোক ঢুকল ঘরে। চার পাশে তাকাতে শুরু করল। খানিক আগে যে ছোট জাতের মুরগীগুলোর কাছে ছিল কিশোর আর মুসা, সেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'কুইক,' কিশোর বলল। 'কাজ করার ভান কর!'

'কিছুই তো করার নেই। মেশিনেই করছে।'

'তাহলে লুকিয়ে পড়!'

বেড়া দিয়ে আলাদা করা এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগকে। একটা বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দু'জনে। বেড়াটা নিচু। ইচ্ছে করলে মাথা তুলে দেখতে পারে লোকগুলো কি করছে। বিরক্ত করতে লাগল মুরগীগুলো। কেবলই পায়ের ওপর এসে পড়ছে। অযথাই ঠোকর মারছে, খাবার আছে মনে করে।

'বেরোতে হবে এখান থেকে,' আচমকা বলে উঠল কিশোর। 'যতবার সাদা

মুরগীগুলো দেখছি, কাল রাতের ওটার কথা মনে হয়ে যাচ্ছে আমার।'

এগিয়ে আসছে লোকগুলো। একজনের গায়ে লাল শার্ট, খাকি প্যান্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ, তাতে লারসেন মনোগ্রাম আর সুতো দিয়ে তোলা লাল অক্ষরে নাম লেখা রয়েছে 'ডরি'। অন্য দু'জনকে এই পরিবেশে একেবারেই মানাচ্ছে না। গাঢ় নীল স্যুট পরনে, একজনের চোখে বৈমানিকের সানগ্লাস। এই লোকটার বয়েস কম। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। সানগ্লাসটা খুললে দেখা গেল নীল চোখ যেন জ্বলছে।

ডরি বলল, 'মিস্টার অগাসটাস, আর কিছু দেখার প্রয়োজন আছে আপনার?'

হেনরি অগাসটাস? কান খাড়া করল কিশোর। একটা কথাও এড়াতে চায় না।

ডরির দিকে তাকাল হেনরি। তারপর অন্য লোকটার দিকে। 'না, অনেক দেখেছি,' কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। 'নোট লেখ। অনেক কিছু বদলাতে হবে এখানকার। দেখতেই পাচ্ছি।'

'লিখছি,' বলে তাড়াহুড়ো করে পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করল নীল স্যুট পরা অন্য লোকটা।

আবার সানগ্লাসটা নাকের ওপর বসাল হেনরি। ডরিকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রোডাকশন কেমন তোমাদের?'

'হপ্তায় পঞ্চাশ হাজার করে জবাই করার উপযোগী পাওয়া যায়।'

'নাহ্, যথেষ্ট নয়,' হেনরি বলল। 'দ্বিগুণ করা দরকার।'

কথাটা লিখে নিল তার সহকারী।

'মিস্টার লারসেন বলেন ভিড় বাড়িয়ে ফেললে মুরগীর অসুবিধে হবে,' ডরি বলল।

'এটা মুরগীদের রেস্ট হাউস নয়,' হাসল হেনরি। কুৎসিত লাগল হাসিটা। 'এটা কারখানা। যত বেশি প্রোডাকশন দেয়া যাবে, তত বেশি টাকা আসবে।'

আরেকবার ঘরটায় চোখ বোলাল হেনরি। মাথা নাড়ল। তারপর নিচু হয়ে খাবারের পাত্র থেকে একমুঠো দানা তুলে নিয়ে দেখল। ডরির দিকে তাকাল আবার। 'খাবারও বদলাতে হবে। আমি নিজে দেখব সেদিকটা। কি দেব ভেবেই রেখেছি।'

লেখা শেষ করে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তার সহকারী। দরজা খুলে ধরল। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো একটা মার্সিডিজ গাড়িতে উঠল হেনরি। গাড়িটা ঘুরে চলে যাওয়ার সময় ওটার লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকাল কিশোর।

লেখা রয়েছেঃ প্লাকার-১।

এগারো

'লোকটার মধ্যে মানবিকতার ছিটেফোঁটাও নেই,' কিশোর বলল। দক্ষিণে স্যান

ফ্র্যান্সিসকোর দিকে চলেছে ওরা। 'প্রচণ্ড স্বার্থপর।'

'যা বলেছ। তবে সঙ্গে জানোয়ার শব্দটা যোগ করতে পারতে।'

আর তেমন কোন কথা হলো না। নীরবে গাড়ি চালাল মুসা। সাতটা বাজে। শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে। আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'রাখ! রাখ!'

'কি হয়েছে?' পথের পাশে গাড়ি নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল মুসা। তারপর চোখে পড়ল নির্দেশকটা। একটা বাড়ির লাল রঙ করা ছাতে বসানো একটা মুরগী। ভেতরে জ্বলছে নিয়ন আলো। চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের চিহ্ন।

সেদিকে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল মুসা। সে পার্ক করে বেরোতে বেরোতে রওনা হয়ে গেছে কিশোর। একটা সেকেণ্ড দেরি করেনি।

দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা দম নিল। খাবারের সুগন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস।

'আরে সর না,' মুসা বলল। 'জায়গা দাও। লোকে ঢুকবে তো।'

কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল দু'জনে। সতেরো-আঠারো বছরের একটা মেয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। গায়ে লাল শার্ট। পরনে খাকি প্যান্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ। সামনের দিকের বাড়তি অংশটা মুরগীর ঠোঁটের মত। ক্যাপে লাল সুতোয় তোলা লেখা পড়ে বোঝা গেল ওর নাম নেলি।

মোলায়েম ভদ্র গলায় ওদেরকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'কি দেব?'

'বিষাক্ত খাবার,' বিড়বিড় করল মুসা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

'কী?'

'অ্যাঁ! ও, মুরগী। আর কি। এখানে তো ওটাই স্পেশাল।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা, 'খাবে তো? তোমার পেট...'

'চুলোয় যাক পেট। অনেক সয়েছি। আর না। এত সুগন্ধ, না খেয়ে আর পারব না।'

জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিল দু'জনে। খাবার এল। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে যার ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা সে-ই ছুঁল না। হাত গুটিয়ে বসে রইল মুসা।

'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'বলা যায় না। এখানকার খাবারেই হয়তো বিষ মিশিয়েছে। যদি থাকে?'

'তা থাকতেই পারে। তবে জীবনটাই ঝুঁকিপূর্ণ। রিস্ক তো নিতেই হবে,' বলে আর কথা না বাড়িয়ে মুরগীর মাংসে কামড় বসাল কিশোর।

শ্রাগ করল মুসা। তারপর সে-ও আর দ্বিধা করল না।

'এই কেসের সমস্ত রহস্যের সূত্র লুকানো রয়েছে জুনের ব্রিফকেসে,' চিবাতে চিবাতে বলল কিশোর। 'আমার বিশ্বাস। কি ছিল জানতে পারছি না। ওর অ্যামনেশিয়া না কাটলে বলতে পারবে না। যে লোকটা বিষ মেলাতে চায় সে জানে আমরা এ কেসের তদন্ত করছি। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরাতে না পারলে তার পরিকল্পনা বদল করবে। সময়টা এগিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তো?'

'তো, আমাদেরকেও তাড়াতাড়ি রহস্যটা ভেদ করতে হবে। তিনজনকে

সন্দেহ করি আমরা আপাতত। ওদের নিয়েই আলোচনা করা যাক।'

'করো।' মুসা জানে, আলোচনা এবং বিশ্লেষণ দুটোই কিশোর করবে, সে শ্রোতা মাত্র।

'প্রথমেই ধরা যাক, কেন অপরাধ করে লোকে। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। ধরলাম, এ ক্ষেত্রে চিকেন লারসেন কাজটা করতে চাইছেন। তাঁর পক্ষে বিষ মেশানো খুব সহজ। মুরগীর খাবারে কিছু মিশিয়ে দিতে পারেন। কিংবা মুরগী দিয়ে খাবার তৈরি করার সময় মাংসে মেশাতে পারেন।'

মাংস মুখে পুরতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল মুসা। তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর রেখে দিল প্লেটে।

'কিন্তু চিকেন লারসেনের উদ্দেশ্য কি?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'মোটিভ?'

'কি আর? পাগল!'

'এতটাই পাগল, যে লাখ লাখ মানুষকে মারবেন? নিজের মেয়েকে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে মেরে ফেলতে চাইবেন?'

'আমি কি করে জানব? কিন্তু গলা কেটে আর কে মুরগী পাঠাতে যাবে আমাদের কাছে?'

'যে কেউ পারে। বাজার থেকে কিনে নিলেই হলো। হেনরি অগাসটাসের কথা ধরতে পারি আমরা। তার মোটিভ খুব জোরাল। লারসেনের বদনাম করে দিয়ে তাঁকে ধ্বংস করে দিতে চায়। নিজের ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে। পিটালুমায় মুরগীর ঘরে ঢুকে আজ একটা কথা বলেছিল, খেয়াল করেছ? মুরগীর খাবারের ব্যাপারটা সে নিজে দেখবে। হতে পারে, খাবারে বিষ মেশানোর কথাই বলেছে। এমন কিছু, যেটা মুরগীর তেমন ক্ষতি না করলেও মানুষের করবে। খামারটা না কিনেও যে কেউ করতে পারে কাজটা। যে কেউ ঢুকতে পারে। ইচ্ছে করলে আমরাও মিশিয়ে দিতে পারতাম। কেউ বাধা দেয়ার ছিল না।'

'বেশ, দু'জন গেল। আরেকজন কে?'

'মিস্টার এক্স। যাকে আমরা চিনিই না এখনও।'

সন্দেহভাজনদের নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল ওরা। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল। গাড়ির দিকে এগোল।

স্যান ফ্র্যান্সিসকোতে পৌছতে পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল। জায়গাটা কুয়াশার জন্যে বিখ্যাত। ইতিমধ্যেই নামতে আরম্ভ করেছে। ঘিরে ফেলেছে গোল্ডেন গেট ব্রিজকে। চোখে পড়ছে কেবল ব্রিজের দুটো টাওয়ারের ওপরের অংশ আর একেবারে নিচে চলমান যানবাহন। মাঝখানটা ফাঁকা, কুয়াশার জন্যে চোখে পড়ে না, যেন কিছুই নেই ওখানটায়।

স্যান ফ্র্যান্সিসকোর সাতটা পাহাড়েরও একই অবস্থা। চূড়া আর গোড়ার উপত্যকা চোখে পড়ে, মাঝখানটা অদৃশ্য। আরও অনেকবার দেখেছে মুসা। তার কাছে ব্যাপারটা একটা বিরাট রহস্য। এরকম কেন হয়? মধ্যগ্রীষ্মের প্রতি রাতেই ঘটে এই একই কাণ্ড।

রেডিও অন করে দিল সে। রক মিউজিক বাজছে একটা স্টেশনে।

বিমান বন্দর থেকে মাইল পনেরো দূরে থাকতে অস্বস্তিতে পড়ল। বার বার রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাচ্ছে। বলল, 'পেছনে দেখো। একটা লাল রঙের ক্যাভেলিয়ার।'

'তাতে কি?' কিশোরের প্রশ্ন।

'মনে হয় আমাদের অনুসরণ করছে।'

কে করবে? ভাবতে লাগল কিশোর। ওরা যে স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় এসেছে একথা কেউ জানে না। কিন্তু মুসার সন্দেহ গেল না কিছুতেই। অবশেষে কিশোর বলল, 'রাখ তো। দেখি।'

গতি কমাল মুসা। দ্রুত এগিয়ে এল লাল গাড়িটা। আরেকটু হলেই বাম্পারে বাম্পারে লেগে যাবে। ভেতরে কে আছে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। হেডলাইটের আলো এসে পড়ে চোখে। ডানে কাটছে গাড়িটা। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। জানালা নামিয়ে দিল কিশোর। ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। একেবারে মুখোমুখি।

অস্ফুট একটা শব্দ করে প্রায় ছিটকে জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। মিস্টার এক্স! সেই আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। মুখে গর্ত গর্ত দাগ। গুটি বসন্ত হলে কিংবা ব্রণের ক্ষত হলে যেমন হয় অনেকটা সে রকম। শীতল একটা হাসি যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ঠোঁটে। সাপের চোখের মত ঠাণ্ডা চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, খুনীর চোখের দিকে চেয়ে আছে।

'চলো! পালাও!' চিৎকার করে মুসাকে বলল কিশোর।

কেন চিৎকার করল কিশোর, দেখার জন্যে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে দেখতে চাইল মুসা। হেসে উঠল মিস্টার এক্স। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গুঁতো মারতে এল ওদের গাড়িকে।

কিন্তু ততক্ষণে গ্যাস প্যাডালে চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে মুসা। খেপা ঘোড়ার মত লাফিয়ে আগে বাড়ল ওদের গাড়ি।

'অনুসরণ নয়,' রিয়ারভিউ মিররে চট করে একবার দেখে নিয়ে বলল সে, 'আমাদেরকে রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে এসেছে ব্যাটা!'

ঠিক পেছনে লেগে রইল মিস্টার এক্স। সামনে গাড়িটাড়ি কিছু পড়লে, কিংবা অন্য কোন কারণে মুসা গতি কমাতে বাধ্য হলে শাঁ করে পাশের লেনে সরে যায় লাল গাড়িটা, ধেয়ে এসে ধ্রাম করে বাড়ি লাগিয়ে দেয়। তবে এখনও বডিতে লাগাতে পারেনি, কেবল বাম্পারে লাগিয়েছে।

'বেরোও,' কিশোর বলল। 'ওকে আটকে রেখে বেরিয়ে যাও কোনখান দিয়ে! খসাতেই হবে!'

দ্রুত মহাসড়ক থেকে নেমে পড়ল মুসা। লাল গাড়িটাও নামল। মুসা যত জোরেই চালাক না কেন, ঠিক পেছনে লেগে থাকে। আর সুযোগ পেলেই এসে গুঁতো মারে। কিছুই করার নেই আর, চালানো ছাড়া। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ?

এই অন্ধকারে কি করবে?

মুসার একবার মনে হলো, রুখে দাঁড়ায়। সে-ও ধাক্কা মারে। কিন্তু ওই গাড়িটা অনেক বেশি শক্ত, ওটার সঙ্গে পারবে না। পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

পাহাড়ের কোলে একটা আবাসিক এলাকায় চলে এল ওরা। নামেই আবাসিক, বাড়িঘরগুলো এত দূরে দূরে, জনবসতিশূন্যই মনে হয়। হঠাৎ তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে শুরু করল মুসা। ধ্রাম করে গুঁতো লাগল পেছনে। একটা নির্দেশকে দেখা গেল স্যান ফ্র্যান্সিসকোর বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পট টুইন পিকসের দিকে চলেছে ওরা। পর্বতের চূড়াদুটোর ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে। সুন্দর উপত্যকা, জলরাশি, শহরের আলো, সব দেখা যায়।

মোড় নিয়ে উঠে গেছে পথটা। আরেকটু উঠতেই খেয়াল হলো মুসার, সামনের কুয়াশার ভেতরে ঢুকতে হবে। ধ্রাম করে বাড়ি লাগল আবার।

'বাপরে বাপ, এমন কুয়াশা জিন্দেগিতে দেখিনি,' গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল সে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। এতই ঘন কুয়াশা হেডলাইটের তীব্র আলোও সামনে ফুটখানেকের বেশি ভেদ করতে পারে না। একবার ভাবল, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যায় আবার যে পথে এসেছে। কিন্তু ঘোরানোর জায়গা নেই। আর মিস্টার এক্সও ওদেরকে সে সুযোগ দেবে না।

ধ্রাম!

পেছনে তাকাল কিশোর। কুয়াশার জন্যে দেখাই যাচ্ছে না ক্যাভেলিয়ারটাকে। এমনকি হেডলাইটও দেখতে পাচ্ছে না। গুঁতো মারছে বলেই বুঝতে পারছে, ওদের পেছনে রয়েছে মিস্টার এক্স।

তারপর একসময় থেমে গেল গুঁতো মারা। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, একটিবারও আর গুঁতো লাগল না।

'কি ব্যাপার?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'বুঝতে পারছি না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না পেছনে। চালাতে থাকো।'

আরও শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরল মুসা। একটা মোড় এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারছে না সে। কিছুই দেখার জো নেই। পথের কিনারে হঠাৎ করে কোনখান থেকে খাড়া নেমে গেছে ঢাল, তা-ও জানে না।

'মোড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে সে…মোড় পেরোচ্ছে… এই সময় কুয়াশার ভেতর থেকে উদয় হলো আবার লাল কনভারটিবলটা, বাঁ দিক থেকে। ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল ওদের গাড়িটাকে।

চিৎকার করে উঠল কিশোর।

বাঁয়ে কাটল মুসা। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে সরে এল গাড়ি। মোড়টা পেরিয়ে এসেছে। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে আর বাধল না ওর। তীব্র গতিতে কুয়াশার ভেতরে অন্ধের মত চালিয়ে দিল গাড়ি।

পাহাড়ের ওপরে উঠতেই নেমে গেল কুয়াশা। আসলে বেরিয়ে এসেছে কুয়াশার ভেতর থেকে।

ধড়াস ধড়াস করছে বুক। সামনে একটা পার্কিং লট। ওখানে গাড়ি রেখে নিচের দৃশ্য দেখে দর্শকরা। সোজা সেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের।

'এইবার আসুক দেখি ব্যাটা!' সমস্ত ক্ষোভ ঝরে পড়ল কণ্ঠ থেকে। 'বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব!'

'হ্যাঁ,' কিশোরের কণ্ঠও কাঁপছে, 'যদি পিস্তল না থাকে!'

বারো

চুপ করে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। গাড়ির ইঞ্জিন চলছে। বেশ কিছু দর্শক রয়েছে ওখানে। কিছু করার সাহস পাবে না মিস্টার এক্স। ভয় চলে যেতেই রাগে ফুটতে আরম্ভ করেছে মুসা।

'সাহস আছে হারামজাদার,' দাঁতে দাঁত চাপল সে। 'কুয়াশার মধ্যে ঠিকই গুঁতোগুঁতি করল। গাড়ি নিয়ে শয়তানী করেছে বলে পার পেয়ে গেছে। এখন আসুক...আসে না কেন? এত দেরি? করছেটা কি?'

'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'অনেক কারণ থাকতে পারে...'

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ক্যাভেলিয়ারের দেখা নেই।

হঠাৎ ড্যাশবোর্ডে চাপড় মারল কিশোর। 'এখুনি এয়ারপোর্টে যেতে হবে আমাদের, প্লেন ধরতে হলে!'

'কিন্তু মিস্টার এক্স?'

'ও আসবে না। বুঝতে পেরেছে, এখানে আমাদের কিছু করতে পারবে না। কাজেই ফিরে চলে গেছে।'

হতাশ হলো মুসা। সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিঙের ওপর। ওটাকেই কিল মারল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বের করে আনল পার্কিং লট থেকে।

'সাবধানে থাকবে,' কিশোর বলল। 'বলা যায় না, ঘাপটি মেরে থাকতে পারে কোথাও। মহা পাজি লোক।'

তবে পথে আর বিপদ হলো না। নিরাপদেই বিমান বন্দরে পৌঁছল ওরা। যেখান থেকে গাড়িটা ভাড়া করেছে সেখানে ফিরিয়ে দিতে গেল। গাড়িতেই চাবি রেখে অফিসের দিকে পা বাড়াল দু'জনে। ভাড়া মিটিয়ে দেবে। কিন্তু ঢোকার আগেও মুহূর্তে কিশোরের হাত ধরে টান মেরে ঘুরিয়ে ফেলল মুসা। 'ওই যে! লাল ক্যাভেলিয়ার!'

কিশোরও দেখল। 'কিন্তু ওটাই কি আমাদের পিছে লেগেছিল? চলো, দেখি।'

গাড়িটার কাছে এল ওরা। শূন্য। ভেতরে কেউ নেই। চারপাশে ঘুরে দেখল। লাইসেন্স প্লেট দেখে কিশোর বলল, 'এটাই! জলদি অফিসে যাও! এখনও থাকতে পারে ব্যাটা! না পেলে ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করবে, লাল কনভারটিবলটা যে ভাড়া করেছিল তার নাম কি। যাও, আমি আসছি।'

চলে গেল মুসা। লাল গাড়িটার দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। ভেতরে এমন কিছু কি আছে যেটা সূত্র হতে পারে? খুঁজতে লাগল সে। কার্পেটের পেছনে দেখল, উল্টে নিচে দেখল, সামনের সীটের নিচে ওপরে সবখানে দেখল। অ্যাশট্রে, গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট কিছু বাদ দিল না। এমনকি আঙুল আর হাত ঢোকে ওরকম কোন ফাঁকফোকরই বাদ রাখল না।

তবে কষ্ট বিফলে গেল না। মিস্টার এক্স কে, তা জানা যাচ্ছে না, তবে কোথায় পাওয়া যাবে একথা জানা গেল। অফিসের দিকে দৌড় দিল কিশোর। বেরিয়ে আসছে তখন মুসা।

'ক্লার্ক কি বলল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাভ আ নাইস ডে,' জবাব দিল মুসা। বাংলা করে বলল—ভাল বাংলা বলতে পারে আজকাল, 'দিনটা ভাল কাটুক।'

'লাল গাড়িটার কথা কি বলল?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর।

'হ্যাভ আ নাইস ডে। মানুষ নয়। একটা কম্পিউটার।'

'দেখো, আমি কি পেয়েছি।' এক টুকরো দোমড়ানো কাগজ বের করে দেখাল কিশোর। একপাশ চকচকে প্লাস্টিকের মত, আরেক পাশ সাদা, সাধারণ কাগজ।

'ক্যানডির মোড়ক।' হাতে ডলে কাগজটা সমান করল মুসা। লেখাগুলো যাতে পড়া যায়। রূপালি রঙে লেখা রয়েছে, পড়ল, 'মিরাকল টেস্ট! আরে ওই রকম ক্যানডির মোড়ক, চিকেন লারসেনের পার্টিতে যে জিনিস বিতরণ করেছিল ফেলিক্স আরোলা!'

'ঠিক। ফ্রী স্যাম্পল। মার্কেটে ছাড়েনি এখনও। দুটো সম্ভাবনা ধরা যায়। এক, পার্টিতে উপস্থিত ছিল মিস্টার এক্স, আমাদের মতই ফ্রী স্যাম্পল পেয়েছিল। নয় তো, একসঙ্গে কাজ করছে আরোলা আর মিস্টার এক্স।'

'করুকগে,' মুসা বলল। 'সেটা পরেও আলোচনা করা যাবে। প্লেন ধরতে হবে আমাদের, বাড়ি যেতে হবে, ভুলে গেছ?'

জাংক ইয়ার্ডে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে তদন্ত করার সময় নেই আর তখন। মুসা চলে গেল ওদের বাড়িতে। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না কিশোরের। তাই লক কমবিনেশন ডিকোডার নিয়ে কাজে বসল সে। অনেকক্ষণ পর, ক্লান্ত হয়ে উঠে বাতি নিভিয়ে ওঅর্কশপ বন্ধ করতে যাবে, এই সময় বাজল টেলিফোন।

অন্ধকারেই রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল সে, 'হালো?'

'কিশোর,' মুসার কণ্ঠ। 'ফারিহা কথা বলতে চায়।'

আবার আলো জ্বালল কিশোর।

'হাই, কিশোর,' এত রাতেও ফারিহার গলার জোর শুনে অবাক হলো কিশোর, বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ নেই। 'শোনো, কি হয়েছে। জুন লারসেন আজ লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে...'

কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল কিশোর, ফারিহা এখন কি করছে। লম্বা চুলের একটা গোছা আঙুলে পেঁচাচ্ছে আর কথা বলছে। বকবক করে যাবে, করেই যাবে,

এক গল্প শেষ করতেই রাত কাবার। কম কথায় আর শেষ করতে পারে না। অতক্ষণ কানে রিসিভার ঠেকিয়ে রাখার ধৈর্য নেই কিশোরের। তাই স্পীকারের লাইন অন করে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। যাতে প্রয়োজনে শুনতে শুনতে পায়চারিও করতে পারে।

'...অনেক কথাই বলেছে,' জুন বলে যাচ্ছে। 'তবে এখনও মনে করতে পারছে না অ্যাক্সিডেন্টের দিন কোথায় গিয়েছিল আর ব্রিফকেসটা কোথায় রেখেছিল। একটা কথা অবশ্য আবছাভাবে মনে করতে পারছে, সেদিন একটা গাড়ি পিছু নিয়েছিল ওর।...যাই হোক, লাঞ্চের পর আমাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সে। দারুণ একটা গাড়ি। নতুন একটা মাসট্যাং কনভারটিবল কিনে দিয়েছেন তাকে চিকেন লারসেন।'

'আর জানো কি ইঞ্জিন?' পেছন থেকে বলে উঠল মুসা, 'ফাইভ-লিটার ভি এইট ইঞ্জিন...'

'মুসা, প্লীজ,' ওকে থামতে অনুরোধ করল ফারিহা। 'কিশোর আমার গল্পটা শুনতে চাইছে। এক কথার মাঝে আরেক কথা ঢুকিয়ে দিও না। হ্যাঁ, কিশোর, কি যেন বলছিলাম? ও, মনে পড়েছে। গাড়িতে ওঠার আগে ট্রাঙ্ক খুলে পার্সটা ভেতরে ছুঁড়ে দিল সে। অদ্ভুতই লাগল আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, ওরকম করল কেন? লোকে পার্স রাখে হাতে। গাড়ি চালানোর সময় পাশের সীটে রাখে, কিংবা কোলের ওপর রাখে। জবাব দিল ওটা ওর স্বভাব। ভাবলাম, এখন যদি ওর গাড়িটাকে পাহাড় থেকে উল্টে ফেলে দেয় কেউ, তাহলে সহজেই ট্রাঙ্ক থেকে পার্সটা বের করে নিতে পারে। নেয়ার ইচ্ছে থাকলে। কি বললাম, বুঝতে পেরেছ?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ট্রাঙ্ক! ব্রিফকেসটা ট্রাঙ্কে থাকতে পারে!

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' জবাব দিল সে। 'বুদ্ধি আছে তোমার। শিখতে আরম্ভ করেছ।'

হেসে উঠল ফারিহা।

'দেখি, লাইনটা মুসাকে দাও।' মুসা ধরলে কিশোর বলল, 'শোনো, কাল সকালে উঠেই চলে আসবে। অটো স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাব। জুনের গাড়ির ট্রাঙ্কটা দেখার জন্যে।'

'জানতাম, একথাই বলবে। ঠিক আছে, আসব।'

পরদিন সকাল ন'টায় রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে হাজির হলো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর তখনও তৈরি হতে পারেনি। রিসিভার তুলে ডায়াল করল থানায়। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে চাইল। তিনি ধরলে জানাল, জুনের ব্রিফকেস খুঁজতে যাচ্ছে।

'ব্রিফকেসের কথা তো নতুন শুনলাম,' চীফ বললেন।

'হ্যাঁ। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় নিশ্চয় পাননি। খোঁজাখুঁজি তো করেছেন। গাড়ির ভেতর থেকে কিছু পড়ে গেল কিনা দেখেছেন।'

'নিশ্চয়,' অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন চীফ।

'গাড়ির ভেতরে খুঁজেছেন?'

'কিশোর, আমার পুলিশে চাকরির বয়েসই তোমার বয়েসের চেয়ে বেশি।

আমি আমার কাজ জানি। যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারাও জানে। রিপোর্ট করেছে, গাড়ির ভেতরটা খালি ছিল।'

'আসলে শিওর হতে চাইছি আমি, কোথাও কিছু বাদ পড়ে গেল কিনা।'

'বাদ পড়েনি। এই একটা কেসে তুমি সুবিধে করতে পারবে না,' হাসলেন চীফ।

'না পারলে,' রহস্যময় কণ্ঠে কিশোর জবাব দিল, 'কোন দিন আর চিকেন ল্যারসেনের মুরগী আপনি খেতে চাইবেন না। পরে সব বলব,' লাইন কেটে দিল সে।

গাড়িতে এসে উঠল কিশোর। দুই সহকারীর সঙ্গে রওনা হলো মিলার অটো রেকেজ ইয়ার্ডে।

বিশাল এলাকা নিয়ে ইয়ার্ড। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একধারে স্তূপ করে রাখা হয়েছে নতুন নষ্ট হওয়া গাড়িগুলো। টুকরো টুকরো হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে যেন। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে গাড়ির নানা জিনিস। কোথাও টায়ারের স্তূপ, কোথাও ফেনডার, কোথাও বা বডির অন্যান্য অংশ। ইয়ার্ডের পেছনে বাঁ দিকে রয়েছে বিশাল এক কমপ্যাক্টর মেশিন আর দুশো ফুটের ক্রেন।

একেবারে গল্পের মত ঘটে গেল ঘটনা। টেলিভিশনের থ্রিলারের গল্পে যে রকম হয়। তিন গোয়েন্দা ইয়ার্ডে ঢুকতেই কাকতালীয় ভাবে জুনের ছোট নীল মাসট্যাংটা তুলে নিল ক্রেন।

'ম্যাশারে নিয়ে গিয়ে ফেলবে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা বানিয়ে ফেলবে!'

'ট্র্যাকের চিহ্নই আর থাকবে না!' দৌড় দিল রবিন। 'কিচ্ছু বের করতে পারব না!'

ক্রেনের দিকে দৌড়াচ্ছে তিনজনে। চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে ক্রেন অপারেটরের। কাছে গিয়ে দেখল ক্রেন চালাচ্ছে পল মিলার। ইয়ার্ডের মালিকের ছেলে। বছরখানেক আগে রকি বীচ হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে।

মোটর বন্ধ করে দিয়ে, অপারেটরের খাঁচার চারপাশে ছড়ানো হলুদ রং করা প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল পল। নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'গাড়িটা জুন মিলারের?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ। কেন?'

'একটু দেখতে চাই।'

'লাভ হবে না। একটা স্পেয়ারও পাবে না। সব গেছে।'

'তবু। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'বেশ, ওদিকটায় যাও, নামিয়ে দিচ্ছি,' পড়ে থাকা অনেকগুলো বাতিল ট্রাকের পাশের খালি জায়গা দেখাল পল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে সেদিকে এগোল কিশোর। পিছে পিছে চলল রবিন আর মুসা।

আবার চালু হলো ক্রেনের ইঞ্জিন। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল কিশোর, এপাশ ওপাশ দুলছে গাড়িটা। তারপর বিরাট একটা চক্র সৃষ্টি করে যেন এগোতে শুরু করল।

'অত ওপর থেকে যদি কোনভাবে মাটিতে খসে পড়ে,' মুসা বলল। 'ভর্তা হয়ে যাবে।'

প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে গাড়িটা। সরে গেল ওরা। কিন্তু গাড়িটা চলল ওদের সঙ্গে, ওপরে ওপরে, যেন অনুসরণ করতে চাইছে। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলছে।

'মজা করছে নাকি?' ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা।

'না, মজা নয়!' আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ওই দেখো!'

ক্রেনের গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখা গেল পলকে। পেট চেপে ধরেছে, বাঁকা হয়ে গেছে ব্যথায়। ক্রেন অপারেটরের বুদে ঢুকে পড়েছে অন্য কেউ, সে-ই চালাচ্ছে। তিন গোয়েন্দার মাথার ওপরে চলে এসেছে গাড়িটা।

'কে চালাচ্ছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

কিন্তু জবাব পেল না। দেবেই বা কে? গোল, চ্যাপ্টা একটা বড় চুম্বকের সাহায্যে তোলা হয় গাড়ি। ইলেকট্রোম্যাগনেট। অফ করে দেয়া হলো সুইচ।

কিন্তু জবাব খোঁজার সময় নেই। গাড়িটা এখন একেবারে মাথার ওপর। আচমকা ছেড়ে দিল ওটাকে ক্রেন। পড়তে আরম্ভ করল তিন হাজার পাউণ্ড ওজনের গাড়িটা।

তেরো

তিন দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বিকট শব্দে মাটিতে পড়ল গাড়ি।

ভাঙা কতগুলো গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। দেখছে, শূন্যে দুলছে ভারি ইলেকট্রোম্যাগনেট, যে চুম্বকটার সাহায্যে গাড়ি তোলা হয়। ওটার এক বাড়ি খেলেই মরে যাবে মানুষ। বোঝাই গেছে, অপারেটরের বুদে যে রয়েছে এখন সে ওরকম কিছু ঘটানোরই চেষ্টায় আছে।

বিশাল চুম্বকটার দুলুনি বন্ধ হলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্রেনের বুদে কে আছে।

'আগেই বোঝা উচিত ছিল,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমাদের মিস্টার এক্স!'

পুরানো গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। দেখল, ক্রেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। গায়ে আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। লাফিয়ে নামল পলের কাছে। তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে তাকে চিৎ করে দিল আবার, যাতে কিছুক্ষণ আর না উঠতে পারে।

'এদিকেই আসছে,' দুই সহকারীকে পিছিয়ে যেতে ইশারা করল মুসা। আবার গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। এমনভাবে থাকার চেষ্টা করল, যাতে

লোকটা দেখতে না পায়।

'জুনের গাড়িটা দেখতেই এসেছে হয়তো,' কিশোর বলল। 'আমাদের মত।'

কানে এল কাচ ভাঙার শব্দ। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এলে আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না মুসা। মুখ বের করে তাকাল। দেখল, দ্বিতীয় মলোটভ ককটেলটা ছুঁড়ছে মিস্টার এক্স। বোতল ভাঙার শব্দই তখন কানে এসেছে।

'সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলছে!' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

'তাহলে এই ব্যাপার,' কিশোর বলল। 'লোকটা চায় না, গাড়িতে যা আছে আমরা দেখি।'

'পেট্রল আছে কিনা কে জানে! তাহলে বোমার মত ফাটবে!'

আগুন ধরে যেতেই দৌড় দিল মিস্টার এক্স। ইয়ার্ডের গেটের কাছে রাখা তার পোরশেতে গিয়ে উঠল। পিছু নিতে চাইল মুসা। হাত ধরে তাকে টেনে আটকাল কিশোর আর রবিন।

'ওকে ধরার দরকার নেই,' রবিন বলল। 'গাড়ির ট্রাঙ্ক দেখতে হবে! যে কাজে এসেছি!'

'কুইক!' তাড়া দিল কিশোর। 'গাড়িটা পুড়ে যাওয়ার আগেই...'

'পুড়বে তো না, ফাটবে!'

গাড়িটার দিকে আরেকবার তাকাল মুসা। তারপর দিল দৌড়। পুরানো জঞ্জালের মধ্যে খুঁজতে আরম্ভ করল। জিনিসটা খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগল না। একটা শাবল। তারপর ছুটল জুনের তোবড়ানো মাসট্যাঙের দিকে। ভেতরের গদিটদি অনেকখানিই পুড়ে গেছে ইতিমধ্যে। পেছনের দিকে এগোচ্ছে আগুন, যেখানে পেট্রল ট্যাংকটা রয়েছে।

শাবল দিয়ে ট্রাঙ্ক খোলার চেষ্টা শুরু করল মুসা। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। একটা চোখ সারাক্ষণ রেখেছে আগুনের ওপর। অবশেষে খুলে গেল ট্রাঙ্ক।

'পেয়েছি!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল চামড়ার ব্রিফকেসটা। হাতে তুলে নেড়ে দেখাল কিশোর আর রবিনকে। 'জলদি ভাগ! ফাটবে এখুনি!' ট্যাংকের কাছে পৌঁছে গেছে আগুন।

কিন্তু নড়ল না কিশোর। হাসছে। বলল, 'গাড়ি ভাঙার আগে পেট্রল বের করে নেয়া হয়, যাতে কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। জ্বলবে গাড়িটা, কিন্তু ফাটবে না।'

'আগে একথা বলোনি কেন?' অভিযোগের সুরে বলল মুসা। 'তাহলে অত তাড়াহুড়া করতাম না...'

'সে জন্যেই বলিনি। ওই তাড়াহুড়াটা না করলে হয়তো সময়মত খুলতে পারতে না ট্রাঙ্কটা। ঠেকায় পড়লেই কেবল মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।'

'তুমি যে একটা কি...!' জ্বলন্ত চোখে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল মুসা।

ফোন করে অ্যামবুলেন্স ডাকা হলো। তারপর পলকে দেখতে চলল তিন গোয়েন্দা, ওর অবস্থা কতটা খারাপ।

'তোমরা গোয়েন্দা, শুনেছি,' পল বলল। 'কিন্তু জানতাম না সন্ত্রাসীদের

বিরুদ্ধেও লাগতে যাও।'

'সব সময় লাগি না,' কৈফিয়তের সুরে বলল কিশোর।

পলের ব্যবস্থা করে চিকেন লারসেনের বাড়ি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ওখানে ওদের অপেক্ষায় আছে জুন আর ফারিহা। লারসেন বাড়ি নেই। ফিরতে দেরি হতে পারে।

সদর দরজায় বেল শুনে খুলেই তিন গোয়েন্দাকে দেখে একসঙ্গে বলে উঠল দু'জনে, 'পেয়েছ?'

নীরবে ব্রিফকেসটা তুলে ধরল কিশোর। কি করে এসেছে, তার প্রমাণ দিতে চাইল যেন।

হাসল জুন। ওদেরকে নিয়ে এল বসার ঘরে।

কাচের কফি টেবিলে ব্রিফকেসটা রাখল কিশোর।

অস্থির হাতে সামনের খোপের চেনটা তুলে ভেতর থেকে মরক্কো লেদারে বাঁধাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা বের করল জুন। কাঁপা হাতে খুলল শুক্রবারের সেই পাতাটা, যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। যেদিনকার ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।

'এই যে,' নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে ওর।

পুরো একটা মিনিট পাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'কিছুই নেই। কেবল আর. অ্যাণ্ড ডি।'

'রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট,' কিশোর বলল। 'ডন বারোজের ডিপার্টমেন্ট, তাই না? ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলে কেন? কি আলোচনা করেছিলে?'

'কাজ শেখার চেষ্টা করছি আমি। সব বিভাগেই কাটিয়েছি একদিন করে। এর বেশি আর কিছু মনে করতে পারছি না।'

'ব্রিফকেসের ভেতরে কি আছে দেখলে হয়তো মনে করতে পারবে,' আশা করল কিশোর।

ভেতর থেকে একটা তিন রিঙের বাইণ্ডার বের করল। প্রায় দু'শো ফটোকপি করা কাগজ রয়েছে তাতে। কয়েক মিনিট কাগজগুলো ওল্টাল, তারপর রেখে দিল টেবিলে। 'চিনতেই পারছি না!' ওগুলো দেখে স্মৃতি ফেরত আনার চেষ্টা করছিল সে, ব্যর্থ হয়েছে। ভীষণ হতাশ হয়েছে।

'আমি দেখি? অসুবিধে আছে?' নোটবুকটার দিকে হাত বাড়াল কিশোর। পয়লা পাতাতেই ডন বারোজের নাম। দ্রুত রিপোর্টটা পড়তে শুরু করল সে। কয়েক মিনিট নীরবে পড়ার পর মুখ তুলল। বলল, 'সেই শুক্রবারে কি ঘটেছিল বোধহয় বুঝতে পারছি। ডন বারোজের লেখা একটা রিপোর্টের কপি এটা। মালটিসরবিটেন নামে খাবারে মেশানোর একটা উপাদান সম্পর্কে। কয়েক বছর আগে জিনিসটা আবিষ্কার করেছিল ডন। বলছে, মালটিসরবিটেন মেশালে খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে যায়, তবে একটা অসুবিধেও করে। এতই সুস্বাদু হয় খাবার, নেশাগ্রস্ত করে ফেলে মানুষকে।'

'ভাল খাবার তো লোভী করবেই মানুষকে,' রবিন বলল। 'তাতে অসুবিধেটা কোথায়?'

'অসুবিধেটা? মালটিসরবিটেনের বেলায় আছে। এফ ডি এ, অর্থাৎ ফেডারেল ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই উপাদানটা পরীক্ষা করেছিল। নতুন যে কোন খাবার আর ড্রাগ পরীক্ষা করে দেখা ওদের দায়িত্ব। ডনকে মালটিসরবিটেন বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেয়নি ওরা। কারণ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, ক্যারসিনোজেন হতে পারে ওই জিনিস।'

'কি জেন?' মুখ বাঁকাল মুসা।

'ক্যারসিনোজেন।' বুঝিয়ে দিল রবিন, 'ক্যানসার হয় ওতে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। বলতে থাকল, 'দুর্ঘটনার দিন শুক্রবারে তুমি ডনের সঙ্গে দেখা করেছ। ওই রিপোর্টের কপি পেয়ে গেছ,' কাগজটায় টোকা দিল সে। 'সে দেয়নি। আমার বিশ্বাস, ওর অফিসে ঢুকে কোনভাবে দেখে ফেলেছিলে কাগজটা। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে রাতের বেলা। কাজেই অনুমান করছি, বিকেলের দিকে পেয়েছ তুমি। পড়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিলে।'

জুনের দিকে তাকাল কিশোর। সবকথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে যেন। বলল, 'এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলে, কাগজটা নিয়েই ছুটে বেরোলে ডনের অফিস থেকে। দেখে ফেলেছিল সে। তাড়া করেছিল তোমাকে। তোমার গাড়িতে গিয়ে উঠলে। নিজের গাড়িতে করে তোমাকে অনুসরণ করল সে। দুর্ঘটনার জায়গায় আরেক সেট চাকার দাগ যে পাওয়া গেছে সেটা ওরই গাড়ির।'

মুসা প্রশ্ন করল, 'ওই একটা রিপোর্ট অতটা উত্তেজিত করবে কেন জুনকে?'

'করবেই তো,' হাসল কিশোর। 'জুন হয়তো বুঝে ফেলেছিল, চিকেন লারসেনের নতুন খাবার ড্রিপিং চিকেনে ওই মালটিসরবিটেন মিশিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডন।'

কথাটা সবাইকে হজম করার সুযোগ দিল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বুঝে ফেলেছিলে, ডন, কিংবা আরোলা, কিংবা তোমার বাবা ইচ্ছে করেই জেনেশুনে ওই বিষ মেশাতে চলেছেন খাবারে। ড্রিপিং চিকেনে। ওই বিষের ক্রিয়া টের পেতে পেতে রোগীর কয়েক বছর লেগে যাবে। কাজেই সহজে ধরা পড়বে না যে মেশাবে। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়মিত খেয়ে যাবে মালটিসরবিটেন, বুঝতেই পারবে না ক্যানসারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে ওরা। যখন বুঝবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। হয়তো তখনও বুঝবে না কিসের কারণে হয়েছে তাদের ওই মরণ ব্যাধি।'

ঠোঁট কাঁপছে জুনের। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'অসম্ভব! আমার বাবা ওরকম পাষণ্ড হতেই পারে না!'

'আমরা এখনও জানি না সেটা। প্রমাণ করতে হবে যে তিনি এতে জড়িত নেই। আর সেটা করায় আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে তোমাকে।'

মনে মনে ইতিমধ্যেই কিছু একটা করার পরিকল্পনা করে ফেলেছে কিশোর, বুঝতে পারল তার দুই সহকারী।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে চাইছ তুমি?'

'জানতে চাই, ড্রিপিং চিকেনে মালটিসরবিটেন মেশানোর ব্যাপারটা জানেন কিনা মিস্টার লারসেন। কি করে জানব, কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

'পারি,' জুন বলল। 'বাবা তার সমস্ত কাজের ফিরিস্তি কাগজে লিখে অফিসের আলমারিতে রেখে দেয়।'

আঙুল মটকাল কিশোর। 'আমিও তাই আশা করেছি। বের করে আনতে পারবে?'

'তালার কম্বিনেশন জানি না।'

'ও। তাঁকে না জানিয়ে কাগজগুলো বের করতে হবে। সন্দেহ করলেই সরিয়ে কিংবা নষ্ট করে ফেলতে পারেন।'

এক মুহূর্ত ভাবল জুন। তারপর হাসল। 'বাবার সেক্রেটারির সাহায্য নিলে কেমন হয়? অনেক কিছুই হয়তো জানে ও। কম্বিনেশন জানলেও অবাক হব না। বসের অনেক গোপন খবরই রাখে তার সেক্রেটারি। এটা নতুন কিছু না।'

'চলো,' তখুনি যেতে চাইল মুসা।

'না,' বাধা দিল জুন। 'আমি একা যাব। তোমাদেরকে দেখলে মুখ খুলবে না। বাবার বিরুদ্ধে একাজ করছি, ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না...'

'হচ্ছে,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল যেন কিশোর। 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর জন্যে কাজটা করছি আমরা। একে অন্যায় বলা যাবে না। কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'এই ঘণ্টা দুয়েক।'

দুই ঘন্টা কেটে গেল। ওদেরকে যা যা করতে বলে গেছে জুন, তাই করল। ওর বাড়িতে বসে ওদের ফ্রিজের খাবার খেল, টিভি দেখল, কথা বলল। বিশ্রাম নিল, কিশোর বাদে। এই কাজটা সে কিছুতেই করতে পারল না। ঢিল দিতে পারল না শরীর।

আরেক ঘণ্টা পেরোল।

অবশেষে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জুন। হাতের কাগজ দেখিয়ে সবার দিকে চেয়ে হাসল।

'পেয়েছি,' ফিসফিস করে জানাল সে। চারপাশে তাকাল, যেন দেখে নিতে চাইছে ওর বাবা শুনে ফেলছেন কিনা। 'আলমারি খুলে সব কাগজ দেখেছি। কোথাও লেখা নেই মালটিসরবিটেনের কথা। দেখলে তো? আমার বাবা খুনী নয়।'

জুনের কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল কিশোর।

'মনে হচ্ছে,' মুসা বলল। 'লোকটাকে আর ধরতেই পারলাম না। কেসের এখানেই ইতি।'

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল জুনের দিকে। 'কেউ যদি খাবারে বিষ না-ই মিশিয়ে থাকে, ঘোরের মধ্যে বললে কেন একথা? ব্রিফকেসটার জন্যেই এত অস্থির হয়ে গিয়েছিলে কেন? আর ডন বারোজের নাম ছাপা এই মালটিসরবিটেনের রিপোর্টই বা তোমার কাছে কেন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল জুন।

'আমরাও জানি না,' কিশোরও মাথা নাড়ল। 'তবে কয়েকটা ব্যাপার জানি। আমাদের সন্দেহের তালিকা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। তোমার বাবাকে বাদ দেয়া যায়। হেনরি অগাসটাসও বাদ, কারণ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার। যোগাযোগও নেই। মালটিসরবিটেনের সঙ্গে তাকে জড়াতে পারছি না কোনভাবে। বাকি থাকল ডন বারোজ। সে সহজেই ওই খাবারে বিষ মেশাতে পারে। তবে সে নির্দোষও হতে পারে। অন্য কেউও করে থাকতে পারে কাজটা। যে লোকটাকে বেশি সন্দেহ করছি, যার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ আমার এখন, যে রিপোর্টটা আমাদের হাতে পড়তে দিতে চায়নি, সে হলো রহস্যময় মিস্টার এক্স। যে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।'

'ওই লোকটাকে,' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'বুঝতে পারছ?'

'আন্দাজ করতে পারছি। ফেলিক্স আরোলা।'

'তাহলে?' ভুরু কোঁচকাল ফারিহা। 'পুলিশকে ফোন করব?'

'না। প্রমাণ দরকার। মিরাকল টেস্টে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে আমাদের। কি গোপন করার চেষ্টা করছে আরোলা, জানতে হবে।'

'কিশোর,' হুঁশিয়ার করল মুসা। 'জায়গাটা একটা দুঃস্বপ্ন! সিকিউরিটি ভীষণ কড়া!'

'বেশ, তাহলে রাতের বেলা যাব। যখন গার্ডেরা সতর্ক থাকবে না। ঘুম থাকবে চোখে।'

'তাহলে আজ রাতেই করতে হবে কাজটা,' জুন বলল। 'বাবার সেক্রেটারি আরেকটা কথা বলেছে আমাকে, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সন্ধ্যায় বিরাট এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ড্রিপিং চিকেনের খবর দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিতে চায় বাবা। বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি! সর্বনাশ!' বলে উঠল ফারিহা।

চিকেন লারসেনের কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি বলেছেনঃ লোকে জানতেও পারবে না কিসে আঘাত করেছে ওদেরকে!

চোদ্দ

বিকেল পাঁচটা। রবিনের গাড়িতে বসে আছে গোয়েন্দারা। লং বীচে মিরাকল টেস্টের অফিস আর গুদাম থেকে কিছু দূরে। জুনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যার যার বাড়ি গিয়েছিল। কালো শার্ট প্যান্ট পরে এসেছে। কিশোরের হাতে কালো চামড়ার একটা হাতব্যাগ। কোলের ওপর রেখেছে। জিনিসটা নতুন দেখছে রবিন আর মুসা।

'আরোলা বেরোলেই আমরা ঢুকব,' ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বলল কিশোর।

'ও আছে কি করে জানলে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আছে,' জবাবটা মুসাই দিয়ে দিল। 'ওর গাড়ি দেখছ না? ওই যে। চিনি।'

'তুমি চিনলে কি করে?' রবিন অবাকই হলো।

'সেদিন চিকেন লারসেনের বাড়িতে পার্টির পর ওকে অনুসরণ করেছিলাম। ওই গাড়িতে করে মিরাকল টেস্টে এসেছিল সে।'

আস্তে আস্তে মিরাকল টেস্টের পার্কিং লট খালি হয়ে যেতে লাগল। ছ'টার সময় বেরোল আরোলার ধূসর রঙের ক্যাডিলাক অ্যালানটে গাড়িটা। চলে গেল লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে।

'চিকেন লারসেনের সাংবাদিক সম্মেলনে গেল হয়তো,' অনুমানে বলল মুসা।

গাড়ি থেকে নামল তিনজনে। প্রায় দৌড়ে চলে এল মিরাকল টেস্টের পার্কিং লটে। ঢোকার মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। পাহারায় রইল। দরজাটা পরীক্ষা করতে গেল মুসা আর কিশোর।

'সিকিউরিটি দেখেছ?' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

দেখছে। তিনজনেই তাকিয়ে রয়েছে ছোট একটা ইলেকট্রনিক প্যানেলের দিকে। আলোকিত একটা কীপ্যাড রয়েছে সেখানে। কাচের দরজার পাশে ক্রোমের দেয়ালের মাঝে। দরজার ওপাশে গার্ডের ঘর। কাউকে চোখে পড়ছে না।

'টহল দিতে গেছে হয়তো,' রবিন বলল। 'এইই সুযোগ। ঢুকে পড়া দরকার।'

কীপ্যাডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিশ্চয় ওর মধ্যে কোন বিশেষ কোড ঢোকাতে হয়। তাহলেই খুলবে। কিন্তু ভুল কোড যদি ঢোকে, কি আচরণ করবে? দারোয়ানকে সতর্ক করার জন্যে সিগন্যাল দিতে আরম্ভ করবে না তো?

কোড না দিলে বোঝা যাবে না। ঝুঁকি নিতেই হবে। চামড়ার ব্যাগটা খুলতে লাগল কিশোর। বলল, 'একটা ইলেকট্রনিক লক কমবিনেশন ডিকোডার নিয়ে এসেছি। কীবোর্ডে লাগিয়ে দিলেই কমবিনেশন পড়ে ফেলতে পারবে। কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না? সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে দেখে বানিয়ে ওঅর্কশপে পরীক্ষা করে দেখেছি। কাজ করেছে। এখানে কি করবে কে জানে!'

স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে দ্রুত কীপ্যাডের কভার প্লেট খুলে ফেলল সে। ডিকোডারের দুটো অ্যালিগেটর ক্লিপ লাগিয়ে দিল দুটো বিশেষ তারের সঙ্গে। উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে ওর বুক। কাজ করবে তো? সুইচ টিপল। বেশ কিছু টিপটিপ শব্দ আর আলোর ঝলকানির পর যন্ত্রটা কতগুলো নম্বর দিল ওকে।

'হয়েছে?' দরজার দিকে পা বাড়াল মুসা। 'চলো, দেখি...'

ওর কাঁধ খামচে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও। কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে!' কালো যন্ত্রটায় হাত বোলাল সে। 'ঠিকমত কাজ করছে না। যে নম্বরটা দিয়েছে ওটা এখানকার কমবিনেশন নয়। ওঅর্কশপে যে রিডিং দিয়েছিল, সেটা।'

'ইলেকট্রনিক এই যন্ত্রপাতি এ জন্যেই দেখতে পারি না আমি,' বিরক্ত হয়ে বলল রবিন। 'কখন যে বিগড়ে যাবে ঠিকঠিকানা নেই!'

'সব যন্ত্রই বিগড়ায়, এগুলোর আর দোষ কি? ইলেকট্রনিকস যতটা সুবিধে করে দিয়েছে তার তুলনায় ছোটখাট এসব গোলমাল কিছুই না। হয়তো কোন ক্যাপাসিটর খারাপ পড়েছে, গেছে বাতিল হয়ে, বদলে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই...'

'না, নেই। ওই যে, গার্ডও চলে আসছে।'

তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা ব্যাগে ভরে শার্টের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল। কিশোর গোবেচারা মুখ করে রইল। তার ডেস্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দারোয়ান, এই সময় গিয়ে বেল বাজাল রবিন।

দরজা সামান্য ফাঁক করে তিনজনেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল দারোয়ান। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

কিশোর বলল, 'আমরা ব্ল্যাক মেসেঞ্জার সার্ভিস থেকে এসেছি।' নিজেদের কালো পোশাকের ব্যাখ্যাও দিয়ে ফেলল এক কথাতেই। 'মিস্টার আরোলার অফিস থেকে কিছু একটা বের করে নিতে হবে আমাদেরকে। তিনি বলেছেন, খুবই নাকি জরুরী।'

'একটা জিনিস নিতে তিনজন দরকার?' দারোয়ানের সন্দেহ গেল না।

'আমি কি জানি?' হাত ওল্টাল কিশোর। 'আসতে বললেন, এসেছি। আমাকে তাঁর প্রয়োজন।'

'ওর গাড়ি নেই,' কিশোরকে দেখাল রবিন। 'তাই আমাকেও আসতে হলো।'

'আর ওরা কেউ অফিসটা চেনে না,' রবিন আর কিশোরের কথা বলল মুসা। 'আমি চিনি। না এসে আর কি করব?'

তাই তো, না এসে কি করবে! অকাট্য যুক্তি! 'আমি তো জানতাম থ্রী স্টুজেসরা মরে ভূত হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল দারোয়ান। তবে আর কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। 'যাও। কি নেবে নিয়ে জলদি বিদেয় হও,' হলের দিকে দেখিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।

দারোয়ানের নির্দেশিত দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সমস্ত পথটায় কার্পেট বিছানো রয়েছে। বাঁয়ের পথ ধরল ওরা। ওদিকেই অফিসটা, বলেছে দারোয়ান। ডান দিকে চলে গেছে আরেকটা পথ। পথের শেষ মাথায় ওয়াল নাট কাঠের তৈরি একটা দরজার সামনে এসে থামল ওরা। দরজায় লেখা রয়েছেঃ একজিকিউটিভ সুট।

বেশ বড় সাজানো গোছানো ঘর আরোলার। দু'ধারে বিশাল জানালা, একেবারে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত। বাতাসে তাজা ফুলের সুবাস, যদিও একটাও ফুল চোখে পড়ছে না কোথাও। ঘরের মাঝখানে রোজউড কাঠের মস্ত টেবিল। তাতে রয়েছে বিল্ট-ইন টেলিফোন আর কম্পিউটার। এককোণে গোছানো রয়েছে নটিলাস কোম্পানির ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি। দেয়ালে ঝোলানো আর তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য স্মারকচিহ্ন আর পুরস্কার। সুগন্ধ বিশারদ সে। অতীতে কাজের জন্য ওগুলো পেয়েছে। নানা রকম ক্যানডির মোড়ক, আর অন্যান্য খাবারের মোড়ক সুন্দর করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে। বোঝা যায়, ওগুলো সব তার নিজের আবিষ্কার।

ওসব জিনিস কোনটাই চমৎকৃত করতে পারল না কিশোরকে, করল কেবল আরোলার ফাইলিং সিসটেম।

'কি খুঁজতে এসেছি আমরা?' টেবিল টেনিস খেলা যায় এতবড় ডেস্কের দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মালটিসরবিটেনের একটা জার হলেই চলবে,' কিশোর বলল। ফাইলিং কেবিনেট খুলতে লাগল সে। 'ড্রিপিং চিকেনে মেশানো হয়েছে, ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, এ রকম যে কোন জিনিস হলেও চলবে। যে যে উপাদান মেশানো, নিশ্চয় লিখে রেখেছে কাগজে,' ফোল্ডারগুলোর পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে।

'এখানেও একটা কম্পিউটারের টার্মিনাল রয়েছে,' বাথরুম থেকে জানাল রবিন। দামী একটা কোলোনের শিশি খুলে শুঁকল। 'বাহ্, চমৎকার গন্ধ!'

'কি চমৎকার?' জানতে চাইল মুসা।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট!'

'কি বললে?' বাথরুমের দরজায় উঁকি দিল রবিন। 'ইদানীং আরও জটিল হয়ে গেছে তোমার কথাবার্তা!'

'সহজ কথাটা বুঝতে না পারলে আমি কি করব? বলছি, ড্রিপিং চিকেনে ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট মেশানো হয়েছে। কাগজপত্রে তা-ই লেখা রয়েছে। জুন আমাকে যেসব কাগজপত্র এনে দিয়েছে ওগুলোতে।'

'মুসাও আজকাল ওরকম করে কথা বলে,' মুখ বাঁকাল রবিন। 'গাড়ির ইঞ্জিনের ব্যাপারে ও যে কি বলে, কিচ্ছু বুঝতে পারি না! এই তো, গত হপ্তায় মেরামত করে দেয়ার সময় কি জানি কি হয়েছিল, বলল!'

ঠেলে ফাইল কেবিনেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর। 'গত দুই বছরের পারচেজ অর্ডার, ইনভয়েস আর ইনভেনটরি লিস্ট ঘাঁটলাম। তাতে মিরাকল টেস্ট কোম্পানি কোন উপাদান কিনেছে বা তৈরি করেছে, এ রকম কথা লেখা নেই। গুদামে গিয়ে খুঁজতে হবে। এখনই!'

কার্পেট বিছানো পথ ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে হলঘরে ফিরে এল ওরা। দারোয়ান বসে বসে ঢুলছে। ওদের সাড়া পেয়ে চমকে জেগে গেল, 'পেয়েছ তোমাদের জিনিস?' জিজ্ঞেস করল সে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। জবাব দেয়ার ভারটা ওর ওপরই ছেড়ে দিতে চায়।

'না,' কিশোর বলল। 'বললেন তো এখানেই আছে, কিন্তু পেলাম না। গুদামঘরের অফিসে বললেন।'

'গুদামঘর? দূর, মাথা খারাপ এগুলোর! এই, ওটাকে কি গুদামের অফিস মনে হয়েছে? তোমাদের কি কমনসেন্স বলেও কিছু নেই!'

'কমন সেন্স আছে আমাদের দলের চার নম্বর লোকটার,' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'কিন্তু সে আজকে আসেনি।'

'যাও। ডানের পথটা ধরে যাও, যেটাতে কার্পেট বিছানো নেই। তিনটে লাল দরজা পেরিয়ে যাবে। তারপরেই পাবে গুদামঘর। যত্তোসব!' ওদের দিকে তাকাল দারোয়ান। 'দরজা দেখতে কেমন সেটা জানো তো?'

ও জানে,' কিশোরকে দেখাল মুসা।

হলঘর থেকে বেরিয়ে কার্পেট ছাড়া পথটা ধরল ওরা। একে একে পেরিয়ে

এল তিনটে লাল রঙ করা দরজা। ঢুকল বিরাট এক ঘরে। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল যেন। একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য কেমিক্যালের ড্রাম।

'লেবেল পড়ে দেখ,' নির্দেশ দিল কিশোর। 'জলদি।'

'কটা বাজে?' ভুরু নাচাল রবিন।

'প্রায় সাতটা।'

'ন'টায় সম্মেলন শুরু হবে, ভুলে গেলে চলবে না। তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের।'

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল তিনজনে। একটু পরেই চিৎকার করে ডাকল রবিন, 'অ্যাই, দেখে যাও!'

ড্রামের সারির ফাঁক দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। কংক্রীটের মেঝেতে মচমচ করছে জুতো, চেষ্টা করেও শব্দ না করে পারছে না ওরা। একগাদা টিন আর কাঠের পিপার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। প্রতিটির গায়ে লেবেল লাগানোঃ ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটস।

'পেয়ে গেলাম, যা খুঁজছিলে,' রবিন বলল কিশোরকে। 'এতে কি প্রমাণ হলো?'

জবাব না দিয়ে লেবেলে লেখা তারিখ দেখল কিশোর। তারপর বলল, 'দেখ, কবে এসেছে?'

পড়ে মুসা বলল, 'দুই মাস আগে।'

'কি ভাবে এল?' কিশোরের প্রশ্ন। 'ভাল করে ইনভয়েসগুলো দেখেছি আমি। দু'মাস তো দূরের কথা, গত দুই বছরেও কেনা হয়নি ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট। এক আউন্সও না।...ছোট টিনও আছে। নিয়ে যাব একটা। ভেতরে আসলে কি আছে দেখা দরকার।'

'দেখার আর দরকার কি?' বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতে পারি।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। দাঁড়িয়ে আছে ফেলিক্স আরোলা।

'এভাবে মুখোমুখি হয়ে যাব, ভাবতে পারিনি,' বলল সে। 'ভেবেছিলাম, তদন্তটা বাদই দিয়ে দেবে তোমরা। ভুল করেছি। শেষে আমার পেছনেই লাগলে।'

পাথর হয়ে গেছে যেন গোয়েন্দারা।

'সরি,' পিস্তলটা আরেকটু সোজা করে ধরল আরোলা। 'খরচের খাতায় তোমাদের নাম লিখে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার।'

পনেরো

পিস্তল উদ্যত রেখেই চট করে হাতঘড়ি দেখল আরোলা। 'আর বেশি সময় নেই। একটু পরেই বেভারলি হিলটনে লারসনের সম্মেলন শুরু হবে,' জ্যাকেটের অন্য পকেটে হাত ঢোকাল সে।

কি করবে এখন লোকটা? ভাবছে কিশোর।

জ্যাকেটের পকেট থেকে হাতটা বের করল আরোলা। মুঠো বন্ধ। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই যা করার করে ফেলব। মরার আগে খানিকটা মার্কেট রিসার্চ করতে চাও?'

'মানে?' তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

মুঠো খুলল আরোলা। মোড়কে মোড়া ক্যানডি। 'খেয়ে দেখবে একটা?'

'না, কিশোর, খেয়ো না!' হুঁশিয়ার করল মুসা, 'বিষ!'

আরোলার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর তার পিস্তলের দিকে, তারপর ক্যানডির দিকে, এবং সবশেষে ঘড়ির দিকে। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও। খেয়ে দেখলে ক্ষতি কি? পুলিশকে জানিয়ে আসেনি। কেউ উদ্ধার করতে আসবে না ওদের।

'তোমার কথার দাম দিই আমি,' আরোলা বলল। 'বুদ্ধিমান ছেলে। অনেক কিছুই বোঝ। সেদিন পার্টিতেই বুঝেছি। তোমাকে মেরে ফেলতে হচ্ছে বলে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে আমার। খেয়ে বলো, কেমন লাগে। বলবে?'

'দিন। কি আর করা? এত করে যখন বলছেন...'

'এই তো। বলেছিলাম না, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। জীবনে যদি একটা কাজ করে যেতে না পারলে, তো জন্মই বৃথা। ওই পচা বিজ্ঞানীগুলোর মত। কেবল আবিষ্কারই করতে পারে, জিনিসের মার্কেট ভ্যালু আর বুঝতে পারে না কোনদিন।'

'মনে হচ্ছে আপনি খুব বোঝেন,' লোকটার কথা সহ্য করতে পারছে না রবিন। 'ওকে এত চাপাচাপি করছেন কেন? আপনি খেয়ে টেস্ট করে নিলেই পারেন...'

'দেখ ছেলে, বেশি ফরফর করবে না!' হঠাৎ রেগে গেল আরোলা। 'তোমার কপাল ভাল যে তোমার বন্ধুর স্বাদ যাচাই করার ক্ষমতা আছে । বাঁচিয়ে রেখেছি সে কারণেই, সকলকে, নইলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে,' নিজেকে শান্ত করার জন্যে জোরে জোরে দু'বার শ্বাস টানল সে। বিড়বিড় করল, 'লাশের গন্ধও আমার ভাল লাগে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মনে হচ্ছে, আরোলার মাথায় গোলমাল আছে। কি জানি, গত কয়েক বছরে হয়তো অনেক মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সে, খাবারে মালটিসরবিটেন মিশিয়ে। আর অপরাধ বোধের কারণেই চাপ পড়েছে মাথায়, গেছে গড়বড় হয়ে।

'দিন, একটা ক্যানডি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'খেয়ে দেখি। তবে এক শর্তে। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল আরোলা। একটা ক্যানডি দিল কিশোরের হাতে।

মুখে ফেলল কিশোর। 'তিনটে স্বাদ। লেবু—আসল লেবুর গন্ধ পাচ্ছি, নকল না। আর রয়েছে ম্যারাং এবং গ্রাহাম ক্র্যাকারের সর। তিনটে মিলিয়ে লেমন ম্যারাং পাই।'

'চমৎকার।'

'এবার আমার পালা,' কিশোর বলল। 'ওই যে ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটস লেখা রয়েছে, ওই টিমগুলোতে আসলে রয়েছে মালটিসরবিটেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'কিসে ব্যবহার করতে এনেছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয় জানেন ওই জিনিস খাবারে মেশানোর অনুমতি দেয়নি এফ ডি এ।'

'আরেকটা প্রশ্নের জবাব চাও তো? তাহলে আরেকটা ক্যানডি খেতে হবে। যে কোন একটা তুলে নাও,' শয়তানী হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল আরোলা।

'খেয়ো না, কিশোর,' আরেকবার বাধা দিল মুসা। 'কায়দা করে খাইয়ে নিচ্ছে।'

কিশোরের ধারণা হলো, ক্যানডিগুলোতে অন্য বিষ না থাকলেও মালটিসরবিটেন থাকতে পারে। দু'একটা ক্যানডি খেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। আর হলেই বা কি? কিছু তো আর করতে পারছে না। বরং যতক্ষণ খেয়ে যাবে ততক্ষণ মারবে না আরোলা। আর ওর কাছ থেকে কথা আদায় করারও সুযোগ মিলবে। আরেকটা ক্যানডি নিয়ে মোড়ক খুলে মুখের ভেতর ছুঁড়ে ফেলল।

'চেরি জেল-ও। সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যানানা ফ্লোটার আর মাখন,' চুষতে চুষতে জানাল কিশোর। 'আপনার জবাব পেয়েছেন। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মালটিসরবিটেনগুলো দিয়ে কি করবেন?'

জবাব দিতে সময় নিল আরোলা। দ্বিধা করছে মনে হলো। অবশেষে বলল, 'বেশ, বলছি। তোমরা তো আর বেঁচে থাকবে না, বেরিয়ে গিয়ে সব বলতেও পারবে না। গোড়া থেকেই বলি, নইলে পরিষ্কার হবে না। বছরখানেক আগে চিকেন লারসেন এসেছিল আমার কাছে। নতুন একটা খাবার তৈরি করতে আমার সাহায্য চাইল। এমন কিছু, যেটার মত সুস্বাদু জিনিস আর কেউ কখনও খায়নি। শুধু খায়নি তা নয়, ভাবতেই পারেনি কেউ, বিশেষ করে হেনরি অগাসটাসের মত লোকে। বলল, লাভের টাকা আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে রাজি আছে। তবে, যে কোন খাবার হলে চলবে না। মুরগীর মাংস দিয়ে তৈরি হতে হবে।'

'সুস্বাদু করে দিতে বলেছেন,' ফোড়ন কাটল রবিন। 'কিন্তু মিস্টার লারসেন নিশ্চয় বিষ মিশিয়ে দিতে বলেননি।'

'তুমি চুপ করো!' ধমকে উঠল আরোলা। 'ডেঁপো ছোকরা!' আবার জোরে জোরে দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করল সে। 'মুরগী দিয়ে খাবার তৈরি করা সহজ। সেটা অনেকেই পারে। কিন্তু লোকে বার বার খেতে চাইবে, অর্থাৎ, নেশা হয়ে যাবে, এ রকম কি উপাদান মেশানো যায়? ভাবতে লাগলাম। ফ্লেভার মিশিয়ে যতভাবে সম্ভব সুস্বাদু করার চেষ্টা করলাম। হলো-ও। কিন্তু লারসেন যা চেয়েছে তা হলো না।'

'তারপর দিলেন মালটিসরবিটেন মিশিয়ে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

তৃতীয় আরেকটা ক্যানডি খেতে বলল আরোলা। ঘড়ি দেখে বলল, 'সময় শেষ হয়ে আসছে।...কি মেশালে যে তেমন সুস্বাদু হবে ভেবেই পেলাম না।

আমার সাধ্যমত…ও-কি, খাচ্ছ না?'

'খাব। পরে। বলুন আগে।'

'কিশোর,' সাবধান করল রবিন। 'খেয়ো না। ড্রিপিং চিকেনে যেমন ক্যারসিনোজেন মিশিয়েছে, ওই ক্যানডিতেও মিশিয়ে থাকতে পারে।'

'মেশালেই বা কি? ও তো এখনই মরবে এমনিতেই,' আরোলা বলল। 'দশ বিশ বছরের মধ্যে টের পাবে না লোকে, ক্ষতি হবে না। অনেক লম্বা সময়। অনেকে অতদিন বাঁচবে না এমনিতেই। যাই হোক, খাবার যে বিষাক্ত, এটা কোনদিনই টের পাবে না লোকে। ভেবে দেখলাম, ক্যান্সার হয়ে মারা গেলে ধরা পড়ারও কোন আশঙ্কা নেই। ওই রোগ তো আজকাল হরদম হচ্ছে। আমার বানানো খাবার খেয়ে যে হয়েছে, সেটা বোঝার সাধ্য ডাক্তারেরও হবে না। তাই ঠিক করলাম, দেব মিশিয়ে। লারসেনও কিছু জানতে পারবে না। কারণ, তৈরি করা অবস্থায় খাবার আমার কাছ থেকে নিতে হবে তাকে, আগেই বলে দিয়েছি। প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেব তার রেস্টুরেন্টে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। আটটা বাজতে দেরি নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। সেই সঙ্গে ফুরিয়ে আসছে ওদের আয়ু।

'আরেকটা প্রশ্ন,' বলল সে। 'আজ রাতে এখানে ফিরে এলেন কেন হঠাৎ করে?'

'দারোয়ানদেরকে ভাল বেতন দিই আমি। তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলে অফিসে ঢোকার পর পরই ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে সে। আমার গাড়িতে ফোন আছে,' কিশোরের হাতের ক্যানডিটার দিকে তাকাল সে। 'খেয়ে ফেল। দেরি করলে আর কোনদিনই খেতে পারবে না। স্বাদটা বলে যাও মরার আগে।'

মোড়ক খুলল কিশোর। এটা অন্য দুটোর চেয়ে আলাদা। ভারিও বেশি। 'মিস্টার এক্স আপনার দলের লোক, তাই না? ওই যে, সারাক্ষণ আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরে থাকে?'

'মিস্টার এক্স?' হেসে উঠল আরোলা। 'নামটা তো ভালই দিয়েছ। অবশ্য তোমার সব কিছুই অন্য রকম। ওর নাম জেনার। আমার পাশের বাড়িতেই থাকে। সেনাবাহিনীতে ছিল, বদ স্বভাবের জন্যে বের করে দিয়েছে। মেজাজও খুব খারাপ। অযথাই লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ওকে দলে নেয়া বিপজ্জনক। তবে তার সাহায্য নিই মাঝে মাঝে। টাকার বিনিময়ে। যে মুহূর্তে শুনলাম জুনের কাছে তোমরা ডিটেকটিভ, লারসেনের পার্টিতে, মনে হলো, ওই লোককে দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে পারি, যাতে আমার ব্যাপারে আর নাক না গলাও। ওকে বললাম। সে প্রথমে টেপ করল তোমাদের টেলিফোন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'এ ভাবেই জেনেছে, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আমরা খাবার কিনতে যাচ্ছি। পিটালুসে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ। কাজের লোক। খুব চালাক। তবে তোমরা ওর চেয়ে বেশি। তোমাদের সঙ্গে চালাকি করে সুবিধে করতে পারেনি,' কিশোরের দিকে পিস্তল নাড়ল আরোলা। 'ক্যানডিটা খাও!'

'খেয়ো না, কিশোর,' মুসা বলল।

শুনল না কিশোর। মুখে পুরে দিয়ে চুষতে লাগল। বলল, 'ক্যারামেল।'

'অত তাড়াহুড়া কোরো না,' আরোলা বলল। 'আরেকটু খাও। ভাল করে বোঝ। তারপর বলো,' হাসছে সে।

আরও কিছুক্ষণ চুষল কিশোর। বলল, 'আরি, তাই তো! বেশ চালাকি করা হয়েছে! ক্যারামেল আপেল। এখন মনে হচ্ছে আপেলের রসই খাচ্ছি।'

'তোমার কথা মনে রাখব আমি,' আরোলা বলল। 'তোমার সম্মানেই এই ক্যানডির নাম দেব মিস্টার এক্স। ওরকম গালভরা একটা নামই খুঁজছিলাম। দিয়ে সাহায্য করলে আমাকে। থ্যাংক ইউ।'

'আপনি একজন ব্রিলিয়ান্ট সাইনটিস্ট, বুদ্ধিমান মার্কেটিং ম্যান,' কিশোর বলল। 'কিন্তু ভয়ঙ্কর খুনী।'

'যা দিনকাল পড়েছে। কাকে যে কখন কি হয়ে যেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। যাই হোক, আসল কথা হলো, তোমাদেরকে এখন শেষ করে দিতে হবে। কষ্ট লাগছে আমার।'

'পিস্তলের সেফটি ক্যাচ তো লক করা,' কিশোর বলল। 'অন করে নিন আগে।'

'তাই নাকি?' ওটার দিকে তাকাল আরোলা।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। সুযোগটা কাজে লাগাল। চোখের পলকে পাশ থেকে এক লাথি ঝেড়ে দিল, কারাতের ভাষায় একে বলে ইওকো-টোবি-গেরি। আরোলার হাতে লাগল। উড়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওর হাতের পিস্তল।

কিশোর আর রবিনও আক্রমণ করে বসল। কিন্তু লোকটার গায়ে বেজায় শক্তি। কিছু কারাতে-টারাতেও জানে মনে হলো। রবিনের হাঁটুতে লাথি মেরে তাকে বসিয়ে দিল। ঝট করে ঘুরে মুসাকে ঠেকানোর চেষ্টা করল। পারল না। আঘাতটা আটকে ফেলে গন্ধ-বিজ্ঞানীর বুকে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল মুসা। নাক কুঁচকে গেল আরোলার। পিছিয়ে গেল।

সময় দিল না মুসা। শূন্যে লাফিয়ে উঠল। মোচড় দিয়ে ওপরে তুলে ফেলেছে ডান পা, একেবারে সোজা। 'আইইআহ্' করে কারাতের বিকট চিৎকার করে প্রচণ্ড লাথি লাগাল আরোলার বুকে, একই জায়গায়, যেখানে ঘুসি মেরেছিল।

পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াল আবার আরোলা। পাগলের মত চারপাশে তাকাচ্ছে। কিশোরের এক সেকেণ্ড আগে পিস্তলটা চোখে পড়ল তার। দৌড় দিল তুলে নেয়ার জন্যে।

ষোলো

ডাইভ দিয়ে পড়ল আরোলা। একই সঙ্গে কিশোরও ঝাঁপ দিল। দু'জনেই হাত বাড়াল পিস্তলটা তোলার জন্যে। আগে ধরল আরোলা। তুলে নিয়ে হাসতে আরম্ভ

করল হা হা করে। তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে ঘুরল।

এতক্ষণে লক্ষ্য করল আরোলা, পিস্তলের দিকেই নজর ছিল তার বেশি, যাদের সঙ্গে লড়াই করছে তারা কি করছে খেয়াল করেনি। করার সময়ও ছিল না অবশ্য। ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটের একটা ভারি পিপা উড়ে এল তার দিকে।

মুসা আর রবিন দু'জনে মিলে তুলে ছুঁড়ে মেরেছে। দড়াম করে আরোলার গায়ে লাগল ওটা, পড়ে গেল সে। মেঝেতে পড়ে ফেটে ভেঙে গেল পিপাটা। ভেতরের শত শত পাউণ্ড মালটিসরবিটেন ছড়িয়ে গেল মেঝেতে, কিছু পড়ল আরোলার ওপরও।

'নিন' শিস দিয়ে উঠল রবিন। 'নিজের ওষুধ নিজেই খানিকটা খেয়ে চাঙা হোন।'

ওর কথা শুনতে পায়নি আরোলা। বেহুঁশ হয়ে গেছে মাথায় বাড়ি খেয়ে। ইলেকট্রিকের এক্সটেনশন কর্ড ছিঁড়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল মুসা আর কিশোর মিলে।

হুঁশ ফিরল আরোলার। গোঁ গোঁ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু না,' কিশোর বলল। 'আমাদেরকে মানসিক অশান্তিতে রেখেছিলেন খানিকক্ষণ। তারপর সামান্য মারপিট হলো। চিত হয়ে গেলেন আপনি। এখন বাঁধা আছেন।'

'পুলিশকে ডাকার সময় নেই এখন,' রবিন বলল। 'পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবে আপনার।'

'পুলিশ?' প্রতিধ্বনি তুলল যেন আরোলা।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করব আমরা। আমাদের পেছনে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগানো, খাবারে অবৈধভাবে বিষাক্ত উপাদান মেশানো, এবং অবশ্যই আমাদেরকে খুন করতে চাওয়ার কথা রিপোর্ট করব। এর যে কোন একটা অভিযোগই আপনাকে জেলে ঢোকানোর জন্যে যথেষ্ট। যাক, সেটা পরে করব,' যেন বক্তৃতা দিচ্ছে, এই ভঙ্গিতে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'এখন তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বেভারলি হিলটন হোটেলে যেতে হবে। বন্ধ করতে হবে সম্মেলনটা। এই, এসো তোমরা।'

আধ ঘণ্টা লাগল। মুসা চালিয়েছে বলেই, রবিন চালালে আরও বেশি লাগত। সে মুসার মত বেপরোয়া চালাতে পারে না। হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে দৌড়ে ঢুকল ওরা। কোথায় কি হচ্ছে নির্দেশ রয়েছে নিচের লবিতে। পড়ে জানা গেল এমপায়ার বলরুমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন চলছে।

প্রথমেই টেলিফোন করে পুলিশ প্রধানকে খবর দিল কিশোর, জানাল ফেলিক্স আরোলার অবস্থা। তারপর ছুট দিল।

বলরুমে ঢুকল না গোয়েন্দারা। দরজার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। সেখানে দেখতে পেল চিকেন লারসেনকে। পরনে হলুদ জগিং স্যুট। বুকের কাছে লাল আর কমলা পালক আঁকা। অবশ্যই মুরগীর। পাশে দাঁড়িয়ে আছে জুন আর ডন বারোজ। রান্নাঘরের প্রতিটি কাউন্টারে ট্রেতে স্তূপ করে রাখা ধূমায়িত ড্রিপিং

চিকেন।

'অ্যাই যে, এসে গেছ,' ভালুকের মত বিশাল থাবা তুলে এগিয়ে এলেন লারসেন। বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন কিশোরের গলা। 'সত্যি কথাটা বলবে। এর জন্যে জীবনে যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে না হয়, কথা বলতে ইচ্ছে না করে আমার, যদি ধ্বংস হয়ে যাই, যাব। তবু, সত্যি কথাটা জানতে হবে।'

'আপাতত এই সম্মেলনের কথা ভুলে যান,' কিশোর বলল। 'মারাত্মক বিষ মেশানো রয়েছে ড্রিপিং চিকেনে। ভয়াবহ ক্যারসিনোজেন ভরে দেয়া হয়েছে। পার্টি ক্যানসেল করুন। বাজারে ছেড়ে থাকলে এখুনি সেগুলো ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন। নইলে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লারসেন। রান্নাঘরের সমস্ত খুটুর-খাটুর বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে চুপ। তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি, 'হাহ হাহ হাহ হা! বলেছিলাম না! ওকে আমি পালকপুত্র করে নেবই! আমাকে কেমন বাঁচিয়ে দিল, দেখলে তো ডন...'

'ডন পালাচ্ছে!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

সবাই ফিরে তাকাল। লাফাতে লাফাতে দরজার দিকে ছুটেছে ডন বারোজ।

প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটা তুলে নিল কিশোর আর মুসা মিলে। লম্বা বড় একটা ট্রে। ড্রিপিং চিকেনে বোঝাই। এক দুলুনি দিয়েই ছুঁড়ে মারল ডনকে সই করে। থ্যাপাত করে তার পিঠে গিয়ে লাগল ট্রেটা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ড্রিপিং চিকেন।

ট্রেটা ছুঁড়েই ডাইভ দিল মুসা। কাঁধ খামচে ধরল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া লোকটার। এক হ্যাঁচকা টানে চিত করে ফেলল মেঝেতে। যেখানে ড্রিপিং চিকেন আর ওগুলোর রস গড়াচ্ছে। মাখামাখি হয়ে গেল ডনের শরীরে।

'ভয়াবহ অবাধ্যতা!' চেঁচিয়ে উঠল ডন, মুসার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। 'এর জন্যে কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত তোমার!'

'কোর্টে তো আপনি যাবেন, বারোজ সাহেব,' হেসে বলল কিশোর। 'ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানোর অপরাধে।'

'যা খুশি করতে পারো আমাকে নিয়ে। টরচার করতে পারো। নাম, র‍্যাংক, সিরিয়াল নাম্বার সব ছিনিয়ে নিতে পারো। কিন্তু মুখ খোলাতে পারবে না,' বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল ডন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

'আপনার মুখ খোলানোর দরকারও নেই। যা বলার আরোলাই বলে দিয়েছে আমাদেরকে। পুলিশ চেপে ধরলে আবারও বলবে। চিকেন লারসেনের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়ার জন্যে যে আপনি ওকে টাকা খাইয়েছেন, সে কথাও বলবে।'

'মিথ্যুক! বিশ্বাসঘাতক!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ডন। 'আমি নাকি! সে-ই তো আমাকে টাকা দিল!'

হাসি বাড়ল কিশোরের। 'তাই নাকি? তাহলে আমি ভুল বলেছি। মানে, ভুল আন্দাজ করেছি।'

'বলে কি?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লারসেনের। বিশ্বাস করতে পারছেন

না। 'অ্যাই, ভাল চাইলে স্বীকার করো সব কথা!' ডনকে আদেশ দিলেন তিনি।

'জেনারেল,' ডন বলল। 'আপনার ড্রিপিং চিকেনে এমন এক উপাদান মেশানো আছে, কয়েক বছর আগে যা বিষাক্ত বলে ঘোষণা করে দিয়েছে এফ ডি এ। কেমন লাগছে শুনতে?'

'তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ!' গর্জে উঠলেন লারসেন।

'করবই তো। আপনি তো আর আমাকে দশ লাখ ডলার দেননি,' ডনও জবাব দিল সমান তেজে। 'কিন্তু ফেলিক্স আরোলা দিয়েছে।'

'আর সেই টাকা খেয়ে আপনি খাবারে বিষ মিশিয়েছেন,' কিশোর যোগ করল।

'দশ লাখ অনেক টাকা। বিশ্বাসী সৈনিককেও বেঈমান বানিয়ে দেয়। আসলে, এসব করতে না এসে অনেক আগেই মারসেনারিতে যোগ দেয়া উচিত ছিল আমার।'

আর সহ্য করতে পারলেন না লারসেন। ছুটে গেলেন ডনের কাছে। টান দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন পকেটে লাগানো মেডেলগুলো, যেগুলো তিনি দিয়েছিলেন কাজের পুরস্কার হিসেবে। 'তোমার ঘাড়টা মুরগীর ঘাড়ের মত মুচড়ে ভাঙতে পারলে এখন আমি খুশি হতাম!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

এগিয়ে এল কিশোর। 'আর একটা প্রশ্ন। সে রাতে জুনকে আপনিই তাড়া করেছিলেন, তাই না?'

'করেছিলাম,' স্বীকার করল ডন।

'কেন করেছিলেন?' বাবার হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে জুন। নইলে যেন পড়ে যাবে।

'রিপোর্টটা ছিল আমার ডেস্কের ওপর। ড্রিপিং চিকেনে মেশানোর উপাদানের লিস্ট সহ। অফিস ছুটি হওয়ার পরই সেদিন থেকে গিয়েছিলে তুমি। আমার ঘরে ঢুকে টেবিলে দেখে ফেলেছিলে কাগজগুলো। চেঁচামেচি শুরু করেছিলে। কাগজগুলোতে টপ সিক্রেট লেখা ছিল। অন্যায় ভাবে অনুমতি না নিয়ে পড়ার অপরাধে গুলি করে মারা উচিত ছিল তোমাকে। এ তো রীতিমত গুপ্তচরগিরি।'

'রিপোর্টটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিল জুন,' কিশোর বলল। 'আর আপনি ওকে তাড়া করলেন?'

'করলাম। তবে ওর ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না,' জুনের দিকে তাকাল ডন। 'বৃষ্টির মধ্যে তোমার গাড়িটা ঢাল বেয়ে পিছলে পড়ে গেল। ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। আমার র‍্যাংকের কসম খেয়ে বলছি।'

'ওকে সাহায্য করলে না কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন লারসেন।

'থেমেছিলাম...সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সবার আগে আমার আইডেনটিটি। ওটা তো বাঁচাতে হবে। কাজেই নিজে কিছু না করে পুলিশকে ফোন করলাম। দুর্ঘটনার পুরো বিবরণ জানালাম। নামটা অবশ্যই গোপন রেখে।'

'বাবা,' হাঁপাচ্ছে জুন। 'এখন আমার মনে পড়ছে। অ্যাক্সিডেন্ট...ভয়ঙ্কর...!' কাঁদতে শুরু করল সে। সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে একহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন

লারসেন।

'একটা সময় তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম,' কিশোর বলল। 'এ সবের পেছনে হেনরি অগাসটাসের হাত রয়েছে। তাকে অনুসরণ করে আপনার মুরগীর খামারতক চলে গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে তাকে বলতে শুনলাম, খামারটা সে কিনে নেবে, মুরগীর খাবার বদলে দেবে।'

'ওই দুষ্ট মুরগীর ছানাটা কিচ্ছু বোঝে না। কোনটা চিকেন ফিড আর কোনটা চিকেন স্যালাড বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার। নিজের খামারের মুরগীদের খাবার কিছুদিন পর পরই বদলাতে থাকে। কতটা ক্ষতি যে করে, বুঝতেই পারে না,' লারসেন বললেন। 'বাজারে গুজব ছড়ায়, আমার ফার্ম সে কিনে নেবে। এসব বলে বলে বোঝাতে চায়, আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। ও ভাল করেই জানে, খাবার বানিয়ে আমার সঙ্গে পারবে না। আর আমার ব্যবসা কিনে নেয়ার মত অত টাকাও তার নেই। শুধু শুধু শয়তানী করা আরকি।'

'কিশোর,' জুন বলল। 'এখন তো বুঝতে পারলে, আমার বাবা নির্দোষ। বলো?'

'হ্যাঁ,' অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। লারসেনকে সন্দেহ করেছিল, এবং সে কথা বলেছিল বলে। 'একটা কথা বলবেন? সেদিন স্টুডিওতে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, ড্রিপিং চিকেন কামড়ে নিয়েও সেটা বার বার ফেলে দিচ্ছিলেন কেন? আমি ভেবেছি, বিষ মেশানো আছে সেটা বুঝতে পেরেই আপনি খাচ্ছেন না।'

'খাবারের বিজ্ঞাপনের শুটিঙে সবাই ওরকম করে,' লারসেন বললেন। 'ধর তিরিশ বার তোলা হলো এক ছবি। তিরিশবারই যদি তুমি এক কামড় করে খাও, তাহলে তো গলা পর্যন্ত উঠে আসবে খাবার। একতিরিশ নম্বর কামড়টা বসাতেই ইচ্ছে করবে না আর।'

বাবার দিকে ফিরল জুন। 'বাবা, ওদিকে তো লোক বসে আছে। একশোজন সাংবাদিক নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে ড্রিপিং চিকেনের আশায়। কি করা যায়?'

বুকের কাছে আঁকা পালকে হাত বোলালেন লারসেন। উপায় খুঁজছেন মনে মনে। হাসলেন। 'ব্যবস্থা একটা করেই ফেলব।

ছুটে গেলেন তিনি বলরুমে। দাঁড়ালেন গিয়ে স্পটলাইটের নিচে মাইক্রোফোনের সামনে। 'গুড ইভনিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান,' বলতে লাগলেন তিনি। 'আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, আজ রাতে কেন আপনাদেরকে দাওয়াত করে এনেছি আমি। আপনারা জানেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন আমি দ্রুত টাকা কামানোর তালে থাকি, আর খবরের হেডলাইন হতে চাই। হাহ হাহ হা!'

তাঁর হাসিতে যোগ দিল পুরো কক্ষ। চিকেন লারসেনের স্বভাব আর কথাবার্তার ধরন জানা আছে তাদের। কেউ কিছু মনে করল না।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজকে আপনাদের দাওয়াত করেছি আমার বিখ্যাত ফ্রাইড চিকেন খাওয়ানোর জন্যে। আর আমি যে ধোঁকা দিইনি, সেটা প্রমাণ করার

জন্যেই কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে...' পরের শব্দটা বলতে সময় নিলেন তিনি, ভাবতে হয়েছে বোধহয়, 'পিজা! ঠিক। পিজা! আর শুনে নিশ্চয় আমার মতই আপনারাও অবাক হয়েছেন। কি খাওয়াতে এনে কি খাওয়াচ্ছি ভেবে।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লারসেন। 'তবে ভদ্রমহোদয়গণ, নতুন কিছুর ঘোষণা দিতে পারব বলে গর্ব হচ্ছে আমার। আজ রাতে আমি ঘোষণা করছি চিকেন লারসেন সিটি স্লিকার অ্যাওয়ার্ড। প্রতি বছরই কোন না কোন পুরস্কার ঘোষণা করি, জানা আছে আপনাদের। এবারও করছি। আমাদের আজকের বিজেতারা হলো কিশোর পাশা, মুসা আমান, আর রবিন মিলফোর্ড। রকি বীচের অনেকেই চেনেন তাদের, অন্তত নাম শুনে থাকবেন। ওরা তিন গোয়েন্দা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওদের সম্মানেই আজকের আমার এই পার্টির আয়োজন। কেন পুরস্কারটা দিলাম ওদের, তা নাহয় গোপনই থাক। আড়ালে আড়ালে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছে ওরা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওদের প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, সেই মানুষদেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, যদিও ওরা জানেই না কেন থাকতে হবে।' ঘুরে তাকালেন তিনি। দরজার কাছে দাঁড়ানো বিস্মিত তিন গোয়েন্দাকে হাত নেড়ে ডাকলেন।

এক এক করে মঞ্চে উঠে এল কিশোর, মুসা, রবিন। স্পটলাইটের নিচে এসে দাঁড়াল। আলোর নিচে থাকার জন্যে গাদাগাদি করে দাঁড়াতে হলো ওদের, কারণ বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছেন চিকেন লারসেন।

বার বার হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে। অনেকগুলো ফ্রী কুপন বিতরণ করলেন, যাতে বিনে পয়সায় গিয়ে লারসেন রেস্টুরেন্টে খেতে পারে। টেলিভিশন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, হাত নাড়লেন।

'শোন,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি, 'বিরাট বিজ্ঞাপন হলো। কয়েক মাস ধরে চলবে এটা টিভিতে।'

'আপনি খুশি থাকলেই আমরা খুশি,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'হ্যাঁ, আমরা ধন্য,' বিড়বিড় করল রবিন।

'ঠিক,' বলল মুসা।

'অমন পেঁচার মত মুখ করে রেখেছ কেন?' লারসেন বললেন। 'প্রতিদিন আমার সঙ্গে তোমাদেরকেও দেখানো হবে টিভিতে। লোকে চিনে ফেলবে। ভাল হলো না?'

'না,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'হলো না। চেনা হয়ে গেলে গোয়েন্দাগিরিতে খুব অসুবিধে হয়। সুবিধেও হয় অবশ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তবে সেটা কম। এনিওয়ে, মেনি মেনি থ্যাংকস! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

ঃ শেষ ঃ

ওয়ার্নিং বেল

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৯৩

'এটা একটা পাজল হলো?' ঠোঁট বাঁকাল কিশোর পাশা। 'দশ বছরের ছেলেও ধাঁ হাতে সেরে দিতে পারে!'

কিন্তু মুসার তা মনে হলো না। তার বয়েস দশ বছরের অনেক বেশি। বা হাত তো দূরের কথা ডান হাতেও সে পারবে না। ড্যাগউড'স ওয়াইফ অর্থাৎ ড্যাগউডের স্ত্রীর মানেই তো করতে পারছে না, যদিও ড্যাগউড নামটা পরিচিত লাগছে ওর কাছে।

ডেস্কে পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসেছে রবিন। পেন্সিল আর ক্রসওয়ার্ড পাজলের একটা কপি নিয়ে ব্যস্ত। মুসার যতটা লাগছে তার কাছে ততটা কঠিন মনে না হলেও একেবারে সহজও লাগছে না।

হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিনজনে। হাতে কেস নেই। আকাশ খারাপ বলে বেরোতেও পারছে না। নইলে সাঁতার কাটতে যাওয়া যেত। তিন দিন ধরেই আবহাওয়ার ঘোষণা দিয়ে চলেছে টিভিঃ আকাশ মেঘলা থাকবে, যখন-তখন বৃষ্টি নামতে পারে, হালকা ঝড় হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

কিশোর বহুবার দেখেছে, বৃষ্টির সময় যখন ঘরে আটকে থাকে, তখন কেবল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, আর যেই সে বেরোল অমনি ঝুপঝুপ করে নামে।

'এটা কোন ব্যাপারই না,' বলে তার সামনে রাখা পুস্তিকাটা টেনে নিল। ধাঁধার আরেকটা কপি। পেছনে নির্দেশনা লেখা রয়েছে। সেটাই পড়ল, 'হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্যে এই ধাঁধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাদের বয়েস চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে। প্রবেশ মূল্য লাগবে না।' মুখ তুলে মুসার দিকে তাকাল সে। 'পেলে কোথায় এটা?'

'সুপারমার্কেটে বিলি করছিল। অনেকটা জোর করেই তিনটে কপি গছিয়ে দিল আমার হাতে। যেন জানতই, আমরা তিনজন।'

'তাই নাকি! ইনটারেসটিং!' আবার পড়তে লাগল কিশোর, 'পুরস্কার; উত্তর মেকসিকোর এক র‍্যাঞ্চে দুই হপ্তার চমৎকার একটা ছুটি কাটানো। প্রধান প্রধান আকর্ষণের মধ্যে থাকবে ঘোড়ায় চড়া, লেকে মাছ ধরা, ক্যাম্পিং, মুখরোচক মেকসিকান খাবার…'

'খাইছে, আর পড়ো না, এখনই জিভে পানি এসে যাচ্ছে! এই কিশোর, তোমার জন্যে তো ওটা কিছু না। করে ফেল না সমাধান। আমি শিওর ফার্স্ট প্রাইজটা তুমিই পাবে।'

ভুরু নাচাল রবিন। 'ও পারলে তো ও যাবে। আমরা যাব কি করে?'

'ও সমাধান করলেই আমরাও দেখে দেখে বসিয়ে নেব। হয়ে যাবে।'

'কি জানি!' হাত ওল্টাল রবিন। 'সবাইকে যেতে দিলে হয়। আমার বিশ্বাস, অনেকেই পারবে।'

'তোমার বিশ্বাস ভুল...'

হাত তুলে বাধা দিল কিশোর, 'খালি তর্ক!'

ট্রেলারের ছাতে বড় বড় ফোঁটা পড়ার আওয়াজ হলো।

মুখ বাঁকিয়ে মুসা বলল, 'মেকসিকোতে নিশ্চয় এরকম পচা আবহাওয়া নয়।'

পুস্তিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মুসার কথা কিংবা বৃষ্টির শব্দ ওর কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। পড়ল, 'লিখে জবাব দিলে চলবে না। টেপে রেকর্ড করে দিতে হবে। প্রথমে...' থেমে গেল সে। দ্রুত চোখ বোলাল পাতার বাকি অংশটায়। 'তাজ্জব ব্যাপার!'

'কি?' জানতে চাইল রবিন, 'এতে আবার অবাকের কি দেখলে?'

'পুস্তিকা ছাপাতে পয়সা লাগে,' আনমনে বলল কিশোর, যেন নিজেকেই বলছে। 'আর মেকসিকোতে ছুটি কাটাতে যেতেও পয়সা লাগে। এরকম একটা প্রতিযোগিতার জন্যে কার এত টাকা খরচ করার ইচ্ছে হলো?'

'কোন ধরনের বিজ্ঞাপন হবে হয়তো,' রবিন অনুমান করল। গানের কোম্পানিতে কাজ করে করে ব্যবসায়িক দিকটাই এখন বেশি নজরে পড়ে তার। 'আসলে ওরা চায় যাতে ধাঁধার জবাব দেয়ার জন্যে তুমি একটা টেপরেকর্ডার কিনতে বাধ্য হও। আর একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কি জানি। তাহলে কোন্ স্টোর হতে কিনতে হবে সেটা বলল না কেন? কোন্ কোম্পানির জিনিস কিনতে হবে তা-ও বলেনি।'

'সুপারমার্কেটে লিফলেট বিলি করছিল যখন,' মুসা বলল, 'হয়তো ওখানকারই কোন দোকানের হবে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কোন কিছুই ভাল করে দেখ না তুমি। সুপারমার্কেটে ইলেকট্রনিকের দোকান কোথায়?'

আবার পুস্তিকাটার দিকে তাকাল সে। বেড়াতে তার খারাপ লাগে না, তবে তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ রহস্যের প্রতি। ধাঁধা পেলে তার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কেবলই খচখচ করতে থাকল মনে, কে এত টাকা খরচ করছে? কেন?

'অনেক লিফলেট হয়তো বিলি করেছে,' কিশোর বলল। 'আর জবাব এতই সহজ অনেকেই সমাধান করে ফেলতে পারবে। সুতরাং অনেকেই মেকসিকো যাওয়ার সুযোগও পাবে। অন্তত আমরা তিনজন তো পাবই।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল রবিন। 'তার মানে তুমি এর জবাব দিচ্ছ!'

'কেন নয়?' ভ্রূকুটি করল কিশোর। ড্রয়ার থেকে একটা টেপরেকর্ডার বের করল। একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট বের করে তাতে ঢোকাল। তারপর রেকর্ড করার বোতামটা টিপে দিয়ে বলতে শুরু করল সমাধান।

ঘণ্টাখানেক পর তিনটে ক্যাসেটে তিনজনের শুদ্ধ সমাধান রেকর্ড করে নিয়ে তিনটে খামে ভরে সান্তা মনিকার ঠিকানা লিখল, যে ঠিকানায় জবাব পাঠাতে বলা হয়েছে পুস্তিকায়। এক কোণে নিজেদের নাম-ঠিকানাও লিখল।

ট্রেলারের ছাতে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে।
'জলদি চলো,' তাগাদা দিল রবিন। 'পোস্ট করে দিয়ে আসি, আবার বৃষ্টি নামার আগেই।'

দুই

পরদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার দেখা দিল ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাভাবিক সূর্য। পরের তিনটে হপ্তা যার যার কাজে ব্যস্ত রইল তিন গোয়েন্দা।

রবিন তার চাকরিতে বাড়তি কাজ করল। দিনে বারো ঘণ্টা করে খাটতে হলো তাকে।

মুসা বাড়ির কাজ করল কিছু কিছু। তবে বেশির ভাগ সময়ই সাঁতার কাটল আর ফারিহার সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াল। সেই সাথে চলল কারাতের প্র্যাকটিস।

আর কিশোর রইল স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত। দিনে দশ-বারো ঘণ্টা খাটুনি।

একদিন বিকেলে ওয়ার্কশপে একটা নতুন ধরনের সিকিউরিটি ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে সে, একটা তালা, ভয়েস অপারেটেড, সাঙ্কেতিক কথা বললে খুলবে। মুসাও আছে ইয়ার্ডে। ওয়ার্কশপের বাইরে ওর গাড়ি মেরামত করছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'কুকুর হইতে সাবধান!'

চমকে গেল মুসা। 'কি বললে?'

'না, কিছু না। বললাম, কুকুর হইতে সাবধান।'

তালা খোলার কোডওয়ার্ড এটা। কিন্তু মুসা বুঝতে পারল না। 'কি যে বলো না বলো! এখানে কুকুর দেখলে কোথায়?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, এই সময় টেলিফোন বাজল। ফিরেও তাকাল না। জানে, রবিন রয়েছে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে। আরেকটা এক্সটেনশন সেট রয়েছে ওখানে। রক কনসার্টের জন্যে লিফলেট তৈরি করছে রবিন। হতে পারে তার কোন বান্ধবী ফোন করেছে, কিংবা পরিচিত অন্য কেউ।

কয়েকবার বেজেই থেমে গেল রিঙ। মুসা আবার কাজে মন দিল।

খানিক পরেই বেরিয়ে এল রবিন। 'কিশোর, মেরিচাচী ফোন করেছেন।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়?' কিছুটা অবাকই হলো কিশোর। আবার কাজ নয় তো? ইদানীং মেরিচাচীও কিশোরের বিশেষ ব্যবস্থায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছেন। বুঝে গেছেন, অহেতুক অফিস থেকে বেরিয়ে কষ্ট করে হেঁটে না এসে ফোন করলেই হয়ে যায়। হেঁটে আসার আরেকটা কারণ অবশ্য ছিল, পয়সা বাঁচানো। বকেটকে ঠিক করেছে কিশোর। 'আবার কোন কাজ দেবে নাকি?'

'না, কে জানি এসেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কে?'

'মিস্টার ডজ,' হাসল রবিন। 'ওই ধাঁধা প্রতিযোগিতা যেটায় দিয়েছিলে তার ব্যাপারে কিছু বলবে।'

'তাই?' কৌতূহলী হলো গোয়েন্দাপ্রধান। প্রতিযোগিতার কথা ভোলেনি। তবে কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল, ও ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেনি আর। এখন সুযোগ এসেছে। হয়তো জানতে পারবে এত টাকা খরচ করে মেকসিকোতে পাঠাতে কার এমন দায় পড়েছে।

ওরা ঠিক করল, তিনজনেই যাবে মিস্টার ডজের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, এই সময় বারান্দায় বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ। লম্বা, ছিপছিপে। পরনে জিনস, মাথায় একটা দামি স্টেটসন হ্যাট সামান্য কাত করে বসানো।

তিন গোয়েন্দাকে এগোতে দেখে হাত তুলে নাড়লেন। 'হাই, আমি ডজ মরিস।' ওরা কাছে গেলে একে একে তাকালেন সবার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'কার কি নাম? না না, রাখ, দেখি আমিই আন্দাজ করতে পারি কিনা?' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'দেখি, কণ্ঠস্বর শোনাও তো তোমার?'

'আমি মেকসিকো যাব!' বলল মুসা। কি জানি কেন ডজকে পছন্দ করতে পারছে না। 'পিজা খাব!'

রবিনের দিকে তাকালেন ডজ। 'তোমার?'

'আমার যেতে বড়ই অসুবিধে। অফিসে অনেক কাজ।'

মাথা ঝাঁকালেন ডজ। জোর করেই যেন হাসলেন। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে।

কিশোরও তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। লোকটার ব্যাপারে তার প্রথম ধারণাঃ একটু যেন অস্বাভাবিক। হাসি, ভাবভঙ্গি সবই কেমন যেন মেকি মেকি।

'এবার তোমার গলা শোনাও?' কিশোরকে বললেন ডজ।

'মেকসিকো যেতে চাই,' কিশোর বলল!

চকচক করে উঠল ডজের চোখ। উত্তেজনা ফুটল চেহারায়। এগিয়ে এসে হাত মেলালেন কিশোরের সঙ্গে।

ডজ বললেন, 'ধাঁধা প্রতিযোগিতায় তুমিই জিতেছ। আমার র‍্যাঞ্চেও যেতে পারবে তুমি।'

কিশোর ভাবছে মেকসিকান র‍্যাঞ্চে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে একথাটা সহজে বুঝতে দেয়া চলবে না লোকটাকে। তার আগে কিছু প্রশ্নের জবাব জানা দরকার। বলল সেকথা।

'কি জানতে চাও? বলে ফেল।'

'আর ক'জন জিতেছে এই পুরস্কার?'

'শুধু তুমি। একলা।'

'তারমানে শুধু আমিই ঠিক জবাব দিয়েছি?'

দ্বিধা করলেন ডজ। 'হ্যাঁ।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বুঝতে পারছে মিথ্যে কথা বলছেন ডজ। ওর মত একই জবাব পাঠিয়েছে মুসা আর রবিন। তাহলে শুধু তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করছেন কেন তিনি?

'টাকা আসছে কোত্থেকে?' জানতে চাইল সে। 'এসবের খরচ দেবে কে?'

'আমি!'

'কেন?'

'বিজ্ঞাপনের জন্যে। আমার র‍্যাঞ্চের বিজ্ঞাপন।' হ্যাটটা খুলে নিয়ে আবার মাথায় পরলেন ডজ। আত্মবিশ্বাসে ভরা কণ্ঠ। 'আমার জায়গাটাকে আমি একটা সামার ক্যাম্প বানাতে চাই, যাতে তোমাদের মত সৌখিন টুরিস্টরা গিয়ে বাস করতে পারে। আর এই প্রতিযোগিতাটা সম্পর্কে সানডে পেপারে ভাল একটা আর্টিকেল ছাপতে চাই।'

এতক্ষণে বিশ্বাস করার মত একটা যুক্তি শুনল কিশোর। তবে পুরোপুরি নয়।

আরেকটা প্রশ্ন করতে যাবে, এই সময় নীল রঙের একটা শেভ্রলে গাড়ি দেখল ইয়ার্ডের গেটে। কিশোর মনে করল ঢুকবে, কিন্তু ঢুকল না ওটা। মুহূর্তের জন্যে গতি কমিয়েই আবার বাড়িয়ে চলে গেল। উইণ্ডশীল্ডে রোদ পড়েছিল বলে ড্রাইভারকে ভালমত দেখতে পায়নি সে। মনে হলো, একজন মহিলা। সোনালি চুল, চোখে কালো কাচের চশমা। গত দশ-পনেরো দিনে ওই গাড়িটাকে আরও কয়েকবার দেখেছে সে।

আবার ডজের দিকে ফিরল সে। 'ঠিক আছে, আপনার পুরস্কার আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু একটা কথা। আমার এই দুই বন্ধুকে সাথে নিতে পারব?'

ভ্রূকুটি করলেন ডজ। 'তার মানে ওদের খরচও আমাকে দিতে বলছ?'

'বলছি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর।

মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে কানা মোচড়াতে শুরু করলেন ডজ। পায়ের ওপর শরীরের ভার বদল করলেন। তাকিয়ে রয়েছেন জুতোর দিকে। তারপর মুখ তুলে হাসলেন। 'বেশ, যাবে ওরাও।'

খটকা লাগল কিশোরের। এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক! যেন তৈরি হয়েই এসেছেন, কিশোরকে নিতে হলে তার দুই সহকারীকেও নিতে হবে। মুসার কথা মনে পড়লঃ অনেকটা জোর করেই তিনটে কপি গছিয়ে দিল আমার হাতে! ব্যাপার কি!

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ম্যাপ দিলেন ওদেরকে ডজ। তাঁর র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি শহর লারেডোতে কি করে যেতে হবে বলে দিলেন। ছ'শো ডলার কিশোরের হাতে দিলেন, ওদের রাহা খরচের জন্যে। নিজের ফোন নম্বর দিলেন যাতে সীমান্ত পার হয়েই তাঁকে ফোন করে জানাতে পারে। ওদেরকে তখন লারেডো থেকে তুলে নিতে পারবেন।

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন ডজ। মেকসিকোর নম্বর প্লেট লাগানো। গাড়িটা চেনা চেনা লাগল মুসার। আগেও যেন কয়েকবার দেখেছে। কোথায়? মনে পড়ে গেল। সুপার-মার্কেটে একবার। আর একবার দেখেছে ইয়ার্ডের গেটে। সেকথা বলল কিশোরকে।

পরদিন সকালে অন্যান্য দিনের মতই ইয়ার্ডের ডাকবাক্স খুলল কিশোর। চিঠিপত্র কি এসেছে বের করতে গিয়ে দেখল একটা ম্যানিলা খামও রয়েছে। ভেতরে শক্ত চারকোণা একটা জিনিস। ঠিকানায় তার নাম লেখা। ডাক টিকেট নেই। তার

মানে ডাকে আসেনি খামটা, কেউ এসে ঢুকিয়ে রেখে গেছে।

হেডকোয়ার্টারে এনে খামটা খুলল সে। একটা ক্যাসেট। আর কিছু নেই। লেবেলে এমন কিছুই লেখা নেই যা দিয়ে বোঝা যায় কি রেকর্ড করা রয়েছে টেপে।

একটা টেপ রেকর্ডারে ভরে বোতাম টিপল সে। নীরবে ঘুরতে লাগল টেপ। অনেক পরে কথা বলে উঠল একটা শান্ত কণ্ঠঃ মেকসিকোতে এসো না, প্লীজ! মারাত্মক বিপদে পড়বে তাহলে! ক্যালিফোর্নিয়াতেই থাকো…'

হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল কণ্ঠটা।

পুরো টেপটা চালিয়ে দেখল কিশোর। আর কোন কথা নেই।

চেয়ারে হেলান দিল সে। মেসেজটা ভাবনায় ফেলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তবে আরেকটা ব্যাপার খচখচ করছে ওর মনে। কণ্ঠস্বর চেনা চেনা লাগল। আগে শুনেছে। কোথায়, মনে করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরে মুসা এসে হাজির। ওকে টেপটার কথা বলল কিশোর। আবার চালিয়ে দিল ওটা।

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসতে লাগল মুসা। 'কেউ মজা করেছে তোমার সঙ্গে। রসিকতা।'

'রসিকতা?'

'হ্যাঁ। কেন, নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারছ না?'

'নিজের কণ্ঠস্বর?' অবাক হলো কিশোর।

'হ্যাঁ, অবিকল তোমার নিজের কণ্ঠ। নকল করেছে কেউ। তুমি যেভাবে অন্যেরটা নকল করো। এ এক মস্ত রসিকতা।'

'আমার কণ্ঠ!'

'হ্যাঁ। ইচ্ছে হলে বাজি ধরতে পারো। আমার গাড়িটা ধরতে রাজি আছি আমি।'

তিন

জানালার কাছে বসেছে কিশোর। পুরানো বাসটা যেন গড়াতে গড়াতে চলেছে মেকসিকোর ভেতর দিয়ে। বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

প্রথমে ভেবেছিল, মুসার গাড়িতে করেই আসবে। কিন্তু পরে বাদ দিতে হলো ইচ্ছেটা, যখন শুনল মেকসিকোতে পেট্রল পাওয়া কঠিন।

নতুন একটা টী-শার্ট পরেছে সে। তাতে বড় বড় করে স্প্যানিশে লেখা রয়েছেঃ হ্যালো, আয়্যাম ফ্রেণ্ডলি। সে আশা করছে এতে লোকে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে, স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলবে, যে ভাষাটা মোটামুটি বুঝতে পারে সে। বলতেও পারে কিছু কিছু।

শক্ত প্লাস্টিকের সীট। শরীর বাঁকিয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল সে। অন্য দু'জন কি করছে দেখার জন্যে। মেকসিকোর ইতিহাসের ওপর একটা বই পড়ছে রবিন। ওর পাশে বসে আছে অল্প বয়েসী একটা সুন্দরী মেকসিকান মেয়ে। বার বার রবিনের

দিকে তাকাচ্ছে। একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে মনে হয়। সে চাইছে রবিন পড়া থামিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলুক।

দুটো সীটের মাঝখানে ফাঁক খুব কম। মুসার লম্বা পা ঠিকমত জায়গা হয় না। কোনমতে গুটিয়ে নিয়ে বসেছে, তাতে বেশ অস্বস্তিই লাগার কথা। কিন্তু কেয়ার করছে না যেন সে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওরা দু'জনেও টী-শার্ট পরেছে। মাগনা পেয়েছে রবিন। রক গ্রুপকে এই শার্টই সরবরাহ করেছে ওর কোম্পানি। রবিনেরটায় লেখা 'দ্য সারভাইভারস' ও মুসারটায় লেখা 'ওয়াইল্ড ওয়েস্ট'।

রবিনের পেছনে বসা মাঝারি বয়সের এক মহিলা। বাসের অন্য সব মেকসিকান মহিলা যাত্রীর সঙ্গে কোন তফাৎ নেই ওর। বাদামী চামড়া। সুতীর ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে, উলের স্কার্ট। লাল একটা শাল দিয়ে মাথা ঢেকেছে, দুই পাশ ছড়িয়ে আছে দুই কাঁধে। কালো চুলের লম্বা লম্বা দুটো বেণি। সান্তা মনিকায় বাসে ওঠার সময়ই মহিলাকে দেখেছে কিশোর। এর পর দু'বার বাস বদল করতে হয়েছে। মহিলা রয়েছে ওদের সঙ্গেই।

অবশেষে বই রেখে পাশের মেয়েটার সঙ্গে কথা আরম্ভ করল রবিন। ইংরেজি জানে মেয়েটা। ফলে কথা বলা সহজ হলো। 'আমি স্প্যানিশ ভাল বলতে পারি না,' বলল সে। 'এই বুয়েনাস ডায়াস-টায়াস জাতীয় দু'একটা শব্দ।'

'মেকসিকো কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'মনে হয় ভালই হবে।' আগেও যে এখানে এসেছে, সে কথা বলল না রবিন।

'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

'ইয়ে...' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন। ভেবে নিয়ে বলল, 'আমেরিকায় প্রায়ই মেকসিকান স্ট্রীট মিউজিকের সুনাম শুনি। খুবই নাকি ভাল।'

'শুধু মিউজিকের জন্যেই?' হাসল মেয়েটা। 'আর কিছু না?'

'আরও অনেক কিছু।' বলবে কিনা দ্বিধা করছে রবিন। 'এই যেমন, মরুভূমি। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে বাস। লোকজন নামছে। তারপর যেন নির্জন অঞ্চলে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে। একেবারে নো ম্যানস ল্যাণ্ডের মাঝে। অবাক লাগে। এই মরুভূমির মাঝে কোথায় যায়?'

'যার যার খামারে। কাউকে কাউকে পাঁচ মাইল কিংবা তারও বেশি হাঁটতে হয় বাস থেকে নামার পর।'

'এত্তো! অথচ দেখে মনে হয় যেন এই মিনিট পাঁচেকের পথ হাঁটতে যাচ্ছে। হাসিমুখে নামছে বাস থেকে। দিব্যি চলে যাচ্ছে, যেন কিছুই না।'

'আসলে তা নয়। মরুভূমির ভেতরে হাঁটাটা সত্যিই কঠিন। তবে আমেরিকানদের মত মুখ গোমড়া করে রাখে না মেকসিকানরা। হাসিখুশি থাকতেই পছন্দ করে।'

ছোট একটা শহরে ঢুকে একটা দোল দিয়ে থেমে গেল বাস। ম্যাপ দেখল কিশোর। তারপর ফিরে তাকিয়ে মুসা আর রবিনকে ইশারা করল। আবার বাস বদলাতে হবে।

মেকসিকান মেয়েটাকে গুড বাই জানিয়ে র‍্যাক থেকে ব্যাগ নামাল রবিন

ব্যস্ত রাস্তার ছোট একটা কাফের সামনে বাস স্টেশন। বেরিয়েই কাফেটাতে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

'আমার যা খিদে পেয়েছে না!' একটা টেবিলে বসতে বসতে মুসা বলল।

সে আর রবিন খাবারের তালিকা ভাল করে দেখেশুনে অর্ডার দিল বীফ বুরিটুস উইথ রাইস অ্যাণ্ড বীন। এই খাবারগুলো তেমন ভাল লাগে না কিশোরের। সে অর্ডার দিল দুটো চিকেন টাকোর। কিন্তু খাওয়ার পর বুঝতে পারল ভুলটা কি করেছে।

'বাপরে বাপ!' কাফে থেকে বেরোনোর সময় বলল কিশোর, 'আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জিভে। এত্তো ঝাল! মরিচ গুলে দিয়েছে!'

বাসের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল চামড়ার ছেঁড়া জ্যাকেট পরা এক লোক। লম্বা, ভারি শরীর, বয়েস বিশ হবে। কিশোরের বুকে ধাক্কা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে স্প্যানিশে বলল, 'যাচ্ছ কোথায়? বাসে জায়গা নেই।'

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটাকে আগেই দেখেছে। তখন তো বেশ আন্তরিক মনে হয়েছিল। এখন এরকম আচরণ করছে কেন?

কিশোর দেখতে পাচ্ছে, বাসের অর্ধেক সীটই খালি। ভদ্র ভাবে সেকথা বলল লোকটাকে।

একটুও নরম হলো না লোকটা। বরং আরও জোরে ধাক্কা লাগাল, 'না, হবে না। বাসে উঠতে পারবে না। চলে যাও এখান থেকে। আমেরিকায় ফিরে যাও, তিনজনেই। তোমাদেরকে এখানে চাই না আমরা।'

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি ওই বাসে উঠবই। দয়া করে সামনে থেকে সরুন।'

সরা তো দূরের কথা, কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল লোকটা। 'ভাল চাইলে কেটে পড়। নইলে বিপদ হবে বলে দিলাম।'

কয়েক হপ্তা ধরে জুডোর প্র্যাকটিস বেশ জোরেশোরে চালিয়েছে কিশোর। অনেক দক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু মনে হলো, বিশালদেহী এই মেকসিকানটার সঙ্গে জুডো খাটিয়েও পেরে উঠবে না। সে কিছু করার আগেই এক ঘুসিতে তার দাঁত ভেঙে দেবে লোকটা। এক ঝাড়া দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল কিশোর, লোকটা ঘুসি মারলেও যাতে তার মুখে লাগাতে না পারে।

চুপ করে সব দেখছিল এতক্ষণ মুসা। চট করে এখন পাশে চলে এল কিশোরের। 'কি, হচ্ছেটা কি?' লোকটা যে ওদেরকে বাসে উঠতে দিতে চায় না একথা মুসাকে বলল কিশোর।

'কেন?'

'কি জানি। হয়তো আমেরিকানদের পছন্দ করে না।'

'ও, তাই। কিন্তু আমরা যে সব বলে ঠিক করেছি। বলে দাও ওকে।'

ঘুসি মেরে বসল লোকটা। লাগলে চিত হয়ে যেত মুসা। কিন্তু চোখের পলকে সরে গেল সে। পরক্ষণেই আঘাত হানল, কাঁধের সামান্য নিচে, কারাতের শুটো-উচি। আরেকটা ঘুসি মারার জন্যে তৈরি হচ্ছিল লোকটা, তার আগেই অবশ হয়ে

গেল তার কাঁধের কাছটা। প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া মানুষের মত ঝুলে পড়ল তার হাত। চেপে ধরল আহত স্থান। মুসার মুখের দিকে তাকাল।

অপেক্ষা করছে মুসা। সামান্য বাঁকা করে রেখেছে পা। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, হাতের আঙুল একদম সোজা।

অবাক হয়ে গেছে মেকসিকান লোকটা। আহত জায়গায় হাত চেপেই রেখেছে। তারপর কয়েক ডলা দিয়ে যেন সেখানে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাল।

ডান হাতটা উঁচু করল মুসা। লোকটা আগে বাড়লেই কারাতের কোপ মারবে।

মাথা নাড়ল লোকটা। বিড়বিড় করে বলল, 'অনেক হয়েছে। ঘাড় মটকে আর মারা পড়তে চাই না! বাপরে বাপ! দশ লাখ পেসো দিলেও না!'

মাথা নাড়তে নাড়তেই সরে পড়ল সে।

হেঁচকি উঠল কিশোরের। হেসে ফেলল রবিন আর মুসা। লাল হয়ে গেল কিশোরের গাল।

'কী?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'চিকেন টাকো পেটেও আগুন লাগিয়েছে? খাও আরও।'

'এই চলো,' তাগাদা দিল মুসা। 'আমাদের বাস রেডি।'

বাসে উঠল তিন গোয়েন্দা। কাফেতে সেই লাল শাল পরা মহিলাকে দেখা যায়নি। বাসে উঠে দেখা গেল পেছনের সীটে বসে আছে।

পার্স থেকে কয়েকটা নোট বের করে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল। বাদামী একটা হাত দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। পলকের জন্যে চোখে পড়ল পুরানো চামড়ার জ্যাকেটের হাতা।

ওরা সীটে বসতে না বসতেই চলতে শুরু করল বাস।

দীর্ঘ যাত্রার এটাই শেষ পর্যায়। একসময় ঢুলতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। অস্বস্তিকর তন্দ্রা। সারাটা রাতই কাটল প্রায় এই অবস্থায়। জায়গায় জায়গায় পথ ভীষণ খারাপ। ঘুমানো অসম্ভব।

সকাল ন'টার দিকে লারেডোতে পৌঁছল বাস। গাছে ঘেরা একটা ছোট চত্বরে একসারি বেঞ্চ রাখা, ওটাই বাস স্টেশন।

সীমান্ত পার হয়েই ডজকে ফোন করেছিল কিশোর। বাস থেকে নেমে দেখল, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জীপ নিয়ে। ওদেরকে দেখে খুশি হয়েছেন, তবে বেশ অস্থির। অবাকই লাগল তিন গোয়েন্দার। ওরা গাড়িতে ব্যাগ তোলার সময় বারবার বলতে লাগলেন, র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে দেরি হবে না। কিশোরের মনে হলো, ওদেরকে নয়, নিজেকেই বোঝাচ্ছেন যেন।

চত্বর থেকে বেরিয়েই পেছনে তাকাল কিশোর। আছে। একটা সাইডওয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে জীপটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে লাল শাল পরা মহিলা। ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল কিশোর। তবে মহিলা তার জবাব দিল না।

তাতে কিছু মনে করল না কিশোর। এটাই বরং স্বাভাবিক। কয়েক হাজার পেসো খরচ করেছে মহিলা, সেই মেকসিকান লোকটাকে দিয়েছে ওদেরকে

ঠেকানোর জন্যে। পুরো টাকাটাই জলে গেছে। ঠিকই লারেটোতে পৌছেছে তিন গোয়েন্দা।

চার

র‍্যাঞ্চে পৌছুতে দুই ঘণ্টা লাগল।

এঁকেবেঁকে, কখনও ঘুরে ঘুরে চলে গেছে পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের ঢাল বনে ছাওয়া। সামনে, দূরে একসারি উঁচু পর্বত। ডজ জানালেন, ওটাই সিয়েরা মাদ্রে।

টেলিভিশনে দেখা পুরানো একটা সিনেমার কথা মনে পড়ল রবিনের। হেসে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওই সিয়েরা মাদ্রে পর্বতেই হামফ্রে বোগার্ট আর তার সাথীরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিল, তাই না?'

রবিনের কথায় কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন ডজ। মাথা নেড়ে বললেন, 'দ্য ট্রেজার অভ সিয়েরা মাদ্রে শুধুই একটা ছবি। সত্যি নয়। ওই পর্বতে গুপ্তধন নেই।'

চট করে পেছনের সীটে বসা মুসার দিকে তাকাল রবিন।

এর খানিক পরেই র‍্যাঞ্চে পৌছল ওরা। কাঠের তৈরি লম্বা, নিচু একটা বাড়ি। চারপাশের খোলা প্রান্তর ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা লেকের ধারে। মাঠে কয়েকটা ঘোড়া চরছে, এছাড়া জীবনের আর কোন চিহ্নই নেই কোথাও।

লেকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। দুই-তিন মাইল লম্বা আর আধমাইল মত চওড়া হবে লেকটা, আন্দাজ করল সে। ভাবল, মাছ ধরার চমৎকার জায়গা। সাথে করে ছিপ নিয়ে আসায় ভালই হয়েছে। লেকের অন্যপাশে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। কেবল গাছের জটলা। তবে গাছপালার ওপাশে পুরানো একটা বাড়ির টাওয়ার চোখে পড়ছে। গির্জা হতে পারে, কিংবা দুর্গ। হয়তো মানুষও বাস করে ওখানে।

ডজের পিছু পিছু বারান্দায় উঠল ওরা। বড় একটা ঘরে ঢুকল। ফায়ারপ্লেস আছে। আরাম করে বসার জন্যে আছে অনেকগুলো চেয়ার।

'খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?' জিজ্ঞেস করলেন ডজ।

'একেবারে মনের কথাটা বলে ফেলেছেন,' মুসা বলল।

হাত তালি দিল ডজ। সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকল একজন মেকসিকান লোক।

'ওর নাম পিরেটো,' ডজ জানালেন। 'আমার বাবুর্চি।' তিন গোয়েন্দার নাম ধরে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না যেন।

পিরেটোর বয়স পঞ্চাশের মত। গাট্টাগোট্টা শরীর। বাদামী মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, লম্বা কালো চুল। গায়ে ডেনিম শার্ট, পরনে জিনস, পায়ে কাউবয় বুট। বাবুর্চি না হয়ে র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড বা রাখাল হলেই যেন বেশি মানাত তাকে, ভাবল কিশোর।

দ্রুত স্প্যানিশ ভাষায় লোকটাকে নির্দেশ দিতে লাগলেন ডজ। 'নাস্তা' আর 'এক্ষুণি' শব্দ দুটো বুঝতে পারল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল পিরেটো। চোখের মণি বাদামী, তবে এতটাই গাঢ়, প্রায় কালোই মনে হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রবিন, কথা বলার সময় ডজের দিকে

সরাসরি তাকায় না। কেমন যেন একটা এড়িয়ে চলার প্রবণতা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রক গায়কের মাঝে যেমন থাকে অনেকটা তেমনি।

ভাল বাবুর্চি পিরেটো। মুসা আর কিশোর শুয়োরের মাংস খায় না, জেনে গেছে। তাই গরুর মাংস ভাজা করে আনল। সেই সঙ্গে প্রচুর ডিম আর গরম গরম রোল।

লম্বা টেবিলটার মাথায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বসলেন ডজ, তবে খেলেন না কিছু। কাঁটা চামচ দিয়ে একটা রোলকে খোঁচাতে থাকলেন নার্ভাস ভঙ্গিতে। তিন গোয়েন্দার খাওয়া শেষের অপেক্ষা করছেন, যেন কিছু বলার জন্যেই। কিছু একটা ভাবিয়ে তুলেছে মনে হয় তাঁকে।

'পেট ভরল?' মুসাকে শেষ টুকরোটা মুখে পুরতে দেখে বললেন তিনি।

'বোঝাই হয়ে গেছে। দারুণ লাগল।'

উঠে দাঁড়ালেন ডজ। 'এসো। তোমাদেরকে র‍্যাঞ্চটা দেখাব।'

বাইরে বেরিয়ে দ্রুত একটা বেড়ার কাছে নিয়ে এলেন ওদেরকে। অনেকখানি জায়গা ঘিরে বেড়া দেয়া হয়েছে। মাঠের একধারে ছোট একটা কাঠের ছাউনি।

'এসো, আমার বারো দেখাব।' ওদের মতামতের অপেক্ষা না করেই ছাউনিটার দিকে এগিয়ে গেলেন ডজ। ওটার কাছে পৌঁছার আগেই ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল একটা গাধা, মেকসিকানরা বলে বারো। বেরিয়েই ওদেরকে দেখে থমকে গেল, তারপর যেন লজ্জা পেয়েই ওদের কাছ থেকে সরে গেল।

মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে কালো একটা দাগ গিয়ে কাঁধের কাছটায় ছড়িয়ে পড়েছে জানোয়ারটার। চামড়াটাকে প্রায় সাদাই বলা চলে। বড় বড় কান, লম্বা লেজের মাথায় চুলের ঘন গোছা। সামনের একপায়ে দড়ি বাঁধা। সেটা ছুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করল।

যে-কোন পোষা জানোয়ার মুসার পছন্দ। গাধাটাকে আদর করার জন্যে এগোতে গেল সে। থামিয়ে দিলেন ডজ। 'ছুঁয়ো না। বয়েস একেবারেই কম, বড়জোর দু'বছর। পোষ মানেনি এখনও।'

কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকছে গাধাটা। এলোপাতাড়ি কয়েকবার পেছনের পা ছুঁড়ে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল কাছে গেলে ভাল হবে না।

'অনেক বুনো গাধা আছে এখানকার পাহাড়ে,' ডজ জানালেন। 'মাস দুই আগে আমার মাঠে ঢুকে পড়েছিল ওটা। ধরে ফেললাম। ওর নাম রেখেছি শারি।' মুসার দিকে তাকালেন তিনি। 'নাম ধরে ডেকে দেখ। বলো, এদিকে এসো, শারি। দেখ কি করে।'

ব্যাপারটা কি? ওদেরকে শিশু মনে করছেন নাকি ডজ? এমন ভাবে কথা বলছেন! তবে যেহেতু জানোয়ারটাকে ভাল লেগেছে তার, ডজের কথামত ডাক দিয়ে বলল, 'এখানে এসো, শারি। এসো।'

লম্বা কানদুটোকে পেছন দিকে শুইয়ে ফেলল শারি। প্রায় ঘাড় ছুঁয়েছে কানের ডগা। ঘোড়ার স্বভাব জানা আছে মুসার। তা থেকেই আন্দাজ করল, সতর্ক হয়ে উঠেছে গাধাটা। কিংবা রেগে গেছে। আরেকবার ডাকল নাম ধরে। কাছে তো এলই না, আরেকটু সরে গেল ওটা, দড়ি লম্বা হলে আরও সরত।

'তুমি ডাকো,' রবিনকে বললেন ডজ।

'কি হবে ডেকে?' এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগছে না রবিনের। 'বললে আরও সরে যেতে চাইবে।'

'তা ঠিক।' হাসলেন ডজ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ডাকবে?'

শারির আসা-যাওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কিশোরের। এলেই বা কি, না এলেই কি? কিন্তু যে ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডজ; কৌতূহল হলো তার।

বিরক্তি চেপে জোরে ডাক দিল কিশোর, 'এদিকে আয়, শারি।'

অদ্ভুত কাণ্ড করল শারি। ঝটকা দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। সরাসরি কিশোরের দিকে। একবার কেঁপে উঠল কানের ডগা। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'খাইছে! কাণ্ডটা কি হলো?'

'আবার!' ফিসফিসিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ডজ। 'আবার ডাকো!'

আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর। আবার ডাক দিল, 'এদিকে আয়, শারি!'

দড়ি বাঁধা পা দিয়ে বাতাসে লাথি মারল শারি, দড়িটা খুলে ফেলার চেষ্টা করল। তারপর দৌড়ে এল কিশোরের দিকে। ফুটখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। গলা লম্বা করে নাক দিয়ে আলতো গুঁতো দিল ওর বুকে।

'তোমার প্রেমে পড়ে গেছে! মেয়ে গাধা তো!' হেসে কিশোরের কাঁধে চাপড় মারল রবিন। 'কেমন লাগছে, কিশোর? মাত্র তিনটে শব্দ ব্যবহার করলে। আর জলজ্যান্ত একটা গাধাকে পটিয়ে ফেললে।'

পিছিয়ে গেল কিশোর। গাধাটার এই আচরণ অবাক করেছে ওকে। রবিনের কথায় লজ্জা পেয়েছে।

'আদর করো ওকে!' কিশোরের হাত চেপে ধরল ডজ, যাতে সরে যেতে না পারে। 'দেখ, কি করে?'

প্রচণ্ড কৌতূহল চাপতে পারল না কিশোর। আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিল শারির মাথায়। ঝট করে কান সোজা করে ফেলল গাধাটা। আবার কিশোরের বুকে নাক ঘষল।

চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ডজের মুখে। যেন এইমাত্র বিরাট অঙ্কের একটা বাজি জিতে গেছেন, এমনি ভাবভঙ্গি। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোরকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'নাহ্, আর কোন সন্দেহ নেই আমার! আমি এখন শিওর, ও তোমাকে পিঠে চড়তে দেবে। যাও। ওঠো। বয়েস কম হলে কি হবে, যা শক্তি আছে তোমার মত একজন মানুষকে সহজেই বইতে পারবে। সাধে কি আর বলে ভারবাহী গাধা।' এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনি, যেন মস্ত এক দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়েছেন।

দ্বিধা করছে কিশোর। গাধার পিঠে চড়ার আগ্রহ নেই। কিন্তু ডজের অতি আগ্রহ অসংখ্য প্রশ্নের ভিড় জমিয়েছে ওর মনে। কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় রয়েছে এসবের পেছনে। গোয়েন্দা হিসেবে এখন তার উচিত সমস্ত সূত্র খতিয়ে

দেখা।

ডান পা তুলে দিয়ে লাফিয়ে গাধার পিঠে চড়ে বসল সে। ঘাড় বাঁকা করে বড় বড় কোমল চোখ মেলে ওকে দেখার চেষ্টা করল শারি। টান টান হয়ে গেছে কান, খাড়া হয়ে আছে মাথার ওপর। সওয়ারি হিসেবে কিশোরকে নিতে মনে হয় আপত্তি নেই তার।

'হ্যাঁ, এবার চলতে বলো।' ফিসফিস করে শিখিয়ে দিলেন ডজ। গলায় উত্তেজনা।

হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে গেল কিশোরের। প্রকাশ করল না সেটা। চলতে বলল গাধাটাকে।

টলমল পায়ে আগে বাড়ল ওটা। জিন, লাগাম কিছুই নেই। শারির গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো কিশোরকে, যাতে পড়ে না যায়। একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন তাকে ডজ। মেকসিকোতে তো বটেই, আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলেও কাউ-বয়রা ঘোড়া চালানোর সময় কিছু বিকৃত শব্দ ব্যবহার করে, যেমন, চলতে বললে বলে 'গিডিআপ', আর থামতে বললে 'হুয়া'। সেটাই পরখ করে দেখার ইচ্ছে হলো তার। কয়েক কদম এগোতেই বলল সে, 'হুয়া, শারি, হুয়া!'

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল গাধাটা। থেমে গেল।

'বাহ্!' এগিয়ে এলেন ডজ। কিশোরকে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করলেন। 'চমৎকার শিখে ফেলেছ তো তুমি। গাধাটাকেও পোষ মানিয়ে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ,' মুসা বলল। 'মানুষ, জানোয়ার সব কিছুকেই পোষ মানাতে ওস্তাদ কিশোর পাশা। ও যে কোন কাজটা পারে না, সেটাই বুঝি না মাঝে মাঝে।'

'মজার কাণ্ড করল,' ডজের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'ভুল করে হয়তো আমাকে অন্য কেউ ভেবেছে শারি, যার কথা সে শোনে।'

'তা কি করে হয়?' মাথা নাড়লেন ডজ। 'এখানে যখন এসে ঢুকল, পুরোপুরি বুনো ছিল শারি। সারা জীবনে কেবল দু'জন লোককে দেখেছে। আমাকে, আর পিরেটোকে।'

'কিন্তু আপনাদের দু'জনের কারও মতই দেখতে-নই আমি।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। জটিল কোন ভাবনা মাথায় ঢুকলেই মাঝে মাঝে এই কাজটি করে সে। তার ধারণা এতে তার ভাবনার একাগ্রতা আসে।

আধঘণ্টা পরে যখন বিশাল ঘরটায় এসে বসল, তখনও চিমটি কাটা বন্ধ হলো না তার। রবিন আর মুসাও বসেছে ওর সঙ্গে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে, মাঠের ধারের ছাউনিটার দিকে। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাদা গাধাটা। এদিকেই তাকিয়ে [illegible] জানোয়ারটাও। আস্তে করে ডাক দিচ্ছে, যেন চাইছে কিশোর গিয়ে আবার তাকে আদর করুক।

'শারি!' ছিপটা জোড়া লাগাতে লাগাতে আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। 'ঠিক, মনে পড়েছে। শারি হলো গিয়ে ড্যাগউডের স্ত্রীর নাম! যে ধাঁধাটার সমাধান করেছিলে সেদিন, তাতে একটা জবাব ছিল, শারি।'

'তা ছিল,' সায় দিয়ে বলল কিশোর। 'তবে শুধু শারিই নয়। আরও কিছু জবাব ছিল ওটাতে। আরও সূত্র।'

'আর কি সূত্র?' ব্যাগ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল রবিন। কাপড় বের করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে লাগল ওয়ারড্রোবের ড্রয়ারে। 'ওই গাধাটা কেন তোমার প্রেমে পড়ল, সেই সূত্র?'

রসিকতাটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'গাধাটাকে বলার জন্যে আমাদেরকে যেসব শব্দ বলেছে, ক্রসওয়ার্ড পাজলের উত্তরগুলোই হলো সেসব শব্দ।'

'তাই?' মুসার প্রশ্ন। 'আর কোনটা?'

দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ মুদল কিশোর। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'কাম। হিয়ার। গিডি আপ। উওউ। দুর্ভাগ্য কিংবা দুঃখ বোঝাতে ব্যবহার হয় এই উওউ শব্দটা। আর, হুয়া শারি, মানে হলো, থাম। শারি! এবং প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গাধাটা।'

নিজের বাংকে গিয়ে বসে পড়ল রবিন। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল একবার। বলল, 'কিশোর, তুমি কিছু একটা ভাবছ।'

নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জবাব দিল না।

আবার বলল রবিন, 'মুসাও তো ওই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিল। শারি তো ওর কথা শোনেনি?'

'জানি,' রবিনের মতই অবাক হয়েছে কিশোরও। 'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু বলতে হচ্ছে, ওই গাধাটার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে আমার। সে জন্যেই আমাকে চিনতে পারছে। অন্তত আমার গলা যে চিনেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

পাঁচ

সে রাতে পিরেটোর তৈরি প্রচুর পরিমাণে শিক কাবাব আর বনরুটি দিয়ে ডিনার সেরে সকাল সকাল শুতে গেল তিন গোয়েন্দা।

কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। তার বাংকের পাশে জানালার বাইরে দেয়ালে গা ঘষার শব্দ। মাথা উঁচু করে জানালা দিয়ে দেখল, শারি। কাচের ভেতর দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

নিচু গলায় ধমক দিল কিশোর। হাত মুঠো করে দেখাল। চলে যেতে বলল গাধাটাকে। কিন্তু গেল না ওটা। এখন মুসা কিংবা রবিন জেগে উঠে যদি ব্যাপারটা দেখে ফেলে, তাহলে টিটকারি দিয়ে দিয়ে তার জান জ্বালিয়ে দেবে। বিড়বিড় করে আপনমনেই গাল দিল গাধাটাকে। তারপর বিছানা থেকে নেমে পেছনের দরজার দিকে রওনা হলো। পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল শারি। তার বুকে নাক ঠেকিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল। সরল না কিশোর। গাধার বুকে ঠেলা দিয়ে ওটাকে বাইরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জানোয়ারটা ছোট হলেও গায়ে ভীষণ জোর, বালির বস্তার মত গ্যাঁট হয়ে রইল যেন। কিছুতেই নড়ানো গেল না। শেষে বাধ্য হয়ে নিজেই বাইরে বেরিয়ে এল। মোলায়েম গলায় ওটার নাম ধরে কথা বলতে বলতে।

চোখের পলকে ঘুরে গেল গাধাটা। চাঁদের আলোয় কিশোর দেখল, ওটার

পায়ের দড়ি নেই। মুক্ত। আবার সে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলেই ওটাও সঙ্গে ঢুকবে। আহ্, মহা জ্বালাতন! এর হাত থেকে বাঁচা যায় কিভাবে? জবাব একটাই ওটাকে মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। বাড়ির একমাথার বারান্দা থেকে কথা শোনা গেছে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা। ডজের সঙ্গে কথা না বললেও তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছে পিরেটো, কথা বলেছে। স্প্যানিশ ভাষায় কিশোরের কাছে আমেরিকার কথা জিজ্ঞেস করেছে। লেকটার কথা বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, ওটাতে যাতে সাঁতার কাটতে না যায়। পর্বত থেকে নেমে আসা পানি নাকি বরফের মত শীতল, কোন মানুষই কয়েক মিনিটের বেশি টিকতে পারবে না। শুনেই এখন পিরেটোর ভারি কণ্ঠ চিনতে পারল কিশোর। তবে বেশ দূরে। অস্পষ্ট। কি বলছে বোঝা যায় না।

মহিলা কে? জানার কৌতূহল হলো কিশোরের। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। পাশে থেকে চলল শারি। ওটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে চলল কিশোর, যাতে শব্দ না করে গাধাটা।

মহিলার কথা এখন বোঝা যাচ্ছে। 'আমাকে সাহায্য করতেই হবে, পিরেটো।' স্প্যানিশ ভাষা। 'পেয়ে যাওয়ার পর কি করবে আন্দাজ করতে পারছ? ওদেরকে খুনও করে বসতে পারে ডজ!'

মুখ খারাপ করে মেকসিকান ভাষায় ডজকে কয়েকটা গাল দিল পিরেটো। 'বেশ,' বলল সে। 'যতটা পারি, তোমাকে সাহায্য আমি করব। এখন থেকে আমি তোমার দলে।'

পিরেটোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল মহিলা।

দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে বাড়ির ছায়ায় অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে চত্বরের দিকে। মহিলা চলে যাওয়ার আগে পলকের জন্যে ওকে দেখতে পেল সে। তবে এদিকে পেছন ফিরে থাকায় মুখ দেখা গেল না। চাঁদের আলো পড়েছে সোনালি চুলে।

কিশোরের গায়ে কাঁধ ঘষছে গাধাটা। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে মাঠে ঢোকার গেটটা খোলা। শারিকে সেখানে নিয়ে গেল কিশোর। তারপর চট করে গেটের এপাশে চলে এসে পাল্লা লাগিয়ে হুড়কো আটকে দিল। বেড়া ডিঙিয়ে চলে এল আবার এপাশে। ওপর দিয়ে মাথাটা এপাশে ঠেলে দিয়ে কর্কশ গলায় ডাকতে শুরু করল গাধাটা। লাফিয়ে পেরোতে পারবে না ওটা, বুঝে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

ফিরে এল বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরোনোর আগে সংক্ষেপে সব জানাল দুই সহকারীকে। বলল, জরুরি একটা টেলিফোন করতে হবে। ডজকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বের করে নিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে, এবং এই কাজটা করতে হবে রবিন আর মুসাকেই।

কাঁচা মরিচ মিশিয়ে মেকসিকান কায়দায় ডিম ভেজে দিল পিরেটো। কিশোরের খুব পছন্দ এই খাবারটা, কিন্তু পেট ব্যথা করছে, এই ছুঁতো দিয়ে

খেল না।

ডজও বসেছেন ওদের সঙ্গে। তাঁকে জিজ্ঞেস করল মুসা, লেকে মাছ ধরতে যাওয়া যাবে কিনা। ডজ বললেন, যাবে। কিশোর বলে দিল, পেট ব্যথা নিয়ে সে যেতে পারবে না। ঘরেই থাকবে। আধ ঘন্টা পর ঘরে রইল শুধু সে আর পিরেটো।

কি একটা কাজে সে ঘর থেকে চলে গেল পিরেটো। প্লেটে একগাদা রোল পড়ে আছে। চমৎকার সুগন্ধ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল সে। একেবারে খালি পেটে থাকা কঠিন। লাঞ্চের সময় হতে অনেক দেরি।

খাওয়া শেষ করে টেলিফোন সেটের সন্ধানে বেরোল সে। পাওয়া গেল লিভিং রুমের পাশে ডজের ছোট অফিসে। পেছনে পাল্লাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে ডেস্কের সামনে বসল। ফোন বুক টেনে নিয়ে দেখতে লাগল ক্যালিফোর্নিয়ার ডাইরেক্ট নম্বর কত।

একবার রিঙ বাজতেই তুলে নিলেন ভিকটর সাইমন। বিখ্যাত সেই খোঁড়া গোয়েন্দা এবং লেখক, যাঁর সঙ্গে অনেক কাজ করেছে ওরা।

কোথা থেকে করছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমাকে কয়েকটা তথ্য দিতে পারেন? আপনার টার্মিনাল থেকে আমার কম্পিউটার ইনফরমেশন সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করলে পেয়ে যেতে পারেন।'

'করছি।'

'থ্যাংকস। আমার পাসওয়ার্ডে ঢুকে পড়বেন। ডিটেক্ট লিখতে হবেঃ ডি ই টি ই সি টি। তারপর মেনু উল্টে যাবেন যতক্ষণ এনসাইক্লোপিডিয়া পাওয়া না যায়।'

'বেশ। সাবজেক্ট কি?'

'বারো।'

'কী?'

'বারো নিশ্চয় চেনেন। ছোট জাতের গাধা। ভারবাহী জন্তু।'

'বুঝেছি।'

বারো সম্পর্কে কি কি জানতে চায়, জানাল কিশোর।

লিখে নিলেন মিস্টার সাইমন। জেনে নিয়ে কিশোরকে জানাবেন বলে কেটে দিলেন লাইন।

কথা বলতে বলতেই ছোট অফিসটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে কিশোর। এমনিতে, অন্য কারও ঘরে হলে ঢোকার আগে অনুমতি নিয়ে নিত সে। কিন্তু এখানে ঢুকে কোন অপরাধবোধ হচ্ছে না তার। শুরু থেকেই ওদের সঙ্গে প্রচুর মিথ্যে কথা বলেছে ডজ। কাজেই সত্য জানার অধিকার রয়েছে তিন গোয়েন্দার।

অনেক প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে কিশোরের মনে। কেন ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ওকে এখানে আনা হলো? কেন তার প্রতি এই আগ্রহ? কেন মেকসিকান লোকটা তাকে এখানে আসতে বাধা দিতে চাইল? আর শারিই বা কি করে তাকে এভাবে চিনে ফেলল?

আকর্ষণীয় তেমন কিছু পাওয়া গেল না ডজের ড্রয়ারে, সিয়েরা মাদ্রের বড় বড় কয়েকটা ম্যাপ বাদে। ওগুলোতে পেন্সিল দিয়ে আঁকা প্রশ্নবোধকের ছড়াছড়ি।

ডজই এঁকেছে হয়তো। সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটাতে রয়েছে র‍্যাঞ্চের দলিলপত্র। ওগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল সে। নিচের স্বাক্ষরটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার।

পিরেটো সানচেনজো!

র‍্যাঞ্চটা তাহলে পিরেটোই ডজের কাছে বিক্রি করেছে। এবং তারপরে নিজের র‍্যাঞ্চেই নিযুক্ত হয়েছে বাবুর্চি এবং রাখাল। ডজের প্রতি তার রাগের একটা ব্যাখ্যা মিলল।

একেবারে নিচের ড্রয়ারে পাওয়া গেল একটা টেপ-রেকর্ডার। ওটা বের করে ভলিয়ুম কমিয়ে প্লে করে দিল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল নিজের গলা। বার বার শুনল নিজের কণ্ঠঃ কাম। হিয়ার। শারি। গিডি। উত্তউ। শারি। কাম। হিয়ার…

কয়েকবার শোনার পর সাবধানে ক্যাসেটটা রিউইণ্ড করে ফিতেটা আবার আগের জায়গায় এনে রেকর্ডারটা ড্রয়ারে রেখে দিল সে।

কয়েক মিনিট পরে টেলিফোন বাজল। মিস্টার সাইমন করেছেন। বললেন, 'রেডি?'

'হ্যাঁ, বলুন,' কিশোর জবাব দিল। কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হলো।

এক এক করে প্রশ্নের জবাব বলে গেলেন তিনি, আর প্রতিটি প্রশ্নের নিচে ফাঁকা জায়গায় লিখে নিল কিশোর। লেখা শেষ হলে ধন্যবাদ জানাল লেখককে।

সাইমন বললেন, 'যে কোন দরকার হোক, টেলিফোন করো। তোমার ওই গাধা, সরি, বারো তোমাকে কোথায় নিয়ে যায় জানার জন্যে আগ্রহী হয়ে রইলাম।'

জানাবে, বলে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। মুসা আর রবিনের সঙ্গে এখন আলোচনায় বসতে হবে। কিন্তু ওদের ফিরতে আরও কম করে হলেও ঘণ্টাখানেক লাগবে। অফিস থেকে বেরিয়ে আবার পাল্লাটা লাগিয়ে দিল সে।

সকাল থেকেই শারিকে দেখছে না। প্রশ্নের জবাবগুলো পেয়ে যাওয়ার পর জানোয়ারটা সম্পর্কে আরও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গিয়ে ওটাকে দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে।

মাঠেই পাওয়া গেল পিরেটোকে। বারোটার সঙ্গে রয়েছে। পানি ভরছে ওটার গামলায়। কিশোরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ছুটে এল জানোয়ারটা। আদর করে ওটার গলায় চাপড়ে দিল সে।

দুপুরের রোদ বড় কড়া। শার্ট খুলে ফেলেছে মেকসিকান লোকটা। কিশোর দেখল, ওর বুক আর পিঠও মুখের মতই একই রকমের বাদামী। বুঝতে পারছে না এটাই কি ওর আসল রঙ, না দীর্ঘদিন রোদের মধ্যে কাজ করার ফলে ওই অবস্থা হয়েছে।

গাধাটাকে দেখিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'পায়ের দড়ি খুলে নেয়া হয়েছে কেন?'

'কারণ তুমি যতক্ষণ আছ আর পালাবে না। অযথা বেঁধে রেখে লাভ কি?'

'আমি?'

স্প্যানিশ ভাষায় যা বলল পিরেটো, তার মানে করলে দাঁড়ায়, 'ওটা তোমার

প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'কেন, কৃতজ্ঞ কেন?'

'শারির ধারণা তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ। ওরা খুব ভাল জানোয়ার। বিশ্বাসী। কৃতজ্ঞতা বড় বেশি।'

বালতি তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল পিরেটো। পেছনে চলল কিশোর। তার সঙ্গে গাধাটা। কিন্তু আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হলো না মেকসিকান। বলে দিল তার কাজ আছে।

বেশ কয়েকটা ট্রাউট মাছ ধরে আনল মুসা আর রবিন। শিকে গেঁথে সেগুলো দিয়ে কাবাব বানিয়ে দিল পিরেটো। দুপুরের খাবার সময় হঠাৎ করেই যেন পেট 'ভাল' হয়ে গেল কিশোরের, বেশি খেয়ে সকালেরটা পুষিয়ে নিল।

খাওয়ার পর-পরই দুই সহকারীকে বলল, 'চলো, হেঁটে আসি। বেশি খেয়ে ফেলেছি, হজম করা দরকার।'

রবিন আর মুসা দু'জনেই বুঝল ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় গোয়েন্দাপ্রধান। কোন প্রশ্ন না করে ওর সাথে চলল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে চলে এল লেকের ধারে ছোট একটা বনের কাছে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

বনের ভেতরে একটুকরো খোলা জায়গা দেখে সেখানে ঘাসের ওপর বসল। মিস্টার সাইমনকে যে ফোন করেছিল সেকথা জানাল কিশোর। পকেট থেকে বের করল প্রশ্নের জবাব লেখা কাগজটা।

দেখে দেখে বলল, 'বারোদের শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। তবে কুকুরের মত চালাক নয়। গন্ধ শুঁকে চিনতে পারে না। কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারে। কাউকে পছন্দ করলে তার ভীষণ ভক্ত হয়ে যায়। কণ্ঠ শুনলে সাড়া দেয়।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'তোমাকে যে পছন্দ করেছে শারি, সেটা সারাজীবনই এক রকম থাকবে?' মুচকি হাসল সে।

রেগে গেল কিশোর। 'বাজে কথা বন্ধ করো তো!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই গাধাটার জন্যেই ওই ক্রসওয়ার্ড পাজলের ব্যবস্থা করেছিলেন ডজ। এমন একটা কণ্ঠস্বর খুঁজছিলেন, যেটা একটা বিশেষ মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে মিলে যায়। হবে কোন আমেরিকান, আমাদের বয়েসী, যে গাধাটাকে ভালবাসত।'

পিরেটো কি বলেছে জানিয়ে বলল সে, 'সেই মানুষটা বারোটার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সে কে জানি না। টেপে আমার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলেন ডজ, সেই লোকটার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার কণ্ঠের মিল আছে। যে যে শব্দ দরকার সেগুলোই ক্রসওয়ার্ড পাজলের মাধ্যমে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। টেপে আমি জবাব দিয়ে পাঠিয়েছি। শুধু সেই শব্দগুলো বাদে আর সব মুছে ফেলেছেন। সকালে তাঁর ড্রয়ার খুলে টেপটা পেয়েছি। সেই শব্দ নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছেন শারিকে। মনে হয় যান্ত্রিক শব্দ চিনতে পারেনি ওটা। কাজেই জ্যান্ত মানুষটারই প্রয়োজন হয়েছে ডজের। তখন আমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছেন। আমার গলা শোনার আগে পর্যন্ত শিওর হতে পারেননি, কাজ হবে কিনা। সেজন্যেই কাল নার্ভাস হয়েছিলেন। ব্যাপারটা জানার জন্যে আর তর সইছিল না তাঁর। নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে গাধাটার কাছে। তারপর যখন জানলেন...নিশ্চয় খেয়াল করেছ কি

পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।'
নীরবে কিশোরের কথাগুলো ভেবে দেখল মুসা আর রবিন।
'হুঁ,' অবশেষে মাথা দোলাল রবিন। 'যুক্তি আছে তোমার কথায়…'
'হ্যাঁ,' মুসাও একমত হলো। 'কিন্তু এতসব ঝামেলা করতে গেলে কেন? না হয় একটা গাধার বাচ্চা তোমার স্বর চিনে সাড়াই দিল। এর জন্য এতগুলো টাকা খরচ করবেন ডজ?'
মাথা নাড়ল কিশোর। 'এর জবাব আমারও জানা নেই। তবে একটা কথা বড় বেশি খচখচ করছে মনে।'
'কি?' জানতে চাইল রবিন।
'একটা ব্যাপার হতেই পারে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'দু'জন মানুষের কণ্ঠস্বরে মিল থাকা সম্ভব। ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে একটা টেপ পেয়েছিলাম, মুসা, মনে আছে? ওটাতে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার গলা মিলে যায়।'
আবার নোটের দিকে তাকাল কিশোর। বারোদের দৃষ্টিশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু যে গলার স্বর শুনে মানুষকে চিনতে পারে, তাই নয়, চেহারা দেখেও পারে।'
মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ, তার মানে…' থেমে গেল সে।
অন্য দু'জনও শুনতে পেল শব্দটা। দ্রুত সরে যাচ্ছে পদশব্দ, বনের গভীরে। উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। পিছু নিল নিঃশব্দে।
কিন্তু ওদের চেয়ে বনটা অনেক ভাল চেনে যে যাচ্ছে। একটু পরেই ওকে হারিয়ে ফেলল ওরা। আর শুনতে পেল না পায়ের শব্দ। কোন শব্দই নেই আর, পাখির ডাক ছাড়া।
ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে পুরো এলাকাটা খুঁজে দেখবে ঠিক করল ওরা।
সেই মতই কাজ করল। খুঁজতে খুঁজতে সবার আগে খোলা জায়গাটায় ফিরে এল কিশোর। তারপর এল মুসা। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল, লোকটাকে পায়নি। বসে পড়ল ঘাসের ওপর।
আরও মিনিট দশেক পর রবিন ফিরল। পকেটে হাত ঢোকানো। মুখে হাসি। এমন একটা ভঙ্গি, যেন জেনে এসেছে কিছু।
'দেখেছ নাকি কাউকে?' জিজ্ঞেস করল মুসা
'না,' জবাব দিল রবিন। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বলল, 'তবে এই জিনিসটা পেয়েছি।'
পকেট থেকে হাত বের করল সে। আঙুলে ধরা জিনিসটা দেখাল।
দেখল কিশোর আর মুসা। তিন ইঞ্চি লম্বা একটুকরো উল। মেকসিকান শালের। রঙ লাল।

ছয়

'শারিকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছে আমার,' পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বললেন ডজ।
ডিম ভাজা মুখে পুরে দিয়ে মুসা বলল, 'কি হয়েছে? মন খারাপ? সখ

গোমড়া? আকাশের তারা দেখে খালি?'

টেবিলের নিচ দিয়ে ওর পায়ে লাথি মারল কিশোর।

মুসার কথা যেন কানেই যায়নি ডজের। আবার নার্ভাস লাগছে তাঁকে। খাবার প্রায় খেলেনই না। মাঠে থাকলে বিপদে পড়ে যাবে বারোটা।

সকালে ওটাকে মাঠে দেখেছে মুসা। তার মনে হয়েছে আরামেই আছে জানোয়ারটা। তাজা চেহারা। ঘাস খাচ্ছিল। চোখ চকচকে, চামড়া উজ্জ্বল, মসৃণ। ছাউনির বাইরে ছিল, কিশোরকে দেখেই ছুটে এসেছে। গাধার তুলনায় জোরেই ছোটে।

সেসব বলল না কিশোর। বলা যায় না, চুপ করে থাকলে রহস্যের আরেকটা সূত্র ধরিয়ে দিতে পারেন ডজ। নিরীহ ভঙ্গিতে বললেন, 'শারি কি খাচ্ছে না?'

'ওর খুর নিয়ে ভাবনা হচ্ছে আমার।' কফির কাপে চুমুক দেয়ার আগে ভ্রূকুটি করলেন ডজ। 'জানো হয়তো, বারোদের আদি নিবাস ছিল উত্তর আফ্রিকায়। যা শক্ত, পাথুরে মাটিতে হেঁটে অভ্যস্ত। মানুষের নখের মতই ওদের খুরও দ্রুত বাড়ে। শক্ত মাটিতে ঘষা লেগে ক্ষয়ে গিয়ে স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু এখানকার মত নরম মাটিতে থাকলে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেলেও অবাক হব না।' কাপটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'আর এ হারে বাড়তে থাকলে খোঁড়া হতে সময় লাগবে না।'

'ছেটে ফেলা যায় না?' জানতে চাইল মুসা।

একবার একজনকে ক্ষুর দিয়ে গাধার খুর চেঁচে দিতে দেখেছিল সে।

'নাহ!' ভুরু কুঁচকেই রেখেছেন ডজ। 'ওর মত একটা বুনো বারো কাছেই ঘেষতে দেবে না আমাকে। ওর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করলেই লাথি মেরে ঘিলু বের করে দেবে আমার।'

কিশোর ভাবল, শারি হয়তো তাকে পা ছুঁতে দেবে। চুপ করে রইল সে। ওর মনে হলো কিছু একটা বলতে যাচ্ছেন ডজ। শারির খুরের ব্যাপার নয়, অন্য কিছু।

'মনে হচ্ছে,' ডজ বললেন, 'শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হবে ওকে। যেখান থেকে এসেছে সেই পর্বতেই ফিরে যাক।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু, গোলমালটা হলো, ও এখন যেতে চাইবে না। কারণ তুমি রয়েছ এখানে।'

কিশোরের মনে হলো, বহুদিন ধরেই তো আছে শারি, তার খুরও বেড়েছে, তাহলে এতদিন ওকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবেননি কেন ডজ? তবে জিজ্ঞেস করল না। আপনা-আপনিই সে কথায় যাবেন। আর ওটা একটা জরুরি সূত্র। তিন গোয়েন্দাকে রহস্য সমাধানে এগিয়ে দেবে একধাপ।

'কিশোর, ওকে ছেড়ে আসতে হলে তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ডজ। 'আসলে, যেতে হবে আমাদের সবাইকেই। ভাবছি, পর্বতের ওদিকটায় ক্যাম্পিং করতে গেলে কেমন হয়?' এক এক করে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। 'কি বলো?'

কিশোরের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর আর ছেলেমানুষী মনে হলো। একটা গাধাকে ছাড়তে সবাই মিলে যাওয়া! রবিনের দিকে তাকিয়ে দেখল সে-ও ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টিপল কিশোর।

সাথে সাথে বুঝতে পারল রবিন। তিনজনে মিলে একান্তে আলোচনা না করা

পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে মানা করছে গোয়েন্দাপ্রধান'।

ডজের দিকে তাকাল রবিন। 'ঠিক আছে। আমরা জানাব আপনাকে।'

'কখন?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন ডজ। 'কত তাড়া-তাড়ি...'

'যত তাড়াতাড়ি আমরা মনস্থির করতে পারব,' জবাব দিল মুসা। উঠে দরজার দিকে রওনা হলো সে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিশোর, চলো ঘুরে আসি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন কিনা ডজ, কে জানে। চুপ করে রইলেন।

কিশোর আর রবিনও উঠে মুসার পেছনে চলল। বারান্দা থেকে নেমে মাঠের দিকে এগোল তিনজনে। ঘর থেকে যাতে না শোনা যায় এতটা দূরে এসে থামল।

'মনে হয় আসল সময় এসে গেছে,' ঘাসের ওপর বসে বলল রবিন। 'পর্বতে যাওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর সেটার জন্যেই আমাকে প্রয়োজন ডজের। আমার কণ্ঠ তাঁর প্রয়োজন। যাতে শান্ধি পালিয়ে না যায়। কোথাও আমাদেরকে নিয়ে যাবে গাধাটা। পর্বতের কোন জায়গায়, যেখান থেকে এসেছে।'

'কোনখান থেকে এল?' দূরের উঁচু পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'কি আছে ওখানে? স্বর্ণ?'

'কিংবা সিয়েরা মাদ্রের গুপ্তধন,' কিছুটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল রবিন। একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগল। 'তো, কি ভাবছ, কিশোর? যাবে?'

'আমি তো যাবই,' কিশোরের আগেই বলে উঠল মুসা। ক্যাম্পিং ওর ভীষণ ভাল লাগে। রাতে আগুনের ধারে বসে মাংস ঝলসে খাওয়া, খোলা আকাশের নিচে স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে ঘুমানো আহ্, কি মজা! 'তোমরা যাবে না? পথ নিশ্চয় খুব খারাপ হবে।'

'খারাপ মানে?' রবিন বলল। 'খারাপের চেয়ে খারাপ। পাথর আর বালির ছড়াছড়ি।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'তুমি কি বলো?'

বেড়াতে খারাপ লাগে না কিশোরের। যেতে কষ্ট হবে। কি আর করা। রহস্যের সমাধান করতে গেলে খাটুনি তো একটু লাগবেই। যত কষ্টই হোক, ভাবল সে, এই রহস্যের কিনারা করেই ছাড়বে।

'যাব,' রবিনের কথার জবাবে বলল কিশোর। 'চলো, ডজকে গিয়ে জানাই।'

ডজের জন্যে এটা সুখবর। মুসা বলতেই চওড়া হাসি হাসলেন। 'তাহলে কালই রওনা হওয়া যাক, কি বলো?' রাজি হলো তিন গোয়েন্দা।

হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন ডজ। গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন লারেটোতে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। তিন গোয়েন্দা চলে গেল একেক জন একেক কাজে। মুসা গেল লেকে মাছ ধরতে। রবিন বারান্দায় বসল ওর মেকসিকোর ইতিহাস নিয়ে। কিশোর চলল পিরেটোর খোঁজে।

রান্নাঘরে পাওয়া গেল ওকে। একটা ওয়াকি-টকি মেরামত করছে। সব যন্ত্রপাতি খুলে ছড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু জোড়া লাগাতে পারছে না আর।

'নাহ্, আমাকে দিয়ে এসব হবে না!' আনমনেই বিড়বিড় করল লোকটা। 'আমি রেডিওর কি বুঝি? গাধার মত খুলতে গেছি! আমি হলাম গিয়ে ঘোড়ার

রাখাল। ইলেকট্রনিক্সের কি বুঝি?'

'দেখি, আমার কাছে দিন,' হাত বাড়াল কিশোর। 'এসব মেরামত করতে পারি। কি হয়েছিল?'

'বোবা হয়ে গিয়েছিল। একেবারে চুপ।'

'ঠিক করে কি করবেন?'

'ওয়াকি-টকি দিয়ে কি করে? কথা বলব।'

'এখানে এই জিনিস আর কারও কাছে আছে নাকি?' কার সঙ্গে কথা বলতে চায় পিরেটো, ভেবে অবাক হলো কিশোর। লেকের অন্য পাড়ের টাওয়ারটা ছাড়া আশপাশে আর কোন বাড়িই চোখে পড়েনি তার। র‍্যাঞ্চের কয়েক মাইলের মধ্যে নেই।

'জানি না,' জবাব দিল পিরেটো।

'তাহলে ঠিক করতে চাইছেন কেন?'

'আরে! নষ্ট হলে ঠিক করব না?'

তার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর। আর প্রশ্ন না করে জিনিসটা নিয়ে বসল। গোলমালটা কোথায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। মেরামত করতে সাধারণত যে ধরনের তার ব্যবহার হয়, সেটা পেল না। তাই ইলেকট্রিকের তারের ভেতরের সরু তার বের করে নিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'অনেক আমেরিকানের সঙ্গেই আপনার পরিচয় আছে মনে হয়,' কাজ করতে করতে বলল কিশোর। 'অল্প বয়েসী ক'জনের সঙ্গে জানাশোনা আছে?'

'নেই,' গভীর আগ্রহে কিশোরের কাজ দেখছে পিরেটো। 'দারুণ হাত তো তোমার! আমেরিকার সবাই পারে নাকি?'

'সবাই পারে না। কেউ কেউ পারে।' তথ্য জোগাড়ের জন্যে আবার প্রশ্ন করল কিশোর, 'অল্প বয়েসী কোন আমেরিকান এই র‍্যাঞ্চে ছিল নাকি? বেড়াতে-টেড়াতে এসেছিল?'

'কবে?'

'তিন-চার মাসের মধ্যে? শারি যখন এল তখন?'

হাত ওল্টাল পিরেটো। 'কত লোকই তো যায় এপথে। মাঝেসাঝে থামে।'

'ওদের কারও গলার স্বর কি আমার মত ছিল? মনে আছে?'

চেহারার কোন ভাবান্তর হলো না মেকসিকান লোকটার। তবে তার কালো চোখজোড়া হাসছে। 'উত্তর আমেরিকার সমস্ত মানুষকে একরকম লাগে আমার।'

'আমি গলার স্বরের কথা জিজ্ঞেস করেছি। যাই হোক, আপনার কাছে একরকম লাগলেও শারির কাছে নিশ্চয় তা লাগে না।'

'মানুষের চেয়ে বারোর কানের ক্ষমতা অনেক বেশি।'

নাহ্, সুবিধে হচ্ছে না। কিশোর তথ্য জোগাড় করতে চাইছে এটা বুঝে ফেলেছে পিরেটো। কাজেই মুখ খুলছে না। চাপাচাপি করে লাভ নেই।

যন্ত্রটা মেরামত করে জোড়া লাগিয়ে ফেলল কিশোর। সুইচ অন করল। কল সাইন দিয়ে কোন সাড়া মিলল না। অনেক ভাবে অ্যান্টেনা ঘুরিয়ে দেখল, জবাব এল না। তবে ওয়াকি-টকিটা যে কাজ করছে তাতে সন্দেহ নেই। সাড়া যেহেতু

মিলছে না, তার মানে আর কারও কাছে ওয়াকি-টকি নেই। কিংবা হয়তো অন করা নেই।

'হয়ে গেছে,' বলল সে।

'তোমরা আমেরিকানরা বড় চালাক।'

কিছু কিছু ব্যাপারে আমেরিকানরা চালাক বটে, তবে কিছু ব্যাপারে আবার বোকাও, ভাবল কিশোর। যাই হোক, সে শুধু আমেরিকান নয়, বাঙালীও। আগামী দিন সকালে ওই মেকসিকান লোকটার চালাকি ধরতে চাইলে ওর আগেই ঘুম থেকে উঠতে হবে তাকে।

ওয়াকি-টকিটা তুলে নিয়ে কিশোরকে ধন্যবাদ জানাল পিরেটো। তারপর কিশোরের হাতটা ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দিল। 'সময় করে একদিন অনেক কথা বলব তোমার সঙ্গে। একদিন, যখন...' ফোন বেজে ওঠায় বাধা পড়ল তার কথায়। জবাব দেয়ার জন্যে অফিসে চলে গেল। ফিরে এল মুহূর্ত পরেই। 'তোমার ফোন।'

নিশ্চয় ভিকটর সাইমন, ভাবল কিশোর। এখানে আর কারও তাকে ফোন করার কথা নয়।

কিন্তু মিস্টার সাইমন নন। সাড়া দিল একটা মহিলা কণ্ঠ। আমেরিকান। 'কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ। কে বলছেন?'

'তা না জানলেও চলবে। বললেও চিনবে না। তোমাকে একটা জিনিস দেখানো দরকার। তোমার জন্যে খুব জরুরি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। কোন কেস হঠাৎ করে নতুন মোড় নিলে এরকম হয় তার। 'এখানে, র‍্যাঞ্চে চলে এলেই পারেন।'

'না!' র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে ভীত মনে হলো মহিলাকে। 'ডজ মরগানের র‍্যাঞ্চে যাওয়া উচিত হবে না আমার। বিপদে পড়ে যাব।'

'ডজ বাড়িতে নেই। ল্যারেটোতে গেছেন।'

'না, তবু যেতে পারব না,' ভয় কাটাতে পারছে না মেয়েটা। 'অন্য কেউ দেখে বলে দিতে পারে ডজকে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। লেকের অন্য পাড়ে চলে এসো।'

কি করে যেতে হবে বলে দিল মহিলা। র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে কয়েক শো গজ গেলে লেকের পাড়ে একটা নৌকা দেখতে পাবে কিশোর। দাঁড় বেয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে উঠে পড়বে ওপরে। বনের ভেতর দিয়ে গির্জার টাওয়ারের কাছে গেলে ছোট একটা গ্রাম দেখতে পাবে। গ্রামের প্রধান চত্বরে অপেক্ষা করবে মহিলা।

'একা আসবে,' বলে দিল মহিলা। 'কেউ যদি তোমার সঙ্গে থাকে, কিংবা আসার সময় কেউ তোমাকে দেখে ফেলেছে বলে মনে হয় আমার, লুকিয়ে পড়ব। আর আমাকে দেখতে পাবে না।'

'কি দেখাতে চাইছেন?'

জবাব নেই।

কেটে দিয়েছে লাইন।

সাত

বারান্দায় এল কিশোর। একমনে মেকসিকোর ইতিহাস পড়ছে রবিন। সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। 'কি?'

মহিলার কথা জানাল কিশোর।

'হয়তো সেই আমেরিকানের ছবি দেখাবে,' আন্দাজ করল রবিন। 'শারি যার ভক্ত।'

শ্রাগ করল কিশোর। 'তারও এ কথাই মনে হয়েছে। তবে সেটা শুধুই অনুমান।

'আমি আসব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

একা যেতে বলেছে, জানাল কিশোর।

'হুঁম্! তাহলে তো আর কিছু করার নেই। যাও। লোকজন জোগাড় করে রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমার জুডো ব্যবহার করতে হবে আর কি।' হাসল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। নেমে পড়ল বারান্দা থেকে। লেকের দিকে চলল।

লেকের পাড়ে এসে মুসাকে দেখতে পেল না। কোথায় বসল?

নৌকাটা খুঁজে পেল সহজেই। কাঠের ছোট একটা ডিঙি। সীটের নিচে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা দাঁড়। নৌকাটাকে পানিতে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল তাতে। দাঁড়ের আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল দাঁড়টা।

বাইতে শুরু করল সে।

যতটা সহজ হবে ভেবেছিল ততটা হলো না। নাক সোজা রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। কারণটা বুঝতে পারছে। তীরে দাঁড়িয়ে অতটা বোঝা যায় না। পানিতে স্রোতের খুব জোর।

বেশি চাপাচাপি করতে গিয়ে হঠাৎ মট করে ভেঙে গেল দাঁড়টা। একটানে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ভাঙা অংশটাকে। হাতের টুকরোটার দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। পুরানো মনে হয়েছিল তখনই, কিন্তু পচে যে এতটা নরম হয়ে আছে কল্পনাই করতে পারেনি।

দাঁড় দিয়ে নৌকা সোজা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন তো রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। লেজ চুলকালে সেটাকে কামড়ানোর জন্যে কুকুর যেভাবে এক জায়গায় ঘুরতে থাকে তেমনি করে ঘুরতে লাগল নৌকাটা। নানা ভাবে চেষ্টা করে দেখল কিশোর। কোন কাজ হলো না। স্রোতের টানে ভেসে চলল।

স্রোতের টানে লেকের মাঝামাঝি চলে এসেছে নৌকা, দুই তীরই এখন সমান দূরত্বে। স্রোতের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ভাঙা বৈঠা দিয়ে নৌকা বাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল কিশোর। লাভ হচ্ছে না।

সাহায্যের জন্যে চিৎকার করবে কিনা ভাবল। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ? তার চিৎকার পিরেটো কিংবা রবিনের কানে গেলেও আরেকটা নৌকা ছাড়া ওরা এসে সাহায্য করতে পারবে না তাকে।

ছুটে চলেছে নৌকা। লেক বেয়ে গিয়ে পড়বে নদীতে।

সাঁতার ভাল জানে কিশোর। ডাইভ দিয়ে পড়ে ডুব সাঁতার দিয়ে তীরে ওঠার চেষ্টা করতে পারে। মনে পড়ল পিরেটোর হুঁশিয়ারি। পানিতে গোসল করার চেষ্টা কোরো না, কয়েক মিনিটের বেশি এই পানিতে টিকতে পারবে না কোন মানুষ। পানিতে হাত ডুবিয়ে দিয়ে বুঝতে পারল কিশোর, মিথ্যে বলেনি মেকসিকান লোকটা। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি।

যতক্ষণ নৌকায় রয়েছে ততক্ষণ জমে মরার ভয় অন্তত নেই। স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নদীতে। কতক্ষণ লাগবে যেতে?

গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য গ্রামটার কথা ভাবল সে। হয়তো ওখানে কারও নৌকা আছে।

আর কোন উপায় না পেয়ে শেষে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকারই শুরু করল কিশোর। স্প্যানিশ ভাষায়। কিন্তু দুপুরের এই প্রচণ্ড গরমের সময় লেকের তীর নির্জন। একটা মানুষকেও চোখে পড়ল না। ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। কোন মানুষ সাড়া দিল না।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল কিশোর। বুদ্ধি একটা বের করতে হবে। নদীতে হয়তো এমন জায়গা আছে, যেখানে পানির গভীরতা কম। তাহলে হয়তো কোনমতে উঠে যেতে পারবে তীরে।

এখান থেকে বোঝা যাবে না পানি কতটা গভীর। নদীতে গেলে তার পর। মোহনা আর বেশি দূরে নেই। দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নদীটা কোথায়?

তাই তো! কোথায়! উধাও হয়ে গেছে নাকি!

বুঝে ফেলল হঠাৎ। লেকটা সোজাসুজি নদীতে পড়েনি। কারণ লেকের সমতলে নেই নদীটা। তারমানে জলপ্রপাত হয়ে নদীতে ঝরে পড়ছে লেকের পানি। সর্বনাশ!

'কিশোর!'

চমকে ফিরে তাকাল কিশোর। তীরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। সে তাকাতেই ছিপ নাড়ল।

দাঁড় ভেঙে যাওয়ার কথা নিশ্চয় জানে না মুসা। কিন্তু বুঝতে পারছে কি ভয়ানক বিপদে পড়েছে তার বন্ধু। কিশোর দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে পাচ্ছে, তিরিশ ফুট নিচে রয়েছে নদী। প্রচুর পাথর আছে ওখানটায়। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে পানি। নৌকা নিয়ে ওখানে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। পাথরে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ডিঙি···

দৌড় দিল মুসা। লেকের পাড় ধরে প্রপাতের দিকে। যেখান থেকে ঝরে পড়ছে পানি, তার কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল। আর বড় জোর ষাট গজ মত পেরোতে হবে কিশোরকে, তারপরেই পৌঁছে যাবে সে যেখানে রয়েছে সেখানটায়।

সুতোর রিলের ক্যাচটা রিলিজ করে দিল মুসা। ছিপটা তুলে ধরল মাথার ওপর। একটা সুযোগ পাবে সে। মাত্র একটা। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার সময়ই মিলবে না আর। শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। ডিঙিটার অপেক্ষায়।

সামনে চলে এল নৌকা। মাথার ওপর ছিপ ঘুরিয়ে বড়শি আর সীসা বাঁধা

সুতোর মাথাটা যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে দিল লেকের পানির ওপর দিয়ে।

কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সীসাটা। পড়ল গিয়ে ওপাশের পানিতে। হাত বাড়িয়ে সুতোটা ধরে ফেলল সে।

'টেনো না!' সাবধান করল মুসা, 'ছিঁড়ে যেতে পারে! সীসাটা ধরে রাখ শুধু।'

সুতো ধরে পানি থেকে সীসাটা টেনে তুলে ধরে রাখল কিশোর।

খুব হুঁশিয়ার হয়ে আস্তে আস্তে সুতো গোটাতে আরম্ভ করল মুসা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, এমন ভাবে, যাতে টান খুব কম পড়ে। অনেক বড় মাছ যেভাবে খেলিয়ে তোলে অনেকটা তেমনি করে। নাইলনের সুতো যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু তারপরেও যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে।

সুতোয় টান লাগছে, আর একটু একটু করে এদিকে ঘুরে যাচ্ছে নৌকার গলুই।

সুতো আরও কয়েক ফুট গুটিয়ে ফেলতে পারল সে।

মাঝখানের চেয়ে তীরের কাছাকাছি স্রোত অনেক কম। সেখানেই নিয়ে আসার চেষ্টা করছে মুসা।

আরও কিছুটা গোটাল। কমে আসছে নৌকা আর তার মাঝের দূরত্ব।

স্রোতের টান থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে নৌকাটা।

সুতো ছিঁড়ল নৌকাটা তীর থেকে দশ গজ দূরে থাকতে। তবে এখন আর অতটা ভয় নেই।

ভাঙা দাঁড়টা দিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করল কিশোর। কিন্তু দাঁড়ের চ্যাপ্টা মাথার বেশির ভাগটাই ভেঙে যাওয়ায় পানিতে তেমন চাপ রাখতে পারছে না ওটা।

সুতোর টানে যেমন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়েছিল নৌকা, এখনও তেমনিই এগোতে লাগল।

তারপর হঠাৎ করেই ভাঙা ডাণ্ডার মাথা দিয়ে মাটি নাগাল পেয়ে গেল কিশোর। লগি দিয়ে বাওয়ার মত করে বাইতে শুরু করল সে। আরেকটু এগোল নৌকা। পানি ওখানে ফুটখানেক গভীর। লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। গলুই ধরে টেনে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে এল কিনারে।

দৌড়ে এল মুসা। ওকে নৌকাটা ডাঙায় তুলতে সাহায্য করল।

'থ্যাংকস!' এছাড়া বলার মত আর কিছুই তখন খুঁজে পেল না কিশোর।

'আজকে সব চেয়ে বড় মাছটা ধরলাম,' হেসে বলল মুসা। 'পিরেটোকে বলব, তোমাকে যেন শিকে গেঁথে কাবাব বানিয়ে দেয়। লাঞ্চে খেতে পারব।'

'আরেকটু হলেই কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।'

পায়ের শব্দ শোনা গেল। দু'জনেই দেখল দৌড়ে আসছে রবিন। কিশোর ওকে রেখে চলে আসার পর পড়ায় আর মন বসাতে পারেনি। কৌতূহল চাপতে না পেরে কিশোর কি করে দেখার জন্যে চলে এসেছিল লেকের ধারে। দেখেছে, অসহায় হয়ে নৌকায় করে ভেসে চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। ওকে বাঁচানোর কোন বুদ্ধিই বের করতে পারেনি সে।

'দারুণ, মুসা,' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'একটা কাজ

করেছ। হলিউডের পরিচালকরা ওরকম একটা দৃশ্যের শট নিতে পারলে বর্তে যেত।'

হাসল মুসা। 'আমি তো ভেবেছিলাম দ্য ট্রেজার অভ দ্য সিয়েরা মাদ্রের শুটিং হবে, তুমি বানিয়ে দিলে জ'জ! মুশকিল হলো, এই কথাটা কিছুতেই শোনানো যাবে না মেরিচাচীকে। বাহবা নিতে গিয়ে বকা খেয়ে মরব, কেন তোমাকে একলা যেতে দিলাম এই জন্যে।'

কিশোরও হাসল। 'এই না হলে বন্ধু!' বসে পড়ে ভেজা জুতো আর মোজা টেনে টেনে খুলছে সে। প্যানিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ছিল, তাতেই নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। ভাগ্যিস সাঁতরে তীরে পৌঁছার চেষ্টা করেনি।

রিলের হাতল ঘুরিয়ে সুতোটা গুটাতে লাগল মুসা। রবিনকে বলতে লাগল কিশোর, কি ঘটেছে। মুসাও শুনছে ওর কথা। টেলিফোনে অচেনা কণ্ঠ। তারপর দাঁড় ভেঙে যাওয়া। কি যেন একটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে তার।

জিজ্ঞেস করল মুসা, 'স্রেফ ভেঙে গেল?'

'গেল। এতটাই পচা ছিল। ইচ্ছে করেই হয়তো রেখেছে ওই জিনিস।' ডাণ্ডার মাথা পরীক্ষা করে দেখে বলল কিশোর, 'যাতে জোরে চাপ লাগলেই ভেঙে যায়। আমাকে খুন করতে চেয়েছে। এমন কায়দা করেছে, সবাই যাতে মনে করে ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা।'

রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কাউকে দেখেছ লেকের পাড়ে?'

নৌকার কিনারে বসেছে রবিন। মাথা ঝাঁকাল। 'দেখেছি। অন্য পাড়ে। একজন মহিলা। একপলক দেখলাম, তারপরেই হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। মনে হচ্ছিল, তোমার ওপর নজর রেখেছিল সে। তুমি তখন প্রপাতের দিকে চলেছ।'

'দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। বলেই মাথা নাড়ল, 'না না, বলার দরকার নেই, বুঝতেই পারছি। সেই মেকসিকান মহিলা। লাল শাল পরেছিল যে।'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না। ও নয়। আমার কাছে একে আমেরিকান মনে হয়েছে। নীল জিনস পরনে, গায়ে হালকা রঙের শার্ট আর…'

'আর সোনালি চুল,' বলে দিল কিশোর।

অবাক হলো রবিন। 'অতি-মানবিক কোন ক্ষমতা আছে নাকি তোমার!'

আট

পরদিন সকালে পর্বতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা।

জীপের পেছনে বেঁধে লারেটো থেকে একটা হর্স বক্স নিয়ে এসেছেন ডজ। চাকা লাগানো, চারপাশে কাঠের বেড়া দেয়া একটা ঠেলাগাড়ির মত। মাঠ থেকে একটা ঘোড়া ধরে নিয়ে এসেছে পিরেটো। ওটার পিঠে জিন বাঁধতে ওকে সাহায্য করছে মুসা। ঘোড়াটা খুব শান্ত। মুসা যখন ওটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল ট্রেলার হোমে তোলার জন্যে, একটুও বাধা দিল না।

ওটার সঙ্গে রইল সে, পরিচিত হওয়ার জন্যে। গলা চাপড়ে আদর করল, ডলে ডলে চকচকে করে দিতে লাগল চামড়া। পিরেটো আর কিশোর এই সময় গেল

শারিকে আনার জন্যে। মেকসিকান লোকটার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলো গোয়েন্দাপ্রধান। সাবধানী পিরেটোর কাছ থেকে কোনভাবে যদি কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারে।

'লেকের ধারে ওই যে নৌকায় উঠেছিলাম আমি,' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওটা কি সব সময়ই ওখানে থাকে?'

'নৌকা তাহলে আর কোথায় রাখবে? রান্নাঘরে?'

'ওটা কার?'

'এই র‍্যাঞ্চের।'

'কেউ কি ব্যবহার করে?'

'মাঝেসাঝে।'

'কি কাজে?'

'মাছ ধরার কাজে।'

ভীষণ চালাক লোকটা। এভাবে ওর কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করতে পারবে বলে মনে হলো না কিশোরের। তবে একটা কথা জানতে হবে যে করেই হোক।

লেকের অপর পাড়ে সোনালি চুলওয়ালা যে আমেরিকান মহিলাকে দেখেছে, নিশ্চয় সে-ই ফোন করেছিল ওকে, সন্দেহ নেই। হতে পারে ওই মহিলাই পচা দাঁড়টা রেখেছিল। কিন্তু তাহলে ওই দাঁড় দিয়ে নৌকাটাকে এপাড়ে আনল কি করে? আর সে নিজেই বা ফিরে গেল কিভাবে?

'ওপাড়ের গাঁয়ে যেতে চাইলে,' চেষ্টা চালিয়ে গেল কিশোর, 'কিভাবে যাবেন?'

'হেঁটে।'

'কিন্তু লেক তো অনেক গভীর। হাঁটা যায়?'

'ওদিকটায় অত গভীর নয়।' নদীর উজানের দিকে দেখাল পিরেটো। 'তাছাড়া বড় বড় পাথর আছে, ওগুলোর ওপর দিয়েই হাঁটা যায়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জবাব এটাই হবে। ওই পাথরের ওপর দিয়েই হেঁটে পার হয়ে গেছে আমেরিকান মহিলাটা। আর রাতের বেলা বারান্দায় ওর সঙ্গেই হয়তো কথা বলেছিল পিরেটো। তারমানে ওকে চেনে সে।

'গাঁয়ে আপনার কোন বন্ধু আছে নাকি?'

'একজনকে চিনি। বার আর ক্যানটিনার মালিক, আমার খালাত ভাই।'

'কোন আমেরিকানকে চেনেন না? সোনালি চুলওয়ালা একজন মহিলা?'

শারি যে মাঠে থাকে ওটার গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ফিরে তাকাল পিরেটো। 'বোকামি করছে ও। সে কথা বলেছিও ওকে। ভীষণ ভয় পেয়েছে। ভয় পেলে লোকে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। তোমার যে কোন ক্ষতি হয়নি, তাতে আমি খুশি। কিন্তু...'

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল পিরেটো। 'পর্বতে গিয়ে সাবধানে থাকবে।' সতর্ক করে দিল সে। 'ভয়ানক বিপদের জায়গা।'

কিশোরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসছে শারি।

দরজা খুলে দেয়া হলো। কিশোরের গায়ে নাক ঘষতে লাগল জানোয়ারটা।

ওটার কানের পেছনটা চুলকে দিল কিশোর। ও-যাই করুক, চুপ করে থা
বারোটা। কিন্তু আর কাউকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। পিরেটোকেও না। দূ
দাঁড়িয়ে আছে সে। কিশোরকে বলল, 'জিন আর লাগাম ছাড়া চড়তে পারবে
কিন্তু পরানোটাই হলো মুশকিল। যতই পছন্দ করুক তোমাকে, যেই জিন পরাবে
মাটিতে গড়াতে শুরু করবে, পিঠ থেকে ওটা খুলে না ফেলে আর থামবে না।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'তাই নাকি?'

জীপটা রসদপত্র দিয়ে প্রায় ভরে ফেলেছেন ডজ। বীন আর চালের বস্ত
চিনি, কফি ও প্রয়োজনীয় আরও খাবার নিয়েছেন। ঘোড়ার জন্যে নিয়েছে জই
স্লীপিং ব্যাগ আর রাইফেল নিয়েছেন। মালপত্রের ফাঁকে জায়গা নেই বললেই চলে
ওখানেই কোনমতে গাদাগাদি করে বসেছে মুসা আর রবিন। কিশোর বসে
ডজের পাশে। হাতে লম্বা একটা দড়ি, এক মাথা বাঁধা রয়েছে গাধার গলায়
জীপের পেছন পেছন আসছে বারোটা।

গেট থেকে বেরিয়ে এসে ফিরে তাকাল কিশোর। দাঁড়িয়ে রয়েছে পিরেটো
কিশোর তাকাতে হাত তুলল। কি বোঝাতে চাইল? সাবধান করল? না গুডবাই?

ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ। চার-পাঁচ মাইলের বেশি গতি বাড়াচ্ছে
ডজ। যাতে শারির আসতে অসুবিধে না হয়।

বালি আর পাথর বিছানো রয়েছে পথ জুড়ে। এক ঘন্টা চলার পর সরু হ
এল পথ। ঢুকে গেল পাইন বনের ভেতরে।

আরও এক ঘন্টা পর জীপ থামালেন ডজ, ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্যে। পা
পড়ার শব্দ কানে আসছে। দড়ি ছোটানোর জন্যে টানাটানি শুরু করল শারি।

'মনে হয় পানি খেতে চাইছে,' কিশোর বলল। 'আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে। নই
পালাতে পারে।'

বারোটাই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ছোট একটা পার্বত্য নালার কাছে
টলটলে পরিষ্কার পানি। দেখার পর কিশোরেরও খেতে ইচ্ছে করল। পিপা
অবশ্য আগেই পেয়েছে। পিরেটোর কাছে শুনেছে, সিয়েরা মাদ্রের ঝর্না থেকে পা
খেতে মানা নেই, তবে বদ্ধ জলাশয় থেকে খাওয়া একদমই উচিত নয়। হাঁটু গে
বসে আঁজলা ভরে পানি তুলে খেতে শুরু করল সে। তার পাশেই মুখ নামি
খাচ্ছে শারি।

পানি খাওয়া শেষ করে পাতা চিবুতে লাগল বারো। ওর জন্যে সঙ্গে করে কি
আনা হয়নি। ঘোড়ার মত বেছে খায় না বারো, কাজেই ওগুলোর জন্যে তেম
ভাবনা নেই। ছাগলের মত যা খুশি খেতে পারে। পিরেটো একথা বলে
কিশোরকে। ঠিকই বলেছে। এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

মিনিট কয়েক ঘাস আর লতাপাতা খেল শারি। এই সময় শোনা গেল ডজে
ডাক। অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বারোটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানতে লাগ
কিশোর। চেঁচিয়ে বলল, 'আয়, আয়, দেরি হয়ে গেল!' কানেই তুলল না ওটা
পেট না ভরা পর্যন্ত খেয়েই চলল।

রেগে গেলেন ডজ, কিন্তু কিছু বলারও নেই। বারোটা আসতে না চাই
কিশোর কি করবে? সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর। স্টার্ট দি

অযথাই এক্সিলারেটর বাড়িয়ে গোঁ গোঁ করালেন কয়েক সেকেণ্ড। খাবার বানিয়ে প্যাকেট করে দিয়েছিল পিরেটো। সেগুলো দিয়ে লাঞ্চ করেছে সবাই। রবিন, মুসা আর ডজ খেয়েছেন। কিশোর কেবল বাকি। তার স্যাণ্ডউইচগুলো নিয়ে বড় বড় কামড় দিয়ে খেতে শুরু করল। জীপ ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। একহাতে গাধার দড়ি ধরে রেখে আরেক হাতে খাচ্ছে কিশোর।

আরও ঘণ্টা তিনেক চলার পর বালিতে ঢাকা সরু পথও অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এখানে জীপ রেখে যেতে হবে আমাদের,' ডজ বললেন।

মালপত্র নামাতে লাগল ওরা। বাক্স থেকে ঘোড়াটাকে নামিয়ে আনল মুসা। হর্সবক্স সহ জীপটাকে পাইন বনের ভেতরে নিয়ে গেলেন ডজ। ডালপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো দুটো গাড়িকেই। ভারি ভারি বোঝাগুলো তোলা হলো ঘোড়ার পিঠে। শারির কাঁধে স্লীপিং ব্যাগগুলো তুলে দিয়ে বেঁধে ফেলল কিশোর।

'তুমি আগে আগে যাও,' কিশোরকে বললেন ডজ। 'বারোটাকে ঢিল দিয়ে দাও। ও যেদিকে যায় সেদিকেই যাবে। ওটাই পথ দেখাক।'

চট করে বন্ধুদের দিকে তাকাল একবার কিশোর।

আবার শুরু হলো চলা। শারির পিঠে বসল কিশোর। যার যার ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে হেঁটে চলল রবিন আর মুসা। সবার পেছনে ঘোড়ায় চেপে আসছেন ডজ।

কয়েক মিনিট চলার পরেই বুঝে গেল কিশোর, গাধার পিঠে চেপে যাওয়াটা কতটা কষ্টকর। একটা মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হতে পারছে না।

দেখতে দেখতে গাছপালার মাথার ওপরে উঠে এল দলটা। ঢালের গায়ে এখন আর গাছ নেই, বন নিচে পড়ছে ক্রমশ। খাড়া পাথুরে ঢালে হাঁটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে রবিন আর মুসার। বার বার পা পিছলে যাচ্ছে আলগা পাথরে।

শারির কিছুই হচ্ছে না। পিরেটো বলেছে, পাহাড়ি ছাগলের মতই পাহাড় বাইতে পারে বারোরা। তা তো হলো, কিন্তু কিশোর তো আর ছাগল নয়, বারোও নয়, কাজেই পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া এড়ানোর জন্যে শারির গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো ওকে। ছেড়ে দিলে গড়িয়ে পড়ে যাবে পিঠ থেকে, এবং তারমানে পাহাড় থেকেও গড়িয়ে পড়া।

কষ্ট হচ্ছে কিশোরের, তবে ডজের চেয়ে কম। বারোর মত পাহাড় বাওয়ায় দক্ষ নয় ঘোড়াটা। ঠিকমত ঠিক জায়গায় পা ফেলতে পারছে না। মাঝে মাঝেই এগোতে না পেরে থেমে যাচ্ছে। পিঠ থেকে নেমে তখন এগোনোর জন্যে ওটাকে ঠেলতে হচ্ছে ডজকে। কখনও বা লাগাম ধরে টেনে কোন উঁচু পাথর পার করিয়ে আনছেন। ফলে সময় নষ্ট হচ্ছে। খানিক পরেই দেখা গেল মুসা আর রবিনের প্রায় আধ মাইল পেছনে পড়ে গেলেন তিনি।

সবার আগে রয়েছে কিশোর। আর সবাই অনেক পেছনে। ওদেরকে এগিয়ে আসার সময় দেয়ার জন্যে শারিকে থামতে বলল সে, 'হুয়া! হুয়া!'

শুনতেই পেল না যেন বারোটা।

তখন ওটার কানের কাছে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'হুয়া! হুয়া!'

থামার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই বারোটার। অনেক দিন পর পাহাড়ে চড়ার সুযোগ

পেয়েছে বোধহয়, এগিয়ে চলেছে মহা আনন্দে। কারও জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজনই বোধ করছে না। লাগাম টেনে বোঝাতে চাইল কিশোর, ওর হুকুম মেনে চলা উচিত। পাত্তাই দিল না বারো।

তারপর কিশোর যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, এই সময় হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল।

এতই আচমকা, আরেকটু হলেই পিঠ থেকে পড়ে যেত কিশোর। যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে জানোয়ারটা। একটা সমতল জায়গার কিনারে এসে পৌঁছেছে। পাথরের ছড়াছড়ি, তার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে ঘাস। ঠিক সামনেই মাথা তুলেছে একগুচ্ছ ক্যাকটাস।

কিশোর আন্দাজ করল, আবার খেতে চায় শারি। শরীরটা ঢিল করে দিয়ে লাফিয়ে নামল পিঠ থেকে। তার নিজের বিশ্রামের জন্যেও জায়গাটা চমৎকার। ক্যাকটাসের পাশে একটা চ্যাপ্টা মসৃণ পাথর দেখতে পেল। ওটার দিকে এগোতে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে গলা বাড়িয়ে দিল শারি, পথ আটকাল কিশোরের। পাশ কাটিয়ে সে যখন এগোনোর চেষ্টা করল, তার শার্টের ঢোলা জায়গায় কামড়ে ধরল ওটা।

রেগেই গেল কিশোর। 'এই, কি হয়েছে? কি করতে চাস? ঘাস খেতে কি মানা করেছি নাকি তোকে!' টেনে শার্টটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু ধরে রাখল শারি।

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। বারোর সঙ্গে পারবে না। ওটা যখন কিছু করবে বলে গোঁ ধরে, কারও সাধ্য নেই সেকাজ থেকে বিরত করে। আপাতত যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে চাইছে। কিশোরকেও থাকতে বলছে। কাজেই নড়ানো সম্ভব না।

যখন ওটার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে আদর করল কিশোর, তখন ছাড়ল শার্ট। কিন্তু পথ ছাড়ল না। যেতে দিতে চায় না কিশোরকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাকটাসের জটলাটার দিকে।

এই সময় বারোটার কানের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের।

ঘাড়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে রয়েছে।

ঘাড়ের বড় বড় রোমগুলো লেপটে নেই, সাধারণত যেভাবে থাকে। দাঁড়িয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপছে থিরথির করে।

নয়

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চোখ ক্যাকটাসের দিকে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন আর মুসা।

'কি হয়েছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'বুঝতে পারছি না। কিছু দেখে ভয় পেয়েছে শারি।'

পা বাড়াতে গেল রবিন। ধরে ফেলল তাকে মুসা। বারোর ঘাড়ের রোম যে দাঁড়িয়ে গেছে সেটা সে-ও লক্ষ্য করেছে। 'দেখি, কি করে ও।'

কিছুই করল না শারি। তাকিয়েই রয়েছে ক্যাকটাসের দিকে। পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল ডজের ঘোড়া। 'কি হয়েছে?'

শব্দটা কানে এল এই সময়। মৃদু একটা খড়খড়। ওদের কানে শব্দ পৌছার আগেই জেনে ফেলেছে বারোটা, সামনে মারাত্মক বিপদ।

শব্দটা আসছে ক্যাকটাসের পেছনের একটা পাথরের ওপাশ থেকে। কিসে করছে? আবার হলো শব্দ, আরও জোরাল। এবার আর খড়খড় নয়, অনেকটা মৌমাছির গুঞ্জনের মত।

ঘোড়াটার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন ডজ। জোরে শ্বাস টানলেন একবার। হাত বাড়ালেন রাইফেলের দিকে। 'র‍্যাটল স্নেক! ক্যাকটাসের পেছনেই! ভয় দেখিয়ে খোলা জায়গায় বের করে আনতে হবে, যাতে গুলি করতে পারি।'

পাথর কুড়িয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হলো। ক্যাকটাসের দিকে রাইফেল তুলে ধরলেন ডজ।

'মার!' বলে উঠল মুসা।

একই সঙ্গে পাথর ছুঁড়ল তিনজনে। থেমে গেল গুঞ্জন। তবে নীরব হলো না।

জোরাল খটাখট আওয়াজ করে ক্যাকটাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাপটা। চার ফুট লম্বা। চ্যাপ্টা মাথাটা ওপরে তোলা। সাংঘাতিক দ্রুত গতি। শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে পলক ফেলতে না ফেলতে ছুটে আসছে।

লাফিয়ে পেছনে সরে এল তিন গোয়েন্দা।

গুলি করলেন ডজ।

মনে হলো, লাগেনি। লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে আবার আসতে লাগল।

তাকিয়ে রয়েছে যেন রবিন। সোজা তারই দিকে আসছে সাপটা। গোল গোল চোখ, লম্বা জিভটা দ্রুত বেরোচ্ছে আর ঢুকছে, লেজটা তুলে ধরা। লেজের ডগায় অনেকগুলো হাড় বোতামের মত একটার ওপর আরেকটা আলগা ভাবে বসানো, বাড়ি লেগে লেগে ওই অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। সরে যেতে চাইছে, কিন্তু পা উঠছে না। সম্মোহিত করে ফেলেছে যেন তাকে সাপটা।

রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ হলো। রাইফেল তুললেন ডজ।

কিন্তু ট্রিগার টেপার সুযোগ পেলেন না। নলের সামনে রয়েছে শারি, ওটার গায়ে গুলি লাগতে পারে।

চ্যাপ্টা হয়ে একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে যেন বারোর কান। ঘুরছে। সাপটা যতই এগিয়ে আসছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে ওটা। কিন্তু রবিনের মতই যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে।

ফনা আরও উঁচু হল সাপটার। ছোবল মারার জন্যে প্রস্তুত।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল হঠাৎ শারি। পেছনের দুই পা তুলে লাথি চালাল।

সাপের শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় আঘাত হানল এক পায়ের লাথি। উড়ে গিয়ে বিশ ফুট নিচে পাথরের ওপর পড়ল ওটা। একটা সেকেণ্ড নিথর হয়ে পড়ে রইল, যেন মরে গেছে। রবিনও তাই ভেবেছিল। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নড়ে উঠল ওটা। পিছলে গিয়ে ঢুকে পড়ল পাথরের ফাঁকে।

স্যাডল হোলস্টারে রাইফেলটা ঢুকিয়ে রাখলেন ডজ।

কেউ কথা বলল না। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। তারপর, নীরবে আবার পা বাড়াল।

সামনের দিকে এগোল না আর শারি। উপরেও উঠল না। সমতল জায়গাটাকে ঘুরে এগোল। আবার জঙ্গল চোখে পড়ল কিশোরের। তাড়াহুড়ো করে সেদিকে এগিয়ে চলল বারো-টা। মূল পথ থেকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু থামানোর চেষ্টা করল না কিশোর। যেদিকে খুশি যাক। ডজ বলেছেন ওটাকে ওটার ইচ্ছের ওপরই ছেড়ে দিতে।

বনে ঢুকে কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেল শারি। ওটার গলা চুলকে দিল কিশোর।

'আর কিচ্ছু বলব না তোকে,' বলল সে। 'তোর ইচ্ছে মত চলবি। বুঝে গেছি, এখানে আমার চেয়ে তোর বুদ্ধি অনেক বেশি।'

মুসা আর রবিন এল। ওদের পেছনে এলেন ডজ। চারপাশে তাকিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, রাতে ক্যাম্প ফেলার জন্যে চমৎকার জায়গা বেছেছে বারো। প্রচুর লাকড়ি আছে, সবুজ ঘাস আছে। কাছেই একটা সুন্দর ঝর্না, কিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেখানে।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমে গেল। শার্টের ওপরে সোয়েটার পরে নিল তিন গোয়েন্দা। লাকড়ি জোগাড় করে চমৎকার একটা আগুনের কুণ্ড বানিয়ে ফেলল মুসা। তারপর ঘোড়া থেকে মালপত্র নামাতে সাহায্য করল ডজকে।

শারির পিঠ থেকেও বোঝা নামিয়ে ফেলল কিশোর। জিন খুলে নিল। ঘাস-পাতা খাওয়াল, ঝর্নার ধারে নিয়ে গেল পানি খাওয়াতে। তারপর সে আর রবিন মিলে রান্না করতে বসল। বড় একটা পাত্রে চাল আর বীন নিয়ে সিদ্ধ করে নিল।

এই জিনিস খাওয়া যায়! বিরস দৃষ্টিতে তাকাল ওগুলোর দিকে কিশোর। কিন্তু কি আর করা। বেঁচে থাকতে হলে খেতেই হবে। এই খাবারে দু'জন লোক কিছুই মনে করল না। একজন ডজ, তাঁর অভ্যাস আছে, আরেকজন মুসা, যার কোন খাবারেই অরুচি নেই।

খেতে খেতে ভাবছে কিশোর—আর কোন সন্দেহ নেই, সাংঘাতিক রহস্যময় একটা কেস পেয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। সমাধান করতে ভালই লাগবে। রহস্যটার কথা ভাবতে ভাবতে কোন্ দিক দিয়ে যে চাল আর বীন সেদ্ধ গিলে শেষ করে ফেলল সে, খেয়ালই রইল না।

খাওয়া শেষ করে জুতো খুলে ফেলল রবিন। পায়ের পাতায় হাত বোলাতে লাগল। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেছে। ফোসকাও পড়েছে।

'আর কদ্দূর যেতে হবে?' ডজকে জিজ্ঞেস করল সে।

তীক্ষ্ণ হলো ডজের দৃষ্টি। 'কেন, তোমার ভাল্লাগছে না?'

রবিনের দৃষ্টি আরও বেশি তীক্ষ্ণ হলো। 'এভাবে এগোনোর কথা কিন্তু ছিল না। ছিল, শারির খুরের ব্যবস্থা করার কথা। ওকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে যাওয়ার কথা। এমন কোথাও যেখানে ওর খুর ঠিক থাকবে। এখানে প্রচুর পাথর আর পাহাড় আছে। জায়গাটা ভালও লাগছে মনে হয় ওর। তাহলে আর দেরি কেন?'

রূঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বলল সে। ডজের মিথ্যে বলা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে

গেছে। লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে চায় ওরা কচি খোকা নয় যে এভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে আর অনর্গল মিথ্যে বলে বলে ধোঁকা দেবেন। বোঝাতে চায়, শারির খুর নিয়ে যে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ডজের, এটা বুঝে গেছে ওরা।

'হ্যাঁ,' রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা, 'এটা শারির জন্যে চমৎকার জায়গা। পাহাড়ের ঢালে কিছু কিছু জায়গা তো দেখলাম লোহা ঘষার উখার চেয়েও ধার। এখানেই ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?'

সাথে সাথে জবাব দিলেন না ডজ। কয়েকটা ডাল ছুঁড়ে দিলেন আগুনে। 'বারোটা নিজেই বুঝিয়ে দেবে কোথায় ওকে ছাড়তে হবে। যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলেছে। সেখানে পৌঁছলেই থামবে।'

'হোম, সুইট হোম,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'বাড়ির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ও, একথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?'

'বলা কঠিন,' অধৈর্য কণ্ঠে জবাব দিলেন ডজ। 'কখনও কখনও বুনো বারোরা বাড়ির কাছাকাছিই থাকতে চায় সব সময়। কেন, কে জানে!'

এখনও যে মিথ্যে বলছেন ডজ, বুঝতে পারছে কিশোর। রবিন আর মুসাও পারছে।

'তাহলে বাড়ি থেকে অতদূরে র‍্যাঞ্চে গিয়ে উঠল কেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা।

'বুনো বারোরা অনেক সময়ই দলছুট হয়ে দূরে চলে যায়।' তারপর আবার একই কথা বললেন ডজ, 'কেন, কে জানে!'

এটাও মিথ্যে কথা, ভাবছে কিশোর। দলছুট হয়ে নিছক খেয়ালের বশে র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির হয়েছে বারো, কিছুতেই বিশ্বাস করে না সে। কেউ ওকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। এমন কেউ, যাকে বিশ্বাস করে, পছন্দ করে শারি। সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিল। হয়তো ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল ওই লোক। এবং যার কণ্ঠ কিশোরের মত।

ঘাস খেতে খেতে আগুনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বারো-টা। ওটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে ডজের। শেষে আর থাকতে না পেরে কিশোরকে বললেন, 'অনেক খেয়েছে। এবার বেঁধে ফেল। রাতে যেন ছুটতে না পারে।' জোর করে হাসি ফোটালেন চেহারায়। 'নইলে আবার কি খেয়াল হয় কে জানে! র‍্যাঞ্চে ফিরে চলে যেতে পারে। বারোর কথা কিছুই বলা যায় না।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। শারির পিঠে চড়ার সময় বুঝতে পারেনি, কতটা ধকল গেছে, এখন পারছে। এত শক্ত হয়ে গেছে পায়ের পেশী, ঠিকমত দাঁড়াতেই পারছে না। পায়ের পাতায় যেন কাঁটা বিঁধেছে, এরকম ভঙ্গিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানোয়ারটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আদর করে চাপড় দিল পিঠে। বলল, 'দূরে যাসনে। আমার কাছাকাছি থাকবি।'

'ওসব বলে লাভ হবে না,' ডজ সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। 'গাধা গাধাই। ওটাকে বেঁধে ফেল, গাছের সঙ্গে।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। ডজের মুখোমুখি। মাথা নাড়ল। 'না। রাতে পিপাসা লাগতে পারে ওর। পানি খেতে যেতে পারবে না বেঁধে রাখলে।'

'পানি আর কত খাবে? যা খাওয়ার খেয়েছে।'

রাখঢাকের সময় শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই নমনীয় হলো না কিশোর। 'বেঁধে রাখতে চাইলে আপনি যান। দেখুন ছুঁতে দেয় কিনা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। চলার সময় বস্ হয়ে যায় বারোটা, কিন্তু এখন বস্ হলো কিশোর। সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইল। সে যা বলবে তাই হবে।

'বেশ,' অবশেষে নরম হলেন ডজ। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকলেন স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে। 'আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ তুমি আছ, কাছাকাছিই থাকবে বারোটা।'

'কেন?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার এ বিশ্বাস হলো কেন? আমার প্রতি কেন এত আকর্ষণ গাধাটার?'

'কুইয়েন সাবে! মেকসিকানদের ভাষায়ই বললাম।' কাত হয়ে শু'লেন ডজ। চোখ মুদল। মানে করে দিল কথাটার, 'কে জানে!'

অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে চলল কিশোর। যাওয়ার সময় তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রবিন।

স্লীপিং ব্যাগে ঢুকল কিশোর।

ঘুমিয়ে পড়ল চারজনে।

অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। আগুন নিভে গেছে। চোখে ঘুম। প্রথমে বুঝতে পারল না কি কারণে ঘুমটা ভাঙল। তারপর শুনতে পেল শব্দ।

গাধার ডাক।

শারি!

একভাবে পড়ে থেকে শক্ত হয়ে গেছে শরীর। কোনমতে বেরিয়ে এল স্লীপিং ব্যাগের ভেতর থেকে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল ঝর্নার দিকে।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল টর্চের আলো। ওপরে, নিচে, চক্রাকারে নড়ছে আলোক রশ্মি। সেই আলোয় প্রথমে দেখল শুধু বারো-টাকে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠছে বার বার, সামনের পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড খেপে গেছে।

ক্ষণিকের জন্যে স্থির হল আলো, চোখে পড়ল মহিলাকে। একহাতে টর্চ, আরেক হাতে বারোর দড়ি, টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দড়িটা ফাঁসের মত করে পরিয়ে দিয়েছে শারির গলায়। কিশোরের ভয় হলো, দম না আটকে যায় টানাটানিতে।

আবার চিৎকার করে উঠল শারি। গলায় দড়ি আটকানো থাকায় শব্দটা কেমন ভোঁতা হয়ে গেল। আবার লাফিয়ে উঠল ওটা। সামনের পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করল অচেনা আগন্তুককে। একই সঙ্গে টেনে ছোটানোর চেষ্টা করছে গলায় লাগানো দড়ি।

সাপটার কি গতি করেছে, দেখেছে কিশোর। আশঙ্কা হলো মহিলার জন্যে। ওই লাথি যদি মাথায় লাগে, খুলি ভেঙে ঘিলু বেরিয়ে যাবে।

'ছেড়ে দিন!' চিৎকার করে বলল সে।

ছুটতে শুরু করল কিশোর। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'শারি, চুপ কর, শারি! শান্ত হ!'

দড়ি ছেড়ে দিয়েছে মহিলা।

টান বন্ধ হয়ে যেতেই আবার চারপায়ের ওপর স্থির হলো শারি। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। ওটার নাকে হাত বুলিয়ে দিল সে। গলার দড়িটা দেখল। আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যাঁচকা টানে ঢিল করে দিল ফাঁসের বন্ধনী। আবার স্বাভাবিক ভাবে দম নিতে পারল শারি। মহিলার দিকে তাকাল কিশোর।

নিভে গেছে টর্চ।

অন্ধকার হয়ে গেছে আবার। ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল কিশোরের। পালিয়ে যাচ্ছে মহিলা। ঠিক এই সময় কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন। 'শারি অমন চেঁচামেচি করল কেন?'

'ওকে চুরি করতে চেয়েছিল,' জানাল কিশোর। 'এক মহিলা...'

'খাইছে!' মুসা বলে উঠল। 'আবার সেই সোনালি চুল! তোমাকে যে খুন করতে চেয়েছিল! সে এসেছে বারো চুরি করতে?'

'না।' মাথা নাড়ল কিশোর। 'টর্চের আলোয় আবছাভাবে দেখেছি তাকে। মুহূর্তের জন্যে। তবে চিনতে অসুবিধে হয়নি। সেই মেকসিকান মহিলা, বাসে যাকে দেখেছি। লাল শাল। কালো বেণি।'

দশ

পরের দুটো দিন প্রথম দিনের মতই একটানা পথ চলল ওরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাইলের পর মাইল, চলে চলে সিয়েরা মাদ্রের আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগল। এই পর্বতমালার যেন আর শেষ নেই, চলেছে তো চলেছেই। অনেক কষ্টে ঢাল বেয়ে যখন ওঠে, ভাবে ওপারে আর কিছু নেই। কিন্তু চূড়ায় উঠে দেখে ঠিকই মাথা তুলে রেখেছে আরেকটা পাহাড়।

মাঝে উপত্যকা। কোনটা সরু, কোনটা চওড়া। একখানে কয়েক মাইল ধরে চলল পাইনের বন। তারপর, সেই বন পেরিয়ে, আরেকটা ঢাল বেয়ে উঠে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে এল একসময়, ওপরে রুক্ষ পাথুরে ঢাল প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে।

'ভাগ্যিস এখন গরমকাল,' মুসা বলল। পাথর মাড়িয়ে ওঠার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে অনেকখানি, পর্বতের খাড়াইয়ের জন্যে। 'শীতকাল হলে তুষারেই ডুবে যেতাম।'

'তাতে মন্দ হত না,' রবিন বলল। দরদর করে ঘামছে পরিশ্রমে। কপাল থেকে একফোঁটা গড়িয়ে নামল চোখের পাতায়। 'এই গরম তো আর লাগত না।'

ওদের দিন শুরু হয় এখানে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। সকালে নাস্তা সারে বীন আর চাল সেদ্ধ দিয়ে, দুপুরে লাঞ্চে ঠাণ্ডা বীন আর চাল সেদ্ধ—সকালে খাওয়ার পর যা বেঁচে যায়. রাতে আবার একই খাবার, গরম গরম, নতুন রান্না করে। মহা

বিরক্তিকর। ঘেন্না ধরে গেছে কিশোরের। রবিনের তো এখন দেখলেই বমি আসে। মুসারও আর ভাল লাগছে না।

ফিরে যাওয়ার কথা বলল রবিন আর মুসা। কিন্তু গোঁ ধরে আছে কিশোর। এই রহস্যের শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। দেখাই যাক না, কোথায় ওদেরকে নিয়ে যায় শারি। তবে, আর দু'চারদিন ওই ভয়াবহ খাবার খেতে হলে তারও মনোবল ভেঙে যাবে।

দিনে তিন-চার বার করে খাওয়ার জন্যে থামে শারি। অন্যদেরকেও থামতে হয় বাধ্য হয়ে। এই থামাটাকে স্বাগতই জানায় তিন গোয়েন্দা। বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায়। ডজ তো এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে নারাজ। তবে একটা সুবিধে হয় তাঁর এতে। ঘোড়াটাকে নিয়ে অনেক পেছনে পড়ে যান তো, এগিয়ে আসতে পারেন। প্রচুর জই খাওয়ানো হয় ঘোড়াটাকে, তার পরেও প্রতিদিনই একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে ওটা। মাঝে মাঝে মাইল খানেক পেছনে পড়ে যায়। রবিন আর মুসার মত পা টেনে টেনে চলে তখন।

এ রকমই একটা বিশ্রামের সময় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, ঘাস চিবুচ্ছে শারি। রবিন বলল, 'ওই মহিলাগুলো কেন এর মধ্যে ঢুকেছে, বুঝতে পারছি না। প্রথমে কিশোরকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা চালাল সোনালি চুলওয়ালা এক মহিলা, তারপর কালো বেনি এসে চুরি করার চেষ্টা করল বারো-টাকে।'

'হয়তো মেকসিকান মহিলার বারোর পা ভেঙে গেছে,' আন্দাজ করল মুসা। 'কাজেই বোঝা টানার জন্যে আরেকটা দরকার হতেই পারে।'

রবিন এই যুক্তি মানতে পারল না। 'বারোর চরিত্র ভাল করেই জানা আছে মেকসিকানদের। জোর করে যে পিঠে সওয়ার হওয়া যায় না, জানে।'

'ভারছি,' কিশোর বলল। 'বারো-টাকে নিজের জন্যেই চেয়েছে কিনা মহিলা। কিংবা অন্য কোন কারণে ওটাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছে।'

'তাই?' মুসা আর কোন যুক্তি দেখাতে না পেরে চুপ হয়ে গেল।

কিশোরেরও আর কিছু বলার নেই।

আবার শুরু হলো পথচলা।

প্রতি সন্ধ্যায়ই একটা করে জায়গা খুঁজে বের করে শারি, যেখানে আগুন জ্বালানোর জন্যে প্রচুর লাকড়ি আছে, আর খাওয়ার পানির ব্যবস্থা আছে। ওখানেই রাতের জন্যে ক্যাম্প ফেলে ওরা। এর মাঝে ওই মহিলাকে ছাড়া আর কোন মানুষ চোখে পড়েনি ওদের। মাঝে সাঝে একআধটা কুঁড়ে চোখে পড়ে, মাটির দেয়াল আর পাতার ছাউনি, অ্যাডাব বলে ওগুলোকে। সবই দূরে দূরে। ওগুলোতে কেউ থেকে থাকলেও গোয়েন্দাদের চোখে পড়ল না।

দ্বিতীয় দিনে কিশোরের পায়ের পেশী শক্ত হয়ে থাকা সেরে গেছে। আড়ষ্টতা দূর হয়ে একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। হাঁটতে এখন অনেক সহজ লাগে। কোমরের বেল্ট ঢিলে হয়ে গেছে, রওনা দেয়ার সময় যে ছিদ্রটায় ঢুকত বাকলেসের কাঁটা, এখন তার আগের ছিদ্রটায় ঢোকে।

'বাপরে বাপ!' বন্ধুদেরকে বলল সে, 'বারোর পিঠে চাপা-ও কম পরিশ্রম নয়!'

সেদিন, একটা শৈলশিরার কাছ দিয়ে চলার সময় সামনে সাদা ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। থেমে গেল। তাকিয়ে রইল সেদিকে।

বিড়বিড় করল রবিন, 'দাবানল না তো!'

'হলেও অনেক দূরে,' মুসা বলল। 'আমাদের কাছে আসতে পারবে না।'

'যদি বাতাস এদিকে না বয়।'

এ ব্যাপারে কিশোর কোন মন্তব্য করল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ধোঁয়ার দিকে।

সেদিন এত বেশি পেছনে পড়ে গেল ডজের ঘোড়া, সন্ধ্যায় তিন গোয়েন্দার এক ঘণ্টা পরে পৌঁছল ক্যাম্পে। খুবই উদ্বিগ্ন ডজ। রাতের খাওয়ার সময় বললেন, 'একটা দিন বিশ্রাম দিতে হবে ঘোড়াটাকে। নইলে চলতে পারবে না। খোঁড়াও হয়ে যেতে পারে।'

খাওয়া শেষ হলে বললেন, 'তোমরা আমাকে রেখেই এগিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারি তোমাদের কাছে পৌঁছব।'

'আমাদের খুঁজে পাবেন তো?' মুসার গলায় সন্দেহ।

'তা পাব। এসব অঞ্চলে চিহ্ন অনুসরণ করে চলা খুব সহজ। দু'জন মানুষের জুতো আর একটা বারোর খুরের ছাপ জ্বলজ্বল করবে মাটিতে।'

পরদিন সকালে খাবার ভাগ করে দিলেন ডজ। রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। স্লীপিং ব্যাগের ওপরে আরও কিছু বোঝা, এই যেমন খাবার আর রান্নার সরঞ্জাম, বহন করতে আপত্তি করল না শারি। এবার আর ওটার পিঠে চাপল না কিশোর। হেঁটে চলল। রবিন আর মুসাও রইল সঙ্গে।

সেরাতে ক্যাম্প ফেলার পর প্রচুর কথা বলল ওরা, হাসি-মশকরা করল। ডজ কানের কাছে না থাকায় কথা বলতে পারছে সহজ ভাবে।

'রাতে কি খাওয়া যায়, বলো তো?' কিশোরকে রান্নার জোগাড় করতে দেখে ঠাট্টা করে বলল রবিন। 'রাইস আর বীন?'

'নাহ্!' জবাব দিল মুসা, 'বীন আর রাইস।'

'আসলে,' হেসে বলল কিশোর। 'তোমরা দু'জনেই ভুল করলে। রান্না করব বীনস আ লা রাইস। দয়া করে বাসন নিয়ে তৈরি হয়ে যাও।'

ডিনারের পর আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসল তিনজনে। হঠাৎ উত্তেজিত ডাক ছাড়ল শারি। লাফিয়ে উঠল তিনজনে। কান খাড়া।

মুহূর্ত পরেই আগুনের আলোয় একটা বড় বারোকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল গাছের আড়াল থেকে। এল এদিকেই। শারির চেয়ে বয়েস অনেক বেশি। পিঠে জিন নেই। তবে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে কয়েকটা পোঁটলা।

ওটার পেছন পেছন এল কালো বেণি করা সেই মহিলা।

ডাকাডাকি থামিয়ে দিল শারি। স্বজাতীয়কে দেখে খুশি হয়েছে। দুলকি চালে এগিয়ে গেল। নাক ঘষাঘষি করে স্বাগত জানাল পরস্পরকে।

কাছে এল মেকসিকান মহিলা।

'ঘাবড়িও না,' হাত নেড়ে স্প্যানিশ ভাষায় বলল সে। 'এবার বারো চুরি করতে আসিনি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম ইসাবেল। তোমরা

কে, জানি। তবে, কথা বলার আগে, আমাকে কিছু খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।'

এক প্লেট রাইস আর বীন দিল ওকে কিশোর। আগুনের ধারে বসল ইসাবেল। ভাল খিদেই পেয়েছে ওর। সমস্ত খাবার শেষ করার আগে মুখই তুলল না।

বাসে বেশ কিছুটা দূর থেকে ওকে দেখেছে কিশোর। এই প্রথম কাছে থেকে ভালমত দেখার সুযোগ পেল। মহিলা খাচ্ছে, আর সে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

বয়েস চল্লিশ মত হবে। মোটামুটি সুন্দরীই বলা চলে। চেহারাই বলে দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। পকেটওয়ালা ঢিলাঢালা একটা উলের স্কার্ট পরেছে। পায়ে মেকসিকান বুট। গায়ে খাটো হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ। চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী, চোখ পিরেটোর মতই কালো। সব মিলিয়ে, কিশোরের মনে হলো, ওই মহিলা ভালর ভাল, মন্দের যম।

খালি বাসনটা সরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ইসাবেল। পুরুষের ঘড়ি পরেছে। বেল্টটা ঢিলে। হাত খাড়া করতেই নিচের দিকে নেমে গেল ওটা। তাড়াতাড়ি আবার ওপরের দিকে কব্জির কাছাকাছি তুলে দিল সে।

'সময় বেশি নেই,' ইসাবেল বলল। 'লেকের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাকে। যতটা তাড়াতাড়ি পারি সংক্ষেপে সব বলে যাচ্ছি তোমাদেরকে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'আমি ইংরেজি বলতে পারি না। তবে তোমরা স্প্যানিশ জানো, জানি আমি।'

পুরানো চামড়ার জ্যাকেট পরা লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। যে ওদেরকে বাসে উঠতে বাধা দিচ্ছিল। লোকটার সঙ্গে তর্ক করার সময় নিশ্চয় মহিলা শুনেছে। বুঝতে পেরেছে ওরা স্প্যানিশ জানে।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বলতে ততটা পারি না। তবে বুঝতে পারি। আস্তে আস্তে বলুন, বুঝব।'

'গুড।' হাঁটু ভাঁজ করে আরাম করে বসল ইসাবেল। টেনে দিল স্কার্ট। পরের পনেরো মিনিট নিচু স্বরে প্রায় একটানা কথা বলে গেল। মাঝে সাঝে একআধটা প্রশ্ন করল কিশোর। ইতিমধ্যে একবার উঠে চলে গিয়েছিল রবিন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসেছে।

তারপর উঠে দাঁড়াল ইসাবেল।

তিন গোয়েন্দাও উঠল।

এক এক করে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল ইসাবেল। তারপর, যেমন হঠাৎ করে উদয় হয়েছিল, রহস্যময় ভাবে, তেমনি করেই আবার বারো-টাকে টেনে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

আগুনে কাঠ ফেলল মুসা। 'কি বুঝলে?'

'একটা সাংঘাতিক গল্প বলে গেল!' মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে বলল কিশোর। 'রবিন, পঞ্চো ভিলার ব্যাপারে যা যা জানো বলো তো?'

'আমাকে কি মেকসিকান পাবলিক লাইব্রেরি বলে মনে হচ্ছে?'

'বাজে কথা রাখ। রকি বীচ থেকেই মেকসিকোর ইতিহাস পড়া শুরু করেছ

তুমি। শেষ করোনি এখনও?'

'করেছি,' হাসল রবিন। 'যেদিন তুমি লেকের পানিতে ডুবে আরেকটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলে, সেদিনই।'

'আমিও জানি, শেষ করে ফেলেছ।' হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'উনিশ শো ষোলো সালের ব্যাপারে আমার আগ্রহ। পঞ্চো ভিলার কথা কি জানো?'

'ওই বছর একটা বিরাট বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছিল মেকসিকোতে। সেই বিদ্রোহেরই এক বড় নায়ক ছিল পঞ্চো ভিলা। অনেকের ধারণা, আউট-ল ছিল সে, জেসি-জেমসের মত। ব্যক্তিগত একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। অনেকগুলো লড়াই জিতেছে।'

'এখানে, সিয়েরা মাদ্রেতেও এসেছিল নাকি?'

'এসেছিল। তার একটা ঘাঁটি তৈরি করেছিল এখানেই। মরুভূমিতে নেমে গিয়ে ট্রেনের ওপর আক্রমণ চালাত। লুটপাট করে ফিরে এসে আবার লুকিয়ে পড়ত এখানে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এই কথাটা তাহলে সত্যিই বলেছে ইসাবেল।'

'তারমানে, তুমি বলতে চাইছ ওর ব্যাপারেই যত আগ্রহ মহিলার? মৃত একজন মানুষের ব্যাপারে?'

'না, তার ব্যাপারে নয়,' কিশোর জবাব দিল। 'মনে হচ্ছে সিয়েরা মাদ্রের গুপ্তধনের পেছনেই ছুটেছি আমরা, না জেনে, যেটার কথা বহুবার বলেছ তুমি। পঞ্চো ভিলার লুটের মাল। শুনলে না, ইসাবেল বলে গেল, একদিন একটা ট্রেন লুট করে হাজার হাজার ডলার দামের সিলভার পেসো নিয়ে এসেছিল পঞ্চো। এখানে উঠে এসে কোন একটা গুহাটুহায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল সে সব পেসো।' ইসাবেলের বলে যাওয়া গল্প আবার বলতে লাগল কিশোর। নিজেকেই যেন শোনাচ্ছে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এর ভেতরে। 'একটা ভুল করেছিল পঞ্চো, কিংবা তার দুর্ভাগ্যই বলা যায়, পেসোর সঙ্গে একই গুহায় বারুদ রেখেছিল সে। অসাবধানে দেশলাইয়ের কাঠি ফেলেছিল তার এক সহচর, বিস্ফোরণ ঘটল বারুদে। পর্বতের একটা অংশ ধসে গেল। টন টন পাথরের নিচে চাপা পড়ল পঞ্চোর লুটের মাল, সেই সঙ্গে তার সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ। পাথর পরিষ্কার করতে শুরু করল পঞ্চো। কিন্তু এই সময় তার শত্রুরা এসে আক্রমণ চালিয়ে বসল পর্বতের অন্য পাশ থেকে। পালাতে বাধ্য হলো সে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর।

'তারপর,' গল্পটা শেষ করল সে। 'ইসাবেল বলে গেল, শুনলেই তো, মুদ্রাগুলো এখনও সেখানে আছে।'

নীরবে কিশোরের কথা শুনছিল মুসা আর রবিন।

'ইসাবেল জানল কি করে এসব?' রবিনের প্রশ্ন। উঠে চলে যাওয়ায় অনেক কিছুই শোনেনি সে।

'ও বলল, তার দাদা নাকি পঞ্চোর সৈন্য দলে ছিল। ও-ই গল্পটা শুনিয়ে গেছে ওদের পরিবারকে,' জবাবটা দিল মুসা।

'ডজের কথা কি বলল?' জানতে চাইল রবিন। 'ওর নাম বলতে শুনলাম। বারোটার কথাও কি যেন বলল?'

কিশোর বলল, 'মাস তিনেক আগে-নাকি ইসাবেলের এক বন্ধু, টনি নামের এক আমেরিকান তরুণ, এখানে এসেছে। সে আর তার বাবা সোনা খুঁজে বেড়িয়েছে এখানকার পর্বতে। আসলে ওরা খুঁজতে এসেছিল পঞ্চো ভিলার গুহা। ওদের ধারণা, গুহাটা খুঁজেও পেয়েছিল ওরা। ইসাবেলকে টনি সে কথাই বলেছে।'

চুপ করল কিশোর।

'বলো,' তাগাদা দিল রবিন। 'কথার মাঝখানে থামলে কেন? ডজ আর শারি এর মধ্যে এল কিভাবে শুনতে চাই।'

'টনি যখন লেকে গেল,' বলল কিশোর। 'তার সঙ্গে ছিল একটা ছোট সাদা বারো। গুহার কাছে পেয়েছিল ওটাকে। বাচ্চাটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। যাওয়ার সময় নিয়ে গিয়েছিল ডজের র‍্যাঞ্চে। তারপর আবার ফিরে গিয়েছিল পর্বতে।'

'কেন? সাথে করে যখন আনতেই পারল, নিতে পারল না কেন? কেন ফেলে গেল র‍্যাঞ্চে?'

'কারণ টনির ভয়, শারি আবার পর্বতে গেলে মরে যাবে। বারোটার চিকিৎসার দরকার ছিল, আর এখানে সব চেয়ে কাছের পশুচিকিৎসক থাকেন লারেটোতে। পিরেটো গিয়ে নিয়ে এসেছিল তাঁকে। বারোটাকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা হলো।'

'কি হয়েছিল ওর? এতটাই যদি অসুস্থ হবে, ডজের র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত গেল কি করে?'

'চোখে একটা বাজে ধরনের ইনফেকশন হয়েছিল। তাতে প্রায় অন্ধই হয়ে গিয়েছিল বারোটা।' ইসাবেলের গল্পের এই জায়গাটায় বিশেষ আগ্রহ কিশোরের। গলা শুনেই যে তাকে চিনেছে বারোটা, তার সঙ্গে ওই চোখের অসুখের কি কোন যোগাযোগ আছে? কেন শারি বুঝতে পারল না, সে টনি নয়, যে তাকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বাঁচিয়েছে? অন্ধ হয়ে পর্বতে কোনদিন টিকে থাকতে পারে না কোন বারো। পিরেটোর কথা মনে পড়ল কিশোরেরঃ শারি ভাবে, তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ।

মোলায়েম শিস দিল মুসা। 'হুঁ, মিলতে আরম্ভ করেছে। ডজ জেনে গেছে টনি আর তার বাবা পঞ্চো ভিলার গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে...'

'তখন,' মুসার মুখের কথা টেনে নিয়ে কিশোর বলল, 'ডজ টনিকে গুহাটা চিনিয়ে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি করেছে। কিন্তু টনি খুব চালাক। পালাল। চলার পথে নিজের চিহ্ন সব মুছে দিয়ে গেল, যাতে ডজ পিছু নিতে না পারে। ডজের কাছে রয়ে গেল শারি। পথ চেনে যে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে গুহার কাছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শারিকে বাগ মানাতে পারল না সে, কিছুতেই তাকে নিয়ে গেল না বারোটা। ডজ বুঝতে পারল, যাকে পছন্দ করবে একমাত্র তার কথা ছাড়া আর কারও আদেশ মানবে না শারি। এমন কেউ, যাকে কণ্ঠস্বর শুনেই বন্ধু হিসেবে চিনে নেবে।'

'তখন ওরকম কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল ডজ,' মুসা বলল, 'যার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে টনির স্বরের মিল আছে। এ জন্যেই রহস্যময় ওই ধাঁধা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সে।'

'এবং কিশোরকে খুঁজে বের করল,' যোগ করল রবিন। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ইসাবেল কেন এসব কথা ওকে বলে গেল?'

'ঠিক,' মুসা বলল। 'আমাদেরকে র‍্যাঞ্চেই যেতে দিতে চায়নি যে, সে কেন এখন যেচেপড়ে সব কথা শুনিয়ে যায়?'

কথাটা কিশোরের মনেও খচখচ করছে।

'আমাকে কোন প্রশ্ন করতে দেয়নি ইসাবেল,' কিশোর বলল। 'কেবল তার কথা যখন বুঝিনি, জিজ্ঞেস করেছি, বুঝিয়ে দিয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। যা বলার সে নিজেই বলেছে, আমাকে কেবল শুনতে হয়েছে। ডজকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না। ওর ঘোড়া খোঁড়া হয়ে যাবে, চলতে পারবে না, এটা বিশ্বাস করেনি। ইসাবেলের ধারণা, ঘোড়ার পা ঠিকই ছিল, ইচ্ছে করেই আমাদের পেছনে পড়েছে ডজ। কোন উদ্দেশ্য আছে। মহিলার ভয়, টনি আর তার বাবাকে দেখলেই গুলি করে মারবে ডজ। ইসাবেলকে দেখলে তাকেও মারবে। কাজেই লেকে ফিরে যাচ্ছে সে। আমাদেরকে অনুরোধ করেছে গুহায় গিয়ে টনি আর তার বাবাকে যেন সাবধান করে দিই ডজের ব্যাপারে।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। দীর্ঘক্ষণ কারও মুখে কথা নেই।

অবশেষে মুখ খুলল মুসা, 'কিশোর, ইসাবেলকে বিশ্বাস করো তুমি?'

'বুঝতে পারছি না করব কিনা। তাকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। টনি আর তার বাবাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? এমনও তো হতে পারে, সে চাইছে আমরা গিয়ে পেসোগুলো খুঁজে বের করি।'

'হ্যাঁ, হতেই পারে,' রবিন বলল। 'আমাদের পেছন পেছন যাবে সে। তারপর যেই আমরা ওগুলো বের করব, কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।'

এগারো

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। নাস্তা সারতে সারতে আরও আলোচনা করল ইসাবেলের ব্যাপারে।

'আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছে সে,' কিশোর বলল।

'কিভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

'লেকে ফিরে যাচ্ছে বলে। বেশ তাড়াহুড়া, এমন একটা ভাব, যেন তক্ষুণি রওনা হয়ে যাবে লেকের উদ্দেশে।'

মাথা দোলাল রবিন। 'রাতের বেলা এসব পাহাড়ে পথ চলাই মুশকিল। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে সকালেও তো রওনা হতে পারত। পুরো ব্যাপারটাই আসলে ভাঁওতাবাজি।'

'আর ওই ঘড়িটা,' কিশোর বলল, 'বার বার কব্জি থেকে নেমে যাচ্ছিল, ঠেলে

ঠেলে তুলতে হচ্ছিল ওপরে। মনে হলো...' শ্রাগ করল সে,... 'জানি, না, আলোর কারসাজি হতে পারে। ভুলও দেখে থাকতে পারি।'

'কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ওর কব্জিতে একটা দাগ দেখেছি। শিওর না।'

মুসা দেখেনি, জানাল সে কথা।

রবিন বলল, 'মহিলা ভীষণ চালাক। ওর অনেক কিছুই খটকা লাগার মত। আমার অবাক লেগেছে, যখন জানলাম, কন্টাক্ট লেন্স পরে। সাধারণত যা পরে না মানুষ...'

'কন্টাক্ট লেন্স?' বাধা দিল মুসা।

'হ্যাঁ। বাসে মুছতে দেখেছি। মাথা নিচু করে রেখেছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি কি করছে। পরে ভালমত দেখে বুঝলাম। আরেকটা ব্যাপার আরও বেশি অবাক করেছে।' চুপ হয়ে গেল রবিন।

'সেটা কি?' জানতে চাইল কিশোর। বলতে এত দেরি করছে রবিন, এটা সহ্য হচ্ছে না ওর।

'আরেকটা ব্যাপার হলো...' কিশোরের অবস্থা বুঝে হাসল রবিন। ইচ্ছে করেই দেরি করছে বলতে। তথ্য গোপন করে কিশোরও অনেক সময় ওদেরকে এরকম অস্থিরতার মাঝে রাখে। সুযোগ পেয়ে শোধ তুলছে সে।

'কী! বলো না!' খেপে গেল কিশোর।

'ওয়াকি-টকি দিয়ে এই পর্বতের ভেতর কি করে সে?' প্লেটের বীন সেদ্ধ শেষ করে কয়েকটা পাইনের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে লাগল প্লেটটা রবিন। আবার চুপ।

অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল। তারপর যখন খেঁকিয়ে উঠতে যাবে তখন রবিন বলল, 'বারোর পিঠের একটা পোঁটলা থেকে ওয়াকি-টকির অ্যান্টেনা বেরিয়ে আছে দেখলাম মনে হলো। পঞ্চো ভিলার ব্যাপারে যখন তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, তখন। উঠে গেলাম ভাল করে দেখার জন্যে। ওয়াকি-টকি একটা আছে ওর কাছে।'

'ওয়াকি-টকি দিয়ে এই পর্বতের ভেতর কার সঙ্গে কথা বলে সে?' অবাক হলো মুসা। 'ডজ হতে পারে না। কারণ ওকে দেখতে পারে না মহিলা। তাছাড়া ডজের সমস্ত পোঁটলা-পাঁটলি ভাল মত দেখেছি আমি। ওয়াকি-টকি নেই।'

'পিরেটোর আছে,' কিশোর বলল। 'নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি মেরামত করে দিয়েছি। কিন্তু র‍্যাঞ্চ এখান থেকে অনেক দূর। ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ অসম্ভব।'

উঠল ওরা। সাবধানে আগুন নেভাল, যাতে ছড়িয়ে গিয়ে দাবানল সৃষ্টি করতে না পারে। শারির কাঁধে মালপত্র বাঁধল কিশোর।

'লেকে যদি,' বারোর পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'সত্যিই না গিয়ে থাকে ইসাবেল, তাহলে কি করবে? হতে পারে, এই মুহূর্তে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখছে সে।' আলো বেড়েছে। বাড়ছে ক্রমেই। চারপাশে তাকাল সে। 'আমরা

এগোলেই আমাদের পিছু নেবে, চিহ্ন ধরে ধরে। আমাদেরকে জানতে দিতে চায় না হয়তো, সে-ও যে ওই পেসোর পেছনে লেগেছে।'

হাত ওল্টাল মুসা। 'যদি সেটা করতেই চায়, করবে, আমাদের কিছু করার নেই। চিহ্ন তো আর লুকাতে পারব না।'

'তা পারব না।' শারিকে চলার নির্দেশ দিল কিশোর। 'তবে একটা সুবিধা আমাদের আছে।'

'কি?'

'কাল রাতে ইসাবেলের বারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে শারি। আর মিস্টার সাইমন জানিয়েছেন, বারোরা চেনা বারোকে অনেক দূর থেকেও গন্ধ শুঁকে চিনতে পারে। একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করে জানান দেয়। তাই, ইসাবেলের বারোটা যদি খুব কাছাকাছি চলে আসে, ডাক দেবেই। শারিও জবাব দেবে। মাইল দুয়েকের মধ্যে থাকলেও জেনে যেতে পারব আমরা।'

সেদিনকার পথচলা অন্যদিনের চেয়ে কঠিন হল। সব চেয়ে খাড়া আর উঁচু চূড়ায় উঠতে থাকল শারি। ঢালের গভীর সব খাঁজ আর শৈলশিরার ভেতর দিয়ে একেবেঁকে উঠে চলল অনেক উঁচু চূড়াটার দিকে।

একটি বারের জন্যেও থামল না কিংবা ডাকল না ওটা। বার বার পেছনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ইসাবেল বা তার বারোর ছায়াও চোখে পড়ল না।

আরেকবার ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। এক জায়গা থেকে লম্বা হয়ে উড়ছে ঘন সাদা ধোঁয়া। মনে হলো, যে চূড়াটায় উঠছে ওরা, তার ওপাশ থেকে উঠছে ওই ধোঁয়া।

'অদ্ভুত তো!' মুসা বলল। 'বনই নেই, আগুন লাগল কিসে? ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছুই দেখি না।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'পাহাড়ের অন্যপাশে আছে হয়তো।'

তিক্ত কণ্ঠে রবিন বলল, 'এখানে যেন সবাই মিথ্যুক। ডজ মিছে কথা বলে, ইসাবেল মিথ্যে বলে, এখন পাহাড়ও দাবানল লেগেছে বলে ফাঁকি দিয়ে চলেছে আমাদের।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'ধোঁয়ার রঙও কেমন আজব! সাধারণ ধোঁয়ার মত নয়।'

অনেক ওপরে উড়ছে শিকারি পাখিরাঃ শকুন, ঈগল, চিল। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'দাবানল পাখিদের কিছু করতে পারে না। বনের সবাই মরলেও ওরা পালায়। আগুন ছুঁতেও পারে না ওদের। এদিক থেকে ওরা ভাগ্যবান।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। রহস্য সমাধানের প্রচণ্ড নেশাই রুক্ষ দুর্গম পথে শারির পিছু পিছু টেনে নিয়ে চলেছে কিশোরকে। বিকেলের শুরুতে মুসা আর রবিনকে অনেক পেছনে ফেলে এল ওরা।

'এই থাম!' আচমকা চিৎকার শোনা গেল। 'এক পা এগোবে না আর!'

থেমে গেল রবিন আর মুসা। মুখ তুলে দেখল ওদের অনেক ওপরে হাত তুলছে কিশোর।

'এইবার আস্তে আস্তে এগোও,' বলল সে। 'বারোটাকে অনুসরণ করো।'

অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাই তো করছে ওরা। তাহলে কি বলতে চাইছে কিশোর?

ধীরে ধীরে যেন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল আবার রবিন আর মুসা। শারির একেবারে পেছনেই রয়েছে কিশোর। কোন রহস্যময় কারণে হাত তুলেই রেখেছে সে। বুঝতে পারছে না ওরা।

তারপর থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আর কাছে এসো না,' পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে আবার ভেসে এল কিশোর পাশার কণ্ঠ। 'কে তোমরা? এখানে কি চাই?'

আবার একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। পুরো ব্যাপারটাই কেমন ভূতুড়ে লাগছে এখন ওদের কাছে। হচ্ছেটা কি? পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ওরা? ওদের মাথায় যেন গোলমাল করে দেয়ার জন্যেই আবার শোনা গেল 'আমি কিশোর পাশা। তোমার জন্যে খবর নিয়ে এসেছি।'

ওর কথা যে কি প্রতিক্রিয়া করছে ওর বন্ধুদের ওপর ভাবল না কিশোর, ভাবার অবকাশও নেই। ওর কাছেও পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক। পথের একটা মোড় ঘুরতেই চোখ পড়েছে একটা রাইফেলের নলের ওপর। পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আছে ওটা।

'থাম!' আবার আদেশ দিল আগের কণ্ঠটা। 'এগোবে না আর!'

ওই কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিয়েছে শারিকেও। খাড়া হয়ে গেছে কান। মোলায়েম ডাক ছাড়ল একবার।

আবার ধীরে এগোনোর আদেশ হলো। শারিকে নিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর। নলের গজখানেক সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখনও রাইফেলের নল স্থির হয়ে আছে কিশোরের বুকের দিকে।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোরেরই বয়েসী একটা ছেলে। তবে ওর চেয়ে লম্বা। এলোমেলো সোনালি চুল, রোদে পোড়া তামাটে মুখ। পরনে জিনস, পায়ে মেকসিকান বুট, গায়ে ডেনিম জ্যাকেট। রাইফেল নামাল না। নজর শারির দিকে।

'শারি,' বলল সে। 'তুই এখানে এলি কি করে?'

কেঁপে উঠল বারোর কান। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেটার দিকে। তারপর কিশোরের দিকে, তারপর আবার ছেলেটার দিকে। দ্বিধায় পড়ে গেছে।

আদর করে ওর গলা চাপড়ে দিল কিশোর।

'আমি নিয়ে এসেছি,' শারির হয়ে জবাব দিল সে। 'কিংবা বলা যায়, আমাকে এনেছে ও। তুমি কি টনি?'

জবাব দিল না ছেলেটা। কিশোরের দিকে একই ভাবে রাইফেল তাক করে রেখে সরে এল কিনারে, নিচে তাকাল। তিরিশ গজ নিচে ধীরে ধীরে উঠে আসছে রবিন আর মুসা।

'ওরা কারা?' ছেলেটার কণ্ঠে সন্দেহ।

অল্প কথায় জানাল কিশোর, ওরা তার বন্ধু, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে

'তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি আমরা।' আবার নাম জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার নাম টনি, তাই না?'

'হ্যাঁ।' রাইফেল নামাল না টনি। 'কি সাহায্য করতে এসেছ?'

'তোমাকে সাবধান করে দিতে যে, ডজ মরিস...'

'ও কোথায়?' সহসা শঙ্কা ফুটল টনির চোখে। 'তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আছে?'

'না। আমাদেরকে নিয়ে একসাথেই বেরিয়েছিল। তারপর তার ঘোড়ার পায়ে অসুখ দেখা দিল। ও তাই বলেছে। কয়েক মাইল পেছনে ফেলে এসেছি ওকে আমরা। কাল নাগাদ হাজির হয়ে যেতে পারে।'

'থ্যাংকস। আমাকে জানানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।' সেফটি ক্যাচ অন করে রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল টনি। 'তোমরা এলে কি করে এখানে?'

'বললাম না শারি নিয়ে এসেছে। যেখান থেকে গিয়েছিল ও সেখানেই ফিরে এসেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি ওকে পোষ মানাল কি করে ডজ?'

'ও পারেনি। এখনও বুনোই রয়ে গেছে বারোটা। কেবল আমাকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়। ওর হয়তো ধারণা, আমিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমাকে তুমি ভেবেছে।'

'আমি? কেন?'

'কারণ, আমাদের দু'জনের কণ্ঠস্বরই এক রকম- মনে হচ্ছে তুমি এটা খেয়াল করনি। শারির কাছে তাই আমরা দু'জনেই এক। আমার গলা প্রথমে শুনে ভেবেছে আমিই তুমি। ওর কাছে এটা সেই কণ্ঠ, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে লেকের কাছে, যখন সে অন্ধ ছিল। ওকে ভাল করার জন্যে। কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই আমাকে পছন্দ করেছে সে। আমার কথা শোনে। তোমার কথা শুনে অবাক হয়েছে। কারণ, একই রকম কণ্ঠস্বর।'

বারোটার দিকে তাকিয়ে হাসল টনি। 'আয়, শারি। লক্ষ্মী শারি।'

এখনও কাঁপছে বারোর কান। ঘোরের মধ্যে যেন কথা শুনল টনির, এগিয়ে গেল। তারপর যখন ওকে আদর করল টনি, আস্তে আস্তে ঘোর ভাঙল যেন। টনির বুকে নাক ঘষল।

রবিন আর মুসা উঠে এল সেখানে।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর, 'আমার বন্ধু মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড।...রবিন, ও টনি...' পুরো নাম শোনার জন্যে তাকাল ওর মুখের দিকে।

'টনি ইয়ালার।' হাত বাড়াল সে, 'হাই, তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

রবিন আর মুসা হাসল। এখন বুঝতে পারছে, কিশোরের উল্টো পাল্টা কথার মানে। আসলে কিশোর বলেনি ওসব কথা, বলেছে টনি। তার কণ্ঠকেই কিশোরের কণ্ঠ বলে ভুল করেছে ওরা।

'মনে হয় পিপাসা পেয়েছে তোমাদের,' টনি বলল। 'যে রকম পথে হেঁটে এসেছ, পাওয়ারই কথা। এসো। দিচ্ছি। আমার ঘরটাও দেখবে।'

শারির দড়ি ধরে নিয়ে চলল টনি। একটা শৈলশিরার পাশের ঘোরানো পথ

ধরে ওপরে উঠে পর্বতের গায়ে দেখতে পেল প্রায় লুকানো একটা ফোকর। সুড়ঙ্গ মুখ।

'মাথা নুইয়ে রাখ,' সরু, নিচু সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে সাবধান করে দিল টনি। কিছুদূর এগোনোর পর বলল, 'ঠিক আছে, এবার সোজা হও।'

ভেতরে আবছা আলো। সেই আলোয় তিন গোয়েন্দা দেখল, বিশাল এক গুহায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ছাত অনেক উঁচুতে।

দেশলাই দিয়ে মোম ধরাল টনি। কিশোর আন্দাজ করল, বেশ কিছুদিন ধরে এখানে বাস করছে সে। মেঝেতে গোটানো রয়েছে একটা স্লীপিং ব্যাগ। বাসন, হাঁড়ি-পাতিল, একটা কেরোসিনের চুলা, আধবোঝাই কয়েকটা বস্তা, গাঁইতি, শাবল রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। ছাত দেখেই অনুমান করা যায় এখানে কখনও বারুদ বিস্ফোরিত হয়নি। পঞ্চো ভিলার গুহা নয় এটা।

একটা বস্তা তুলে নিয়ে মেঝেতে জই ঢালল টনি। 'আব্বা এনেছিল, ঘোড়ার জন্যে। ভালই হয়েছে, কিছুটা রয়ে গেছে। এখানে ঘাসপাতার যা আকাল। এই জই না থাকলে না খেয়ে থাকতে হত শারিকে।'

একমাত্র স্লীপিং ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। 'তোমার আব্বা কোথায়?'

'কেন? তার কি দরকার?' আবার সন্দেহ জাগল টনির চোখে।

'কারণ তাঁকেও ডজের ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই।'

মাটির জগ তুলে নিয়ে একটা মাটির ছোট গামলায় শারির জন্যে পানি ঢালল টনি।

'আব্বা নেই। ঘোড়া নিয়ে গেছে, খাবারদাবার আনার জন্যে।' জগটা বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দার দিকে। 'নাও, পানি।'

'কোনদিকে গেছেন তিনি?' জানতে চাইল কিশোর। 'লেকের দিকে? তাহলে ডজের সামনে পড়ে যেতে পারেন।'

'না, ওদিকে যায়নি। পর্বতের অন্যপাশে একটা গ্রাম আছে। গোটা দুই দোকান আছে ওখানে। সব জিনিস পাওয়া যায় না। তবে বাস থামে। আর বাস দিয়ে...'

থেমে গেল টনি। সন্দেহ যাচ্ছে না। দ্বিধা করছে। মনস্থির করার চেষ্টা করছে, ওদেরকে বিশ্বাস করবে কিনা।

'এখানে কেন এসেছ, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ডজের ধারণা...'

বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোরও। সব কথা টনিকে বলার সময় এসেছে। জোরে একবার দম নিল সে। তারপর শুরু করল। ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতা থেকে। একে একে বলল, কি করে ওরা জানতে পেরেছে পঞ্চো ভিলার পেসোর কথা।

নীরবে শুনছে টনি। মেঝেতে তিন গোয়েন্দার পাশাপাশি বসেছে। পেসোর কথা শুনে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। 'ওগুলোর কথা ডজ বলেছে? আর কি বলেছে? পেলে লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেবে?'

'না,' মুসা সন্দেহমুক্ত করার চেষ্টা করল তাকে। 'ভুলেও একবার পেসোর কথা উচ্চারণ করেনি ডজ। ও আমাদেরকে বলেছে, পর্বতে যেতে হবে বারোটাকে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্যে। ওটার জন্মভূমিতে। শারির খুর নাকি বড় হয়ে যাচ্ছে, পর্বতের পাথুরে অঞ্চলে ঘষা না খেলে সমান হবে না।'

'কী!'

মুসা আরও বলল, 'ইসাবেল আমাদেরকে বলেছে রূপার পেসোর কথা।'

'ইসাবেল?' চিনতে না পেরে ভ্রূকুটি করল টনি। 'এই ইসাবেলটা আবার কে?'

চেহারার বর্ণনা দিল রবিন। কালো বেনির কথা বলল। কালো চোখ আর লাল শালের কথা বলল।

'মেকসিকান?' এখনও ভুরু কুঁচকেই রেখেছে টনি।

'মনে তো হলো,' জবাব দিল কিশোর। 'স্প্যানিশ ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝে না। ওর চামড়ার রঙও মেকসিকানদের মত বাদামী।' নিজেও অবাক হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে এখন, আসলেই মহিলা মেকসিকান কিনা! 'ডজের ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিতে বলেছে আমাদেরকে। তোমার নাকি বন্ধু। তুমি তাকে চেন?'

মাথা নাড়ল টনি। 'নামই শুনিনি কখনও। আর চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম, তাতে বুঝতে পারছি, ওর সঙ্গে জীবনে কখনও দেখা হয়নি আমার।'

বারো

'এই পর্বতে গুহার অভাব নেই,' টেনি বলল। 'পঞ্চো ভিলা আর তার সাগরেদরা নিশ্চয় একেক সময় একেক গুহায় ঢুকত, লুকিয়ে থাকার জন্যে। তবে আব্বার ধারণা, সে যেটাতে পেসো লুকিয়েছিল সেটা পেয়ে গেছি আমরা।'

সন্ধ্যায় যার যার স্লীপিং ব্যাগ বের করে তার ওপর আরাম করে বসেছে তিন গোয়েন্দা। কেরোসিনের চুলায় এক হাঁড়ি খাবার রান্না করেছে টনি, একঘেয়ে সেই বীন আর চাল সেদ্ধ। তিনটে মোম জ্বলছে এখন। সুড়ঙ্গমুখে একটা কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে সে, যাতে বাইরে আলো বেরোতে না পারে। এককোণে জই চিবাচ্ছে শারি।

যার যার প্লেটে খাবার দেয়া হলো।

'কি করে জানলে তোমরা, আসল গুহাটাই খুঁজে পেয়েছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'এত গুহার মধ্যে আলাদা করে চিনলে কি করে?'

'কিছু কিছু চিহ্ন দেখে। পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে ছিল গুহামুখ। ওগুলো কিছু কিছু সরিয়ে যখন ঢুকলাম, পেয়ে গেলাম ইগনাসিওকে।'

'ইগনাসিও?'

'ভিলার এক সিপাহী। উনিশশো ষোলো সাল থেকে গুহায় থেকে থেকে তার চেহারা অবশ্যই আর চেনার জো ছিল না। আসলে, চেহারাই আর অবশিষ্ট নেই। শুধুই কঙ্কাল। ইউনিফর্মের কয়েকটা টুকরো তখনও লেগে ছিল। আর তার খুলিটা…'

'দয়া করে এখন একটু চুপ করবে,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'আমি এখন এই রাজকীয় খানা গেলার চেষ্টা করছি।'

হাসল রবিন। 'মরা মানুষের কথা শুনলে ভয় পায় আমাদের মুসা। বিশেষ করে অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনলে।' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হাসল, 'খাওয়ার রুচিও নষ্ট হয়ে যায়, তাই না?' আবার টনির দিকে তাকাল সে। 'ভূতের বড় ভয়।'

'ও,' টনিও হাসল। 'ভাবনা নেই, ভূত হতে পারবে না। খ্রিস্টানদের মত করেই কবর দিয়েছি তাকে। আব্বা তার কবরের ওপর একটা ক্রুশ লাগিয়ে দিয়েছে। লিখে দিয়েছে মেকসিকোর মহান মিলিটারি হিরো ইগনাসিওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ইগনাসিও অ্যালেণ্ড ছিল অনেকটা আমেরিকানদের জর্জ ওয়াশিংটনের মত, আর...'

'গুহার মধ্যে তুমি ঢুকেছিলে?' প্রসঙ্গটা ভাল লাগছে না মুসার, অন্য বিষয়ে চলে যাওয়ার জন্যে বলল।

মাথা নাড়ল টনি। 'গাঁইতি আর শাবল দিয়ে কিছু পাথর সরিয়েছি। ওই পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু করতে পারিনি। পেসোগুলো দেখিনি। সে জন্যেই বিস্ফোরক কিনতে গেছে আব্বা।'

'কখন ফিরবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তিন-চার দিনের আগে না। গাঁয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না, মাত্র কয়েক ঘন্টা। ওখানে ঘোড়া রেখে যাবে আব্বা। দুটো ঘোড়া নিয়ে গেছে। দরকার আছে। আসার সময় ভারি বোঝা বয়ে আনতে হবে। যাই হোক, আব্বা চলে যাবে চিহুয়া হুয়ায়। ওটাই সব চেয়ে কাছের শহর, যেখানে ডিনামাইট আর দরকারী অন্যান্য জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।'

'তার মানে,' রবিন বলল। 'ডজকে আমাদেরই সামলাতে হবে। হয়তো ইসাবেলাকেও। তবে, আমরা চারজন। দু'জন মানুষকে কাবু না করতে পারার কিছু নেই।'

নতুন বন্ধুদের দিকে তাকাল টনি। 'ভাল লাগছে আমার। একা আর সামলাতে হবে না ওদেরকে। আরও তিনজনের সাহায্য পাব। ডজের ব্যাপারে যে আমাকে সাবধান করে দিলে তার জন্যে আরেকবার ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদেরকে। তোমরা আমাকে চিনতেও না।'

'ইয়ে...' কিশোরের মনে পড়ল, ওদের পরিচয়ই এখনও দেয়া হয়নি টনির কাছে। শুধু নাম বলেছে। বলল, 'তোমার জন্যেই যে কেবল একাজ করছি, তা নয়। আমাদেরও আগ্রহ আছে। এটা আমাদের জন্যে আরেকটা কেস।'

'মানে?' টনি বুঝতে পারছে না। 'ডিটেকটিভের মত কথা বলছ তুমি।'

'ডিটেকটিভই আমরা। শখের গোয়েন্দা।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর।

অনেকক্ষণ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল টনি। ভুরু কোঁচকাল। তারপর বিড়বিড় করল, 'এটা কি ভাষা?'

'দেখি? আরে, বাংলাটা দিয়ে ফেলেছি। এটা আমার মাতৃভাষা।'

'তার মানে তুমি আমেরিকান নও?' অবাক হলো টনি।

'বাংলাদেশী। তবে আমেরিকার নাগরিকত্বও আছে আমার।' ইংরেজিতে লেখা আরেকটা কার্ড বের করে দিল কিশোর।

সেটাও ঠিক মত পড়তে পারল না টনি। ইনভেসটিগেটরের উচ্চারণ করল নিভেসটিগেটর। শেষে কিশোরের হাতে দিতে দিতে বলল, 'তুমিই পড়ে শোনাও।'

কার্ডের দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। জোরে জোরে বলল, কি লেখা আছে।

'ও,' আরেক দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল টনি। বলল, 'আমি পড়তে পারি না, তা নয়। আসলে, ডিজলেকজিয়া আছে আমার। ওটা কি জানো?'

'জানি,' ঘাড় কাত করল রবিন। টনির জন্যে কষ্ট হল তার। 'এর মানে হল, অক্ষর উল্টোপাল্টা দেখ তুমি। ইটালিতে এই রোগ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। রঙিন লেন্স দিয়ে এখনও চেষ্টা চলছে, সারানোর উপায় খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা।'

'হ্যাঁ। বাড়ি ফিরলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে আম্মা। সেটা তো বাড়ি যাবার পর। এখানে তো আমি এখন পড়তে পারি না। খুবই কষ্ট হয়। চিঠিও পড়তে পারি না। তাই যোগাযোগ রাখার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করেছি। টেপে কথা রেকর্ড করে আদান-প্রদান করি। আম্মা আমাকে টেপ পাঠায়, আমিও আম্মাকে টেপ পাঠাই।'

কিছু বলল না কিশোর। মাথার ভেতরের মগজ নামের কম্পিউটারটা তার চালু হয়ে গেছে বেদম গতিতে।

আরেকটা ধাঁধার সমাধান হলো, বসে গেল খাপে খাপে। ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে পাওয়া টেপটায় রেকর্ড করা ছিলঃ মেকসিকোতে এসো না, প্লীজ! মারাত্মক বিপদে পড়বে···

নিশ্চয় ওটা টনিরই কণ্ঠ ছিল। ওর মা'কে কোন কারণে সতর্ক করে দিয়ে পাঠানো একটা দীর্ঘ চিঠিরই কিছু অংশ আবার রেকর্ড করা হয়েছিল। কিংবা বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো রেখে বাকি সব মুছে ফেলা হয়েছিল। তারপর রেখে আসা হয়েছিল ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে। কিশোরকে ভয় দেখানোর জন্যে, হুমকি দেয়ার জন্যে। এবং এটা করতে গিয়ে একটা চমৎকার সূত্র রেখে এসেছিল।

টনির দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার আম্মা কি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন?'

'হ্যাঁ। মনে হয়। আসলে, কখন যে কোথায়···' চুপ হয়ে গেল টনি। আবার অন্য দিকে তাকাল। বলতে চায় না।

চাপাচাপি করল না কিশোর। তবে আরেকটা কথা জানা দরকার। 'তুমি কি তোমার আম্মার মত দেখতে? তোমার মতই সোনালি চুল?'

'হ্যাঁ। আমার মত চোখও নীল। কেন?'

'না, ভাবছি।' হাই তুলল কিশোর। শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। 'ঘুমালে কেমন হয়?'

সবাই রাজি। কয়েক মিনিট পর ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল ওরা। সুড়ঙ্গ

মুখের কাছে ঝোলানো কম্বলটা গিয়ে খুলে নিয়ে এল টনি। স্লীপিং ব্যাগে ঢুকল চারজনেই। তারপর ঘুম।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল কিশোরের। দেখল, বাইরে থেকে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে আবছা আলো। প্রথমেই তাকাল, শারি কি করছে দেখার জন্যে। আরে! নেই তো!

তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল সে। শারিকে খুঁজতে লাগল। গুহায় ঢোকার পথের ওপরই দেখতে পেল ওটাকে, বিশ গজ দূরে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মাথা তুলে মোলায়েম ডাক ডাকল বারোটা। হুঁশিয়ারি নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ। মুহূর্ত পরেই আরেকটা বারোর ডাক কানে এল, শারির ডাকের সাড়া দিল ওটা বাইরে থেকে। সুড়ঙ্গমুখের নিচে কোনখানে রয়েছে।

ইসাবেলের বারো, ভাবল কিশোর। দ্রুত সরে এল পেছনে। লুকিয়ে পড়ল পাথরের আড়ালে। মুহূর্ত পরেই তার পাশে চলে এল টনি, মুসা আর রবিন। ওরাও ডাক শুনেছে।

মোলায়েম ডাক বিনিময় চলতেই থাকল শারি আর অন্য বারোটার মধ্যে। তারপর একসময় দেখা গেল দ্বিতীয় বারোটাকে। পর্বতের ঢালের একটা নালা ধরে উঠে আসছে।

দুলকি চালে এগিয়ে গেল শারি। অন্য বারোটা কাছাকাছি এলে ওটার গায়ে গা ঘষতে শুরু করল।

ইসাবেলের বারোর লাগাম এখনও পরানো রয়েছে, কিন্তু পিঠের বোঝাগুলো নেই। সূর্য উঠেছে। রোদ বাড়ছে, বাড়ছে আলো। আশপাশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল চারজনে।

ইসাবেলকে দেখা গেল না।

'চলো, দুটোকেই গুহায় নিয়ে যাই,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'শারিকে দেখলেই বুঝে ফেলবে ইসাবেল, আমরা এখানে আছি।'

কিশোর আর টনি মিলে দুটো বারোকে বলে বলে নিয়ে গেল গুহার ভেতরে। ওদের অনুসরণ করল অন্য দু'জন।

'ইসাবেলকে তোমরা পছন্দ করো না, তাই না?' টনির প্রশ্ন।

'ওই মহিলা আরেকটা ধাঁধা,' কিশোর বলল। 'সে আমাদেরকে বলেছে ডজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান করে দিতে। বলেছে, সে তোমাদের পরিচিত। বন্ধু। অথচ তুমি বলছ, কখনও দেখইনি। এর মানেটা কি? মনে হচ্ছে রবিনের কথাই ঠিক। ধাপ্পাবাজ মহিলা।'

দুটো বারোই ক্ষুধার্ত। গুহার ভেতরে নিরাপদ জায়গায় এনেই ওগুলোকে খাবার দিল টনি, পানি ঢেলে দিল গামলায়। মুসা বসল রান্না করতে। তাদের সেই একই খাবার, বীন আর চাল সেদ্ধ।

একসাথে খেতে বসল না ওরা। বাসন নিয়ে সুড়ঙ্গমুখের কাছে চলে গেল কিশোর, পাহারা দেয়ার জন্যে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে, যাতে নিচ থেকে তাকে চোখে না পড়ে। আত্মগোপন করে রইল পাথরের আড়ালে। উঁকি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল নিচের অঞ্চল। আঁতিপাতি করে খুঁজেও ইসাবেলকে চোখে পড়ল

না।

কম্পনটা প্রথমে টের পেল বুকের কাছে। হৃৎপিণ্ডের ঝাঁকি নয়, বাইরে থেকে আসা। যেন পাহাড়ের অনেক গভীর থেকে আসছে। এতটাই জোরাল হলো, হাত থেকে চামচ পড়ে গেল। ভূমিকম্প নয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে আজীবন বাস করে আসছে, ভূমিকম্প হলে কি হয় ভাল করেই জানে। এখনকারটা হঠাৎ কোন ঝাঁকুনি নয়। বরং মহাসড়কের ধারে দাঁড়ালে আর পাশ দিয়ে ভারি কোন লরি চলে গেলে যেমন কাঁপতে থাকে মাটি অনেকটা তেমন।

ঘণ্টাখানেক পরে তার জায়গায় পাহারা দিতে এল রবিন। সেই রকম কথা হয়েছে। এক এক করে সবাই দেবে, এক ঘণ্টা পর পর।

কাঁপুনি টের পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পেয়েছি,' রবিন জানাল। 'ভূমিকম্পের মত কিন্তু মনে হলো না। অন্য রকম। এই পর্বতমালাকে বিশ্বাস নেই, বইয়ে পড়েছি। এখন তার প্রমাণ পাচ্ছি। কখন যে কি ঘটে যাবে বলা মুশকিল। আচ্ছা, কাল যে বনে আগুন লাগতে দেখলাম··· না না, আগুন তো না, ধোঁয়া, এর কি ব্যাখ্যা, বলো তো?'

ফিরে তাকাল সে। পেছনে কিছুই দেখতে পেল না। দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের উঁচু চূড়া। গুহামুখের ওপর থেকে উঠে গেছে অনেকখানি।

'কুইন সাবে?' রবিনের প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর। অর্থাৎ, জানে না।

পাহারায় বসল রবিন। নিচের দিকে তাকিয়ে ইসাবেলকে খুঁজতে লাগল তার চোখ।

কিশোর যখন এসেছিল, তার দুই ঘণ্টা পরে এসে রবিনকে মুক্তি দিল মুসা। নিচে তাকিয়ে মনে হলো তার, একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারল না। পাখির ডাক ডেকে গুহার ভেতরে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিল তার সন্দেহের কথা।

'কোথায়?' সুড়ঙ্গমুখের কাছে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওই যে, ওখানটায়।' বাঁয়ে হাত তুলে দেখাল মুসা।

চারজনেই দেখতে পেল, অনেক নিচে মূর্তিটাকে।

একজন লোক। মাথায় স্টেটসন হ্যাট। হাতে রাইফেল নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে এদিকেই।

ডজ মরিস।

তেরো

'গুহায় লুকিয়ে থাকার কোন মানে নেই,' কিশোর বলল। 'ডজ আসতে চাইলে ঠিকই চলে আসবে চিহ্ন দেখে দেখে। গুলি করতে করতে ঢুকলে তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না···'

'তাহলে লুকিয়ে থেকে প্রথম আক্রমণটা আমাদেরকেই করতে হবে,' বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। এতে কাজ হতেও

পারে।'

'বলে ফেল।'

'চলো, ভেতরে গিয়ে বসি। এখানে প্রাইভেসি নেই।' হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করল কিশোর। তাকে অনুসরণ করল অন্যেরা।

মিনিটখানেক পরে কিশোর, টনি আর রবিন বেরিয়ে এল আবার। টনির হাতে তার রাইফেল। বুকের কাছে ধরে রেখেছে। অপেক্ষা করে রইল ডজ পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। তারপর দ্রুত নামতে শুরু করল। পাথরে পা পিছলে যাচ্ছে, পরোয়াই করল না। নেমে চলে গেল একটা বড় পাথরের আড়ালে। তাকে অনুসরণ করে গিয়ে রবিনও লুকিয়ে পড়ল।

সুড়ঙ্গমুখের কাছে পড়ে আছে কিশোর। মাথা নিচু করে রেখেছে। যতটা না হলে ডজকে দেখতে পাবে না তার বেশি তুলছে না। রাইফেল বাগিয়ে সাবধানে উঠে আসছে ডজ, শারির পায়ের ছাপ দেখে দেখে। বিশ গজের মধ্যে চলে এল ডজ।

'ডজ!' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'ডজ! আমি, টনি!'

'টনি!' ঝট করে ট্রিগার গার্ডের ভেতর আঙুল চলে গেল ডজের। 'কোথায় তুমি?'

'এই যে এখানে, ওপরে,' চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'আমার হাতে রাইফেল আছে। আপনার দিকে তোলা।'

হেসে উঠল ডজ। 'তাহলে করো গুলি। ঠিক কোথায় আছ তুমি, জেনে যেতে পারব তাহলে। তারপর খুলি ছাতু করে দেব।'

নালার ঠিক মাঝখান দিয়ে এসেছে পায়েচলা পাহাড়ী পথ। সেটা ধরে আবার এগোতে লাগল সে। উঠে আসতে থাকল ওপরে।

'কি চাই আপনার?' ভয় পেয়েছে যেন, কণ্ঠস্বরকে এমন করে তুলল কিশোর। 'এখানে এসেছেন কেন?'

'কথা বলতে। তুমি আর তোমার বাবার সঙ্গে পঞ্চো ভিলার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'রাইফেল ফেলে দিন!' কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টনি। ডজের পেছনে। নলের মাথা দিয়ে জোরে গুঁতো মারল লোকটার পিঠে।

অবাক হয়ে গেল ডজ। বিমূঢ়।

'কি হলো? ফেলছেন না কেন?' আবার গুঁতো লাগাল টনি।

কিশোরের বুদ্ধি কাজে লেগেছে। তার ফাঁদে পা দিয়ে বোকা বনেছে ডজ। সে ভেবেছিল টনির সঙ্গেই বুঝি কথা বলছে। কি কাণ্ড! মুহূর্ত আগে ছেলেটার কথা শুনেছে ওপরে, এখন শুনছে পেছনে।

রাইফেল ফেলল না সে। তবে দ্বিধায় পড়ে গিয়ে নামাতে বাধ্য হলো।

'এদিকে ফিরবেন না। মাথাও ঘোরাবেন না।' আবার কঠোর গলায় আদেশ দিল টনি।

কিশোর যা আশা করেছিল তাই ঘটল, অন্তত ঘটার উপক্রম হলো।

লাফ দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

মাথা না ঘোরাতে বলা হয়েছে, তবু ঘোরাতে গেল ডজ। সবে অর্ধেকটা ঘুরিয়েছে ঘাড়, এই সময় বেরোল রবিন। কাজেই তাকে চোখে পড়ল না ওর।

এক হ্যাঁচকা টানে ডজের হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে দশ গজ দূরের একটা ক্যাকটাস ঝোপে ফেলে দিল রবিন।

গর্জে উঠল ডজ।

কারাতে যোদ্ধার পজিশন নিয়ে ফেলেছে রবিন। মুসার মত অতটা ওস্তাদ নয় সে, অত শক্তি কিংবা ক্ষিপ্রতাও নেই, তবে মন্দ বলা যাবে না। তার বিশ্বাস, ডজকে কাবু করে ফেলতে পারবে।

কিন্তু রবিনকে আক্রমণ করল না ডজ। আচমকা চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল। হাত লম্বা করে দিয়েছে। ধাপ করে খোলা আঙুলের থাবা গিয়ে বাড়ি মারল টনির মাথায়। টলে উঠে পিছিয়ে গেল টনি। লাফিয়ে এগিয়ে গেল রবিন। কিন্তু ততক্ষণে টনির রাইফেলের নল চেপে ধরেছে ডজ। জোরে এক মোচড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই অস্ত্রটা চলে এল তার হাতে। পিছিয়ে গিয়ে সেটা তুলে ধরল রবিনের দিকে। দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল, 'বিচ্ছুর দল! হাঁটো। নিচের দিকে। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে যাওয়ার আগে থামবে না।'

অস্ত্রহীন হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই আর দু'জনের। টনি কিছু করার চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করবে ডজ। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল দু'জনে।

পথ ধরে নেমে গেল প্রায় একশো গজ। তারপর ঘুরল ডজ। উঠতে শুরু করল কিশোরের দিকে।

কয়েক গজ উঠে চিৎকার করে ডাকল, 'বেরিয়ে এসো! নইলে গুলি শুরু করব!'

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল ডজের। আরেকটু বাড়লেই গুলি বেরিয়ে যাবে। 'বেশ, নেমে এসো এবার। দ্রুত চলে যাও বন্ধুদের কাছে। তবে আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

লোকটাকে জুডোর প্যাঁচে ফেলার সুযোগ খুঁজতে লাগল কিশোর। কিন্তু রাইফেলের নল যেভাবে ওর দিকে মুখ করে আছে তাতে কিছু করা সম্ভব নয়।

'টনির বাবা কোথায়?' জানতে চাইল ডজ।

দ্রুত ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। ডজকে বিশ্বাস করাতে হবে গুহার ভেতরে কেউ নেই।

'মুসাকে নিয়ে পানি আনতে গেছে।'

'ওদের দেখা পাব কি করে?'

'ঝর্নাটা মাইল দুই দূরে। পাহাড়ের আরেক পাশে। এখান থেকে দেখা যায় না।'

আলতো করে মাথা ঝাঁকাল একবার ডজ। হাসল। 'তাহলে লোকগুলোকে পাহারা দেয়ার এখন কেউ নেই, তুমি ছাড়া। গুড। এখন ঘোরো। গিয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বসে থাক। লুকিয়ে থাকবে। আমার চোখে যাতে না পড়। পিঠে গুলি

খেতে না চাইলে জলদি ভাগ।'

হতাশ ভঙ্গি করল কিশোর। পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়ে যেন দ্রুত নামতে শুরু করল নালার ভেতর দিয়ে।

ও পাথরের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডজ। তারপর মাথা নিচু করে দু'হাতে রাইফেল ধরে ঢুকল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

ওকে আসতে শুনল মুসা। গুহার ঠিক ভেতরেই অপেক্ষা করছে। আশা করছে, মাথা নিচু করেই ঢুকবে ডজ, ঢুকতে হবে ওভাবেই। ঘাড়ে কারাতের কোপ মারার জন্যে চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে।

হাত তুলল সে। আঙুলগুলো সোজা করে শক্ত করে রেখেছে, গায়ে গায়ে চেপে লেগে রয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে। এভাবে ডজের ঘাড়ে একটা কোপই যথেষ্ট। মাথা তোলার আর সুযোগ পাবে না। ঢলে পড়বে মাটিতে।

গুহায় ঢুকল ডজ। সাপের মত ছোবল হানল যেন মুসার উদ্যত হাত। কিন্তু একটা বারো শব্দ করে ফেলল আর শেষ মুহূর্তে মাথা সোজা করে ফেলল লোকটা। মুসার কোপটা ঘাড়ে না লেগে লাগল তার কাঁধে। হোঁচট খাওয়ার মত ঝাঁকুনি খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল তার শরীরটা। হাত থেকে রাইফেল ছাড়ল না।

লাফ দিয়ে পেছনে চলে এল মুসা। আরেকবার আঘাত হানার জন্যে উঠে গেল হাত। কিন্তু সামলে নিয়েছে ততক্ষণে ডজ। রবিন আর টনিকে পরাজিত করার সময় যেমন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল শরীরে, তেমনি খেলল আরেকবার। অসাধারণ ক্ষিপ্র লোকটা। চিতাবাঘকেও হার মানায়। কখন ঘুরল বুঝতেই পারল না যেন মুসা। শুধু দেখল, তার দিকে ঘুরে গেছে ডজ। রাইফেলের নল বুকের দিকে তাক করা।

হাত নামাল মুসা।

পরমুহূর্তে আন্দাজ করল, ডজের তুলনায় তার একটা সুবিধা বেশি। রোদ থেকে ভেতরে এসেছে লোকটা, তীব্র আলো থেকে আবছা অন্ধকারে, চোখে সয়নি এখনও। দ্রুত কিছু করতে পারলে হয়ত কাবু করেও ফেলতে পারবে ডজকে, গুলি করার আগেই।

একপাশে সরে গেল সে। বোঝার চেষ্টা করল, ডজ দেখতে পেয়েছে কিনা, কিছু করতে গেলে গুলি খাবে কিনা। কিছুই বুঝতে পারল না। এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ঝুঁকি নিল সে। একপায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরল। পাক শেষ হওয়ার আগেই ঝট করে ওপরে তুলে সোজা বাড়িয়ে দিল ডান পা'টা। ডজের বুকের সামান্য নিচে লাগল লাথি।

পুরো একটা সেকেণ্ড বাঁকা হয়ে রইল ডজ। শ্বাস নিতে পারছে না।

যথেষ্ট সময় পেল মুসা। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে কনুই দিয়ে একেবারে মেপে একটা ভয়াবহ আঘাত হানল ডজের ঘাড়ে। মারটা আরেকটু জোরে হলে মরেই যেত র‍্যাঞ্চার।

ওটোশি-হিজি-অ্যাটি সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ডজও পারল না। ঢলে পড়ল মেঝেতে। কিছু সময়ের জন্যে বেহুঁশ।

অন্য তিনজন যখন গুহায় ঢুকল, তখনও মেঝেতেই পড়ে আছে সে। দড়ি

বের করে শক্ত করে বাঁধল তাকে টনি। খানিক আগেও রাইফেল হাতে যে হম্বিতম্বি করছিল, সে এখন পুরোপুরি অসহায়। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চারজনে। উত্তেজনা টের পেয়েই বোধহয় খাওয়া থামিয়ে দিয়েছিল বারো দুটো। আবার মুখ নামিয়ে জই তুলে নিয়ে চিবাতে শুরু করল।

মিনিট খানেক পর রবিন বলল, 'হুঁশ ফেরে না কেন? দশ পর্যন্ত গুনি।'

'দরকার কি গোনার,' কিশোর বলল। 'যখন ফেরে ফিরবে।'

বাইরে বেরিয়ে এল চারজনে।

'যেভাবে আশা করেছিলাম ঠিক সেভাবে ঘটল না,' হাসল কিশোর। 'মুসাই শেষ রক্ষা করল। নইলে গিয়েছিল সব ভণ্ডুল হয়ে।'

হেসে বাতাসেই হাত দিয়ে একটা কোপ মারল মুসা। 'জিনিস বটে, কারাতে। খালি দুটো হাত আর পা-ই যথেষ্ট, মারাত্মক অস্ত্র হয়ে যায় ব্যবহারের গুণে।

'ঠিক,' রবিন বলল। 'কোন দিন ব্রুস লী হয়ে যাও কে জানে! কিশোর, এরপর কি করব আমরা?'

'প্রথমে ডজের রাইফেলটা বের করে আনব,' কিশোরের আগেই জবাব দিল টনি। 'একটা রাইফেলের চেয়ে দুটো থাকলে অনেক সুবিধে।'

দ্রুত সেই ক্যাকটাসের ঝোপে নেমে এল ওরা, যেখানে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলেছিল রবিন। খুঁজতে শুরু করল।

খুঁজেই চলল, খুঁজেই চলল। প্রতিটি খাঁজ, গর্ত, পাথরের ফাঁকফোকর, কিচ্ছু বাদ দিল না। প্রতিটি কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাসের পাতা সরিয়ে সরিয়ে দেখল।

পাওয়া গেল না রাইফেলটা।

'ইসাবেল!' রবিন বলল, 'ধারেকাছেই কোথাও ছিল। নিয়ে গেছে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। কয়েকবার জোরে জোরে চিমটি কাটার পর বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'কত বুদ্ধি যে থাকে তোমার মাথায়!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'আমার ধারণা,' কিশোর বলল, 'ইসাবেল এখানে কোথাও লুকায়নি।' চিন্তিত ভঙ্গিটা রয়ে গেছে। 'ঘাটিতে ফিরে গেছে সে।'

'ঘাটি?' ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'সেটা আবার কি?'

'বারোর পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেছে, যাতে কোথাও ক্যাম্প করতে পারে। মিস্টার সাইমন জানিয়েছেন আমাকে, বারোরা খুব বিশ্বস্ত জানোয়ার। সেটার প্রমাণও পেয়েছি আমরা। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তাকে আর ছাড়তে পারে না। ফিরে ফিরে যায় তার কাছে। এখন ইসাবেলের বারোটার আকর্ষণ শারির ওপর বেশি, তাই যেতে চাইছে না। কিন্তু যদি শারিকে ওর সঙ্গে যেতে দিই, তাহলে নিশ্চয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে ইসাবেলের কাছে। যেখানে ঘাঁটি করেছে মহিলা।'

'তোমাকে?' বাঁকা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'একাই সব ক্রেডিট নিতে চাও? আমরা বাদ পড়ব কেন? সবাই গেলে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধেটা হলো, চারজন অনেক বেশি। একসাথে গেলে দেখে ফেলতে পারে ইসাবেল। আমি একা হলে সারাক্ষণ বারোগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থেকে

এগুতে পারব। আর শারিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই আমাকেই যেতে হচ্ছে।'

চুপ হয়ে গেল রবিন। সঙ্গে যাবার মত জোরাল যুক্তি দেখাতে পারল না আর কেউ।

ইসাবেলের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা ধারণা বাসা বাঁধছে কিশোরের মনে। ধারণাটা হয়েছে খুব ক্ষীণ সূত্র থেকে। ক্যাম্পের সামান্য আলোয় দেখা কব্জির দাগ। রবিন বলছে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে মহিলা। সামান্য সূত্র, তবে অবহেলা করা উচিত নয়। অতি সাধারণ জিনিসও মাঝে মাঝে জটিল রহস্যের সমাধান করে দেয়। ইসাবেলের কব্জিতে দাগ সত্যিই আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার একটাই উপায়, আরেকবার কাছে থেকে ভালমত দেখা।

'বেশ, যাও,' মুসা বলল অবশেষে। 'তবে সাবধানে থেক। মহিলার কাছে এখন একটা রাইফেল আছে।'

বারোদুটোকে গুহা থেকে বের করে আনল টনি। জানাল, 'ডজের হুঁশ ফিরেছে। আমাকে দেখেই গালাগাল শুরু করল। ছাড়া পেলে আমাকে কি কি করবে, পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে।'

ইসাবেলের বারোর পেটে জোরে এক চাপড় মারল কিশোর। চলতে শুরু করল ওটা। পাশে পাশে এগোল শারি। কিশোর ঢুকে পড়ল দুটো জানোয়ারের মাঝখানে। মাথা নুইয়ে রেখেছে, যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে।

ওপরেও উঠল না বারোদুটো, নিচেও নামল না। যতটা সম্ভব সমান্তরাল জায়গা ধরে চলতে লাগল। এখানকার পাহাড়ের এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার। খাড়া ঢাল আছে, আবার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঢালের গায়ে সমান জায়গাও আছে, টেবিলের মত।

ওপর দিকে মুখ তুলতে আরও অনেক গুহামুখ নজরে পড়ল কিশোরের। কিন্তু মাটিতে কোন চিহ্ন দেখতে পেল না, যেগুলো বলে দেবে কোন গুহাটার দিকে মানুষ গেছে।

চলছেই ইসাবেলের বারো।

তারপর কোন রকম জানান না দিয়েই আচমকা থেমে গেল।

ওটার পাশে থমকে দাঁড়াল শারি। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। শ'খানেক গজ ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল মত চোখে পড়ল। পাথরের আড়ালে থেকে, যতটা সাবধানে সম্ভব ক্রল করে এগোল সেটার দিকে।

তাকে অনুসরণ করল না ইসাবেলের বারো। তবে নড়লও না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কাছেই ছোট একটা সেজ ঝোপ দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল শারি। পাতা ছিঁড়ে চিবাতে শুরু করল। দেখাদেখি অন্য বারোটাও গিয়ে তাতে মুখ দিল। কোন শব্দ করল না।

ভুল করলাম না তো? ভাবল কিশোর। পাহাড়ের ওই সরু ফাটলে নিশ্চয়ই ঢোকার পথ নেই, আর তাহলে ওখানে ক্যাম্প করাও সম্ভব নয় ইসাবেলের পক্ষে। তবু, আরেকটু কাছে এগিয়ে দেখা যাক, কিছু আছে কিনা।

ঘাড়ে হাত পড়ল এই সময়। শীতল স্পর্শ। শক্ত করে চেপে ধরেছে যেন।

তার মুখের কাছ থেকে একটু দূরেই মাটি থেকে যেন গজিয়ে উঠেছে জিনিসটা। আসলে গেড়ে দেয়া হয়েছে। একটা কাঠের ক্রুশ। আড়াআড়ি বাঁধা দুটো কাঠের বাঁধনের কাছের একটা কোণ আটকে গিয়েছিল ওর ঘাড়ে, মাথা তোলার সময়।

নাম খোদাই করা রয়েছে ক্রুশটাতে। ইগনাসিও।

পেয়ে গেল তাহলে! গুহার বাইরেই কবর দেয়া হয়েছে কংকালটাকে। তার মানে কাছেই কোথাও রয়েছে পঞ্চো ভিলার গুহা। যেটাতে লুকানো রয়েছে পেসোগুলো।

ইসাবেল কি দেখে ফেলেছে? ওই গুহাতে গিয়েই ক্যাম্প করেছে সে?

নাকি ওপরে উঠে বসে আছে কোনখানে? ওই ফাটলের ভেতর?

ওপরে থেকে থাকলে এতক্ষণে বারোদুটোকে দেখে ফেলার কথা। দেখে থাকলে জানার চেষ্টা করবে কেন এসেছে ওগুলো।

মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে রইল কিশোর। অপেক্ষা করছে।

মিনিটখানেকের বেশি থাকতে হলো না। মেকসিকান মহিলার পরিচিত মূর্তিটা চোখে পড়ল। পশমের তৈরি ঢিলাঢালা স্কার্ট, লাল শাল, কালো বেনি। গুহা থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে নিচে বারো দুটোর দিকে।

হাতে রাইফেল। বোল্ট টানার শব্দ কানে এল কিশোরের।

যাও। নিজেকে বলল কিশোর। সময় হয়েছে ইসাবেল সম্পর্কে সমস্ত কথা জানার।

মাথা নামিয়েই রাখল সে। ভাবছে, যদি তার অনুমান ভুল হয়ে যায়? যদি তার সন্দেহের জবাব রাইফেলের বুলেট দিয়ে দেয় ইসাবেল?

ঝুঁকি না নিলে জানা যাবে না।

চিৎকার করে বলল সে, 'আম্মা, আমি! আমি টনি, আম্মা!'

চোদ্দ

কিশোরের জীবনের দীর্ঘতম দশটি সেকেণ্ড নড়ল না ইসাবেল।

তারপর রাইফেল হাত থেকে ফেলে দৌড়ে নামতে লাগল কিশোরের দিকে।

'টনি!' চেঁচিয়ে বলছে মহিলা, 'টনি! কোথায় তুই, বাবা! ঠিক আছিস? ভাল আছিস?'

স্প্যানিশ ছাড়া অন্য ভাষা না জানার ভান করছে না এখন। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলছে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'হ্যাঁ, টনি ভালই আছে। চালাকিটা করার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে এছাড়া আপনার সাহায্য পাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। আমাদের সবারই সাহায্য দরকার। টনিরও।'

কয়েক গজ দূরে থমকে দাঁড়িয়েছে ইসাবেল। আরও দশটি সেকেণ্ড কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হাসল অবশেষে।

'এসো,' ডাকল সে। 'বলো আমাকে, কি হয়েছে।'

ফিরে তাকাল কিশোর। শান্ত ভঙ্গিতে পাতা ছিঁড়ছে বারোদুটো। খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। আর কোনদিকে নজর নেই। মহিলাকে অনুসরণ করে ফাটলটার দিকে এগোল সে।

'ডজ কোথায়?' রাইফেলটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মহিলা। পাহাড়ের নিচে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখল লোকটা আছে কিনা।

'ওকে নিয়ে ভাবনা নেই,' গুহায় কি ঘটেছে জানাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। সেফটি ক্যাচ অন করে দিল। 'টনি আর ওর বাবার চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। কাল এই গুহাটা দেখেছি আমি। ভেতরে দু'জনের জিনিসপত্র পড়ে আছে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের ছাপ সব পুরানো। তাই বুঝতে পারিনি কোথায় গেছে ওরা।'

কিশোর জানাল, টনির বাবা গেছে ডিনামাইট কিনতে, যাতে গুহার মুখে পড়ে থাকা পাথরের স্তূপ উড়িয়ে দিতে পারে। পঞ্চো ভিলার গুহায় ঢুকতে চায় দু'জনে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন টনির বাবা।

'ডজের রাইফেল পেলেন কি করে?' জানতে চাইল কিশোর।

'রাতে আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় বারোটা ছুটে গেল। আজ সকালে খুঁজতে বেরোলাম। ওটাকে তো পাইনি, পেলাম এই রাইফেলটা, একটা ক্যাকটাসের গোড়ায়। এতে ডজের নাম খোদাই করা রয়েছে। ডজকে দেখলাম না কোথাও। মনে হল, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। হয়ত আরেকটা রাইফেল নিয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সে। কিংবা বুটের মধ্যে যে ছুরিটা লুকিয়ে রাখে, সেটা হাতে নিয়ে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম তখন এখানে। কারণ এদিক থেকে তাকে বেরোতে দেখেছিলাম।'

হাসল কিশোর। ইসাবেল যখন রাইফেল তুলে নেয়, তখন ডজের কি অবস্থা সেটা ভেবে। ওই লোকটা লুকিয়ে ছিল না, ছিল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে। আর কয়েক মিনিট আগে গেলেই সব দেখতে পেত ইসাবেল। রবিন যেখানে রাইফেল ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেখান থেকে টনির গুহাটা দেখা যায় না। সেজন্যেই ওটাও দেখতে পায়নি ওর মা।

আবার হাসি ফুটেছে ইসাবেলের মুখে। 'কি করে বুঝলে আমিই টনির মা? স্প্যানিশ ছাড়া আর কিছু বলিনি আমি। আর এই পোশাকে একটুও আমেরিকান মনে হয় না আমাকে।'

শালটা হাতে নিয়ে এক বেনি ধরে টান দিল সে। খুলে চলে এল কালো পরচুলা। পকেটে ভরে রেখে আঙুল চালাল সোনালি চুলে।

'মনে হচ্ছিল। স্রেফ সন্দেহ।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। 'দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেদিন রাতে আগুনের ধারে বসে যখন কথা বলছিলেন, বার বার হাতের ঘড়িটাকে নিচ থেকে ওপরে ঠেলে তুলছিলেন। চামড়ায় হালকা রঙের একটা দাগ দেখেছিলাম...'

নিজের হাত দেখাল কিশোর। এই অভিযানে এসে দীর্ঘ সময় রোদে কাটিয়ে চামড়ার রঙ অন্যরকম হয়ে গেছে। হাত ঘড়ি খুলে নিল সে। সর্বক্ষণ ঘড়ি বাঁধা থাকায় কব্জির কাছে একটা রিঙ তৈরি হয়েছে। ওখানটাতে রোদ লাগতে পারেনি,

ফলে চামড়ার আসল রঙ রয়ে গেছে। যেখানে যেখানে রোদ পড়েছে ওখানকার চামড়ার রঙ গাঢ়।

'মেকসিকানদের চামড়ার রঙ সাধারণত বাদামী হয়,' বলল সে। 'সারাক্ষণ হাতে ঘড়ি বাঁধা থাকলে ওখানকার চামড়ার রঙ বড় জোর বাদামী হবে, সাদা হতে পারে না কিছুতেই। কিন্তু অ্যাংলোদের চামড়া হয়ে যায় ফ্যাকাসে সাদা।'

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। 'খুব চালাক ছেলে তুমি, আমার টনির মত।'

'আমার বন্ধু রবিনের চোখে পড়েছে আরেকটা জিনিস। আপনার কন্টাক্ট লেন্স। অভিনয় করার সময় অনেক সময় ওসব পরে নেয় অভিনেতারা, ছবিতে তাদের চোখের রঙ বদলে দেয়ার জন্যে। সেটা যখন বলল আমাকে রবিন, সন্দেহটা আপনার ওপর বাড়ল আমার। সূত্রও বলতে পারেন এগুলোকে। মনে হতে লাগল, বাদামীটা আপনার শরীরের স্বাভাবিক রঙ নয়, আর চোখের রঙও মেকসিকানদের মত গাঢ় বাদামী নয়।'

'না, তা নয়।' মাথা নিচু করে লেন্স দুটো বের করে আনল ইসাবেল। বেরিয়ে পড়ল চোখের আসল রঙ। একেবারে টনির মত, নীল। লেন্সগুলো একটা প্লাস্টিকের কেসে ভরে রেখে দিল স্কার্টের পকেটে।

'তাছাড়া,' কিশোর বলল, 'আপনাকে ইংরেজি বলতেও শুনেছি আমি। তবে, স্প্যানিশে যখন কথা বলছিলেন, তখন সত্যিই আপনার গলা চিনতে পারিনি। আপনিই আমাকে র‍্যাঞ্চে ফোন করে বলেছিলেন লেকের ওপাড়ের গাঁয়ে যেতে।'

কিশোরের হাত ধরল ইসাবেল। 'আমি সত্যি দুঃখিত। পিরেটো আমাকে ওই বুদ্ধি বলেছিল। আমি কল্পনাই করতে পারিনি, দাঁড়টা এতটা পচা। আমি তোমাকে খুন করতে চাইনি। কেবল ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলাম...'

'যাতে শারিকে নিয়ে এখানে আসতে না পারি?'

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। 'আমি আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। ডজ এসে টনি আর ওর বাবাকে খুঁজে পেলে খুন করতে পারে, এই ভয়ে। পেসোগুলো পাওয়ার জন্যে সব করতে পারে সে।' থামল মহিলা। 'এতই ভয় পেয়েছিলাম আমি, আরও বোকামি করেছি। বাসে তোমাদেরকে ঠেকাতে চেয়েছি, যাতে র‍্যাঞ্চে ঢুকতে না পার। তারপর সেদিন রাতে শারিকে চুরির চেষ্টা করেছি। আমার বোঝা উচিত ছিল, ও আমাকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে না।'

একটা পাথরের আড়াল থেকে ওয়াকিটকি বের করল ইসাবেল। ফিতে আছে ওটার। কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল আবার। 'চলো। টনির গুহায়। ওকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে গেছি আমি।'

'পিরেটোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ও, তাহলে এটাও জানো! সবই জানো দেখা যায়!'

দুটো বারোকে নিয়ে চলেছে কিশোর। হাসল। 'অনেক কিছুই অজানা আছে এখনও। এই ধরুন, আপনার আসল নাম। ইসাবেল আপনার নাম নয়, তাই না?'

'না, নেলি। তবে তুমি ইসাবেল বলেই ডাকতে পারো।'

'আসলে, আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে বয়স্কদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম নেই। সেটা অভদ্রতা। আমেরিকায় থাকলে কি হবে, রক্তের টান আর

সামাজিকতা তো ভুলতে পারি না। আপনাকে আমি আন্টি বলেই ডাকব। নেলিআন্টি।'

হাসল ইসাবেল। 'আচ্ছা, ডেকো।'

কিশোর আগের কথার খেই ধরল, 'আমি জানি পিরেটোর একটা ওয়াকিটকি আছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমিই মেরামত করে দিয়েছি। আর সেদিন রাতে যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন আপনি তখন রবিন আপনারটা দেখে ফেলেছিল।'

উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইসাবেল। 'আজ সকালে পিরেটোর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি। জবাব নেই। শেষবার যখন কথা বলেছি, বেশি দূরে ছিল না সে। বড় জোর একদিনের পথ। এতক্ষণে চলে আসার কথা...কিছু হয়েই গেল কিনা...' দ্বিধা করল মহিলা। 'ডজ ওকে দেখে ফেলেছে কিনা কে জানে! তাহলে মেরে ফেলবে!'

'ডজ জানে পিরেটো ওর পিছু নিয়েছে?'

'না জানলেও আন্দাজ করতে বাধা কোথায়? হতে পারে, এ কারণেই ঘোড়ার পা খারাপের ছুতো দিয়ে রয়ে গিয়েছিল পেছনে। তারপর ঘুরে চলে গিয়েছিল, পিরেটোর জন্যে ঘাপটি মেরে ছিল কোথাও। আমাকেও দেখে থাকতে পারে। একটা বারো আর একজন মেকসিকান মহিলাকে কেয়ারই করবে না সে। কিন্তু পিরেটোকে করবে। ঠেকানোর জন্যে খুন করবে।' আবার দ্বিধা করল ইসাবেল। 'হয়তো করে ফেলেছেও!'

'আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন,' মহিলাকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'পিরেটোকে আমি চিনেছি। ডজ চালাক, সন্দেহ নেই। পিরেটো তার চেয়েও অনেক চালাক। ও অন্য জিনিস।'

'হ্যাঁ,' নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতেই যেন বলল ইসাবেল। 'ঠিকই বলেছ।'

দ্রুত পা চালিয়েছে ওরা। যেতে যেতে কিশোর জানাল, কি করে ডজ তাকে ব্যবহার করেছে পঞ্চো ভিলার গুহা খুঁজে দেয়ার কাজে।

টনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ইসাবেল, বলল। টেপে রেকর্ড করা 'কথার চিঠি' নিয়মিত পাঠায় টনির নামে পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে। টনিও তার জবাব পাঠায় লস অ্যাঞ্জেলেসে। সুতরাং শারির অন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব খবরই জানে মহিলা। টনি এ-ও জানিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে, ডজ হয়তো শারির সাহায্যে তাকে আর তার বাবাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে পেসোগুলোর জন্যে।

তারপর পিরেটোর কাছ থেকে একটা চিঠি পায় ইসাবেল। তাতে জানিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে ডজ। সেখানে কোথায় উঠবে সে, তা-ও জানিয়েছে পিরেটো। ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতার কথাও জানিয়েছে। খামের ভেতরে ভরে পাজলের একটা কপি পাঠিয়েছে। লারেটোতে প্রিন্ট করেছে ওটা। পাজলে কি লিখেছে, জানা নেই পিরেটোর। তবে সন্দেহ ঠিকই করেছে, ডজ কোন একটা শয়তানীর মতলবে আছে।

'আমিও প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি,' ইসাবেল বলল। 'তবে ড্যাগউডস

ওয়াইফ কি, বুঝেছিলাম। শারির কথা বলতে চেয়েছে ডজ। হোটেলটার ওপর নজর রাখতে লাগলাম, যেখানে ডজের ওঠার কথা। কয়েক দিন পরেই সেখানে গেল ডজ।'

তারপর থেকে র‍্যাঞ্চারের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল মহিলা। একদিন তার পিছু নিয়ে গিয়ে হাজির হলো পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। গেটের কাছ থেকেই দেখল, অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। গাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে রেখে-হেঁটে ফিরে এল ইসাবেল। জঞ্জালের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে চলে গেল কিশোর আর ডজ কি কথা বলছে শোনার জন্যে।

'তোমাদেরকে কথা বলতে শুনলাম,' ইসাবেল বলল। 'চমকে গেলাম তোমার গলা শুনে। একেবারে টনির গলা।'

দুয়ে দুয়ে চার যোগ করতে আরম্ভ করল তখন মহিলা। অনেক কথাই আন্দাজ করে ফেলল। মেকসিকান রমণীর ছদ্মবেশে তিনি গোয়েন্দাকে অনুসরণ করে চলে গেল লারেডোতে।

'তোমাদেরকে জীপে তুলে নিতে দেখলাম ডজকে। তখন আমি চলে গেলাম লেকের ওপাশের গাঁয়ে। একটা ঘর ভাড়া নিলাম। যোগাযোগ করলাম পিরেটোর সঙ্গে। বনের ভেতর তোমাদের ওপর চোখ রাখলাম। শারি যখন তোমার কথা শুনে তোমার ভক্ত হয়ে গেল, কি ঘটতে চলেছে বাকিটা অনুমান করতে আর অসুবিধে হল না আমার।'

নীরবে পথ চলল কিছুক্ষণ দু'জনে।

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'করো।'

'পিরেটোর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে? আপনার আর ডজের মাঝে এমন কি ঘটেছে যে...'

'একজন আরেকজনকে এতটা ঘৃণা করি, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে অনেক আগের কথা বলতে হয়। আমি ছোট থাকতেই আমার মা মারা যায়। একটা মেকসিকান কোম্পা-নিতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করত আমার বাবা। মা মারা যাওয়ার পর আমাকে মেকসিকোতে নিয়ে গেল। বাবা থাকত খনির কাজে ব্যস্ত, ওই সময়টাতে আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসত পিরেটো। ওই র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল তখন সে। ভালই অবস্থা ছিল তার। গরু পালত, ঘোড়া পালত। একদিন এল ডজ...'

'র‍্যাঞ্চটা নিয়ে নিল পিরেটোর কাছ থেকে।' ডজের অফিসে দেখা দলিলগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের।

'হ্যাঁ। অনেক র‍্যাঞ্চারের মতই ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে কাজ চালাত পিরেটো। ঋণ-পত্রগুলো কিনে নিল ডজ। শেষ চেষ্টা করতে চাইল পিরেটো। গরু-ঘোড়া বিক্রি করে ধার শোধ করতে চাইল। সে সুযোগ দেয়া হলো না তাকে। র‍্যাঞ্চ দখল করে নেয়া হলো। আমি গেলাম তখন আদালতে, পিরেটোকে সাহায্য করতে। লাভ হলো না। ওখানেও ঘুষখোর লোক আছে। তাদেরকে টাকা দিয়ে

বশ করল ডজ। শেষ পর্যন্ত র‍্যাঞ্চটা হারাতেই হলো পিরেটোকে।'

নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল কিশোর। সেখান থেকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ওপারের পর্বতের দিকে। সে আশা করল, ইসাবেলের অনুমান ভুল, খানিক পরেই এসে হাজির হবে পিরেটো।

কিন্তু তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। আসছে না।

গরম লাগল। যেন আগুনের আঁচ। হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা। বাতাসে কোন রকম জানান দেয়নি। বদলে যেতে শুরু করেছে পরিবেশ।

গরম বাড়ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে।

ওপরে তাকাল কিশোর। ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর রঙের মেঘ কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। পর্বতের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে। তীব্র গতিতে সেখান থেকে ওপরে উঠে গেল একঝলক ধোঁয়া। এর আগে দু'বার দেখেছে ধোঁয়া, তার চেয়ে অনেক ঘন এখনকার ধোঁয়া, এবং কালো।

বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ইস, গাধা হয়ে ছিল নাকি এ ক'দিন! নিজেকেই লাথি মারতে ইচ্ছে করল তার। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। মুসা তো প্রশ্নই তুলেছিল, মেঘটা অন্য রকম কেন? তারমানে, ওগুলো ধোঁয়া নয়, মেঘও নয়, বাষ্প।

'আগ্নেয়গিরি!' কথা সরছে না যেন কিশোরের গলা দিয়ে।

ওর হাত আঁকড়ে ধরল ইসাবেল। টেনে দাঁড় করাল। কপালের ওপর হাত নিয়ে এসে সে-ও তাকিয়ে রইল চূড়ার দিকে।

'হ্যাঁ,' ফিসফিসিয়ে বলল, 'আগ্নেয়গিরি! সিয়েরা মাদ্রেতেও আছে, জানতাম না। হাওয়াইতে দেখেছি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। জানি কি ঘটে। এটা ফাটতে যাচ্ছে!'

পনেরো

উৎকণ্ঠিত হয়ে কিশোরের অপেক্ষা করছে টনি, রবিন আর মুসা। উত্তেজনাটা এতই ভারি লাগছে, ওদের মনে হচ্ছে গাঁইতি দিয়েও ছিদ্র করা যাবে না। বকবক করছিল টনি আর রবিন সময় কাটানোর জন্যে, এখন সেটাও বন্ধ। ভাবছে, কতক্ষণ আর ডজকে ওভাবে রাখতে পারবে? বাঁধন খোলার জন্যে মোড়া-মুড়ি করছে আর চেঁচাচ্ছে লোকটা।

ঘড়ি দেখল মুসা। 'দুই ঘণ্টা হয়ে গেল! আর কত?' সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় চলে এল, দেখার জন্যে, কিশোর আসছে কিনা।

চিৎকার থামিয়ে চুপ হয়ে গেল ডজ। যেন বুঝে গেছে, এসব করে কোন লাভ হবে না। যে ভাবে বাঁধা হয়েছে, তাতে শোয়ার চেয়ে বসে থাকাটা সহজ এবং আরামের মনে হলো বুঝি তার কাছে।

'টনি,' অনুনয় করল ডজ, 'আমাকে এক গেলাস পানি দেবে? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে পারছি না।'

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর টনি।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।
'দিচ্ছি,' টনি বলল। উঠে গিয়ে মাটির জগটা নিয়ে এল ডজের কাছে।
রবিন যেখানে বসেছে সেখান থেকে ভালমত দেখতে পেল না এরপর যা ঘটল। ডজের মুখের কাছে টনিকে জগটা তুলতে দেখল সে। পরমুহূর্তেই মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল জগ। টনির গলার পাশে ছুরি চেপে ধরেছে ডজ।
বাঁধন খুলে ফেলেছে ডজ। দড়ির কাটা টুকরো ঝুলছে কব্জি আর গোড়ালি থেকে।
'গাধার দল!' হা হা করে বুনো হাসি হাসল ডজ। 'আমাকে ধরার পর সার্চ করা উচিত ছিল। করোনি। বুটের ভেতর ছুরিটা রয়ে গেছে দেখনি।'
আরেকটু বাড়াল ছুরির চাপ। নড়লেই গলার প্রধান রক্তবাহী শিরা জুগুলার ভেইন কেটে দেয়ার হুমকি দিল।
'রবিন,' কর্কশ গলায় ডাকল ডজ। 'টনির রাইফেলটা নিয়ে এসো। জলদি করো।'
খামোকা হুমকি দিচ্ছে না লোকটা। কথা না শুনলে ঠিকই কেটে দেবে টনির শিরা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে রাইফেলটা। তুলে নিয়ে ডজের দিকে এগোল রবিন।
'রাখ ওখানেই,' ডজ বলল। 'আর এগোনোর দরকার নেই।'
ডজের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে, বরফের মত জমে গেল যেন রবিনের রক্ত। টনিকে খুন করার একটা ছুতো খুঁজছে কেবল র‍্যাঞ্চার। রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রবিন।
টনির গলায় ছুরি চেপে রেখেই হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিল ডজ। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। ছুরিটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিয়ে বোল্ট টানল রাইফেলের। কঠিন গলায় আদেশ দিল, 'যাও, সরো এবার। দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঁড়াও।'
'কিশোরকে দেখলাম না। তবে অদ্ভুত কিছু একটা...'
বলতে বলতে গুহায় ঢুকল মুসা। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে দেখল, দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঁড়িয়েছে রবিন।
'হচ্ছেটা কি...' এবারেও কথা শেষ করতে পারল না মুসা। চোখ পড়ল ডজের ওপর। ওর হাতে রাইফেল। তাক করে রেখেছে মেঝেতে বসা টনির দিকে। মুসার দিকে ঘুরল নলটা। 'বাহ্, এসে গেছ। যাও, তুমিও যাও দেয়ালের কাছে।' টনিকে ধমক দিল, 'এই, তুমি বসে রইলে কেন?'
রবিন জানাল মুসাকে, 'ওর বুটের ভেতর ছুরি ছিল। সেটা দিয়ে...'
'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ডজ। মুসা আর টনিকে আবার যেতে বলল দেয়ালের কাছে।
এতই রাগ লাগছে মুসার, একটা মুহূর্তের জন্যে ভাবল, রাইফেলের পরোয়া না করে ছুটে যাবে কিনা। আবছা অন্ধকারে ছুটন্ত একটা নিশানাকে মিস করতেও পারে ডজ। পরক্ষণেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। তার পাশে এসে দাঁড়াল টনি।

'এবার কি করব?' ফিসফিস করে বলল মুসা।
'কিশোর না আসাতক এভাবেই থাক,' ফিসফিস করেই জবাব দিল রবিন।
শুনে ফেলল ডজ। 'হ্যাঁ, থাক ওভাবেই। একদম নড়বে না।' খিকখিক করে হাসল সে। 'নড়েচড়ে দেখতে পারো অবশ্য। তিনজনের খুলিতে তিনটে গুলি ঢোকাতে পারলে খুশিই হব এখন আমি। ঝামেলা শেষ।'
রাইফেলের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। চুপ হয়ে গেল ওরা।
'এখন যা বলি, শোনো,' ডজ বলল আবার। 'যদি বাঁচতে চাও। টনি, তোমাকে প্রশ্ন করব। ঠিকঠিক জবাব দেবে। নইলে গুলি খাবে তোমার বন্ধুরা।'
চুপ করে আছে টনি।
'তোমার বাবা কোথায়?'
দ্বিধা করছে টনি।
'এদিকে ফের।' আদেশ হলো কর্কশ কণ্ঠে।
ঘুরল টনি। দেখল, ডজের আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারে।
'পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে গেছে,' জবাব দিল টনি।
'কখন ফিরবে?'
মিথ্যেটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল টনি। ডজ যদি বুঝে ফেলে মিছে কথা বলছে সে, রবিন আর মুসার বিপদ হয়ে যাবে।
'আরও দু'দিন লাগবে।'
'পঞ্চো ভিলার গুহাটা পেয়েছ?'
'পেয়েছি।'
'ওটাই যে সেই গুহা কি করে বুঝলে?'
'ভিলার সৈন্যদের একজনের কঙ্কাল পেয়েছি ওখানে।'
'হুঁ। এক কাজ করো। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল তোমার বন্ধুদের। আমাকে যেমন বাঁধা হয়েছিল, তেমন করে।'
গুহার একধার থেকে গিয়ে দড়ি বের করে আনল টনি।
'মুসা,' আদেশ দিল ডজ, 'হাঁটু গেড়ে বসো। হাত আন পিঠের ওপর।'
নড়ল না মুসা। গটমট করে তার কাছে এসে দাঁড়াল ডজ। রাইফেলের নল ঠেকাল ঘাড়ে। ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শে শিউরে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।
'জলদি করো!'
বিড়বিড় করে নিজেকেই একটা গাল দিল মুসা, অসতর্ক হয়েছিল বলে। হাঁটু গেড়ে বসে পিঠের ওপর হাত নিয়ে এল।
ঢিল করে বাঁধল প্রথমে টনি। কিন্তু ফাঁকিটা ধরে ফেলল ডজ। শক্ত করে বাঁধার জন্যে ধমক লাগাল ওকে।
রবিনকেও বাঁধা হলো।
ডজ বলল, 'এবার কিছু প্রশ্নের জবাব জানা দরকার আমার।'
'বাঁধাই তো আছি,' রবিন বলল। 'আর জবাব দিয়ে কি হবে?'
হেসে উঠল টনি আর মুসা।
'চুপ!' চেঁচিয়ে উঠল ডজ। রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মারল রবিনের বুকে।

রাগে জ্বলে উঠল রবিনের চোখ। কিছু বলল না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল।

'কিশোর গেছে কোথায়?' জানতে চাইল ডজ।

'আমরাও তো সে কথাই জানতে চাইছি,' মুসা বলল। 'বোধহয় পিজাটিজা কিনতে গেছে।'

'বাজে কথা রাখ!'

ডজের চেহারা দেখতে পাচ্ছে টনি। জবাব না পেলে অনর্থ ঘটাবে ওই লোক, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার। সে তখন বলল, 'ইসাবেলের খোঁজে।'

'ইসাবেল কে?'

'আমরা জানি না। শুধু জানি, মহিলা মেকসিকান।' তিন গোয়েন্দার কাছে যা যা শুনেছে, সেভাবে চেহারার বর্ণনা দিল। 'কয়েক দিন ধরে নাকি ওদেরকে অনুসরণ করে এসেছে। আজ সকালে তার বারোটাকে দেখেছি গুহার বাইরে। কাজেই শারির সাহায্যে ওটাকে নিয়ে গেছে কিশোর ইসাবেলকে খুঁজে বের করার জন্যে।'

'বন্দুক-টন্দুক আছে মহিলার কাছে?'

দ্রুত ভাবছে টনি। আছে, সেটা বলা কি ঠিক হবে? ওরা তো নিশ্চিত নয়। বলল, 'আমরা জানি না।'

'বেশ। সতর্ক থাকতে হবে আরকি আমাকে। কালো চুলের বেনি।' রাইফেলটা রবিনের দিক থেকে টনির দিকে ফেরাল ডজ। 'আমাকে ভিলার গুহায় নিয়ে চল। কোন চালাকির চেষ্টা করবে না। আমি তোমার পেছনেই থাকব।'

গুহা থেকে বেরিয়ে গেল দু'জনে। সুড়ঙ্গে ওদের জুতোর শব্দ শোনা গেল।

পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন খোলার চেষ্টা চালাল দুই গোয়েন্দা।

'হাত খুলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হুডিনির মত জাদু জানলে পারতাম। তুমি?'

'একই অবস্থা। কিশোরটা যে কোথায় গেল!'

'চলে আসবে ঠিকমতই, দেখো। ওকে বোকা বানানো কঠিন। সব সময়ই একটা না একটা বুদ্ধি বের করে ফেলে। ডজকে দেখে ফেললেই আন্দাজ করে ফেলবে কি ঘটেছে। তাছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে শারি। আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিতে পারবে কিশোরকে।'

'তা বটে।...আচ্ছা, একটা গন্ধ পাচ্ছ?'

নাক কুঁচকে শ্বাস টানল রবিন। 'মনে হয় পচা ডিমের।'

'বাইরে অদ্ভুত কিছু ঘটছে,' মুসা বলল। 'আমি যে তখন বাইরে গিয়েছিলাম, দেখি, কালো হয়ে গেছে সব কিছু। যেন রাত নামছে পর্বতে। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত আকাশে। ...হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, পচা ডিমের মতই গন্ধ।'

'আগেও কয়েকবার ধোঁয়া দেখেছি, মনে আছে?' আচমকা চিৎকার করে বলল রবিন, 'পচা ডিম নয়, গন্ধক! আগ্নেয়গিরিতে থাকে! খোদা, একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছি আমরা!'

কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার চোখ। 'খাইছে! এই গুহায় থাকলে আমাদের তো কিছু হবে না! কিন্তু কিশোরের? সে তো রয়ে গেল বাইরে!'

ষোলো

'শুয়ে পড়ুন!' বলে উঠল কিশোর। 'জলদি! শুয়ে পড়ুন!'

আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে ভলকে ভলকে উঠছে কালো ধোঁয়া। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ইসাবেল। কালো কুয়াশার মত ঢেকে ফেলেছে পর্বতের চূড়া। মহিলার হাত ধরে টেনে তাকে একটা বড় পাথরের আড়ালে নিয়ে গেল সে।

'কি হয়েছে?'

'আস্তে বলুন!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'ডজ!'

কিছু ছাই ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। জোরাল বাতাস বইছে। ধোঁয়া সরিয়ে নিচ্ছে। বাতাসে রাসায়নিক পদার্থের গন্ধ। সাবধানে মাথা বের করে উঁকি দিল কিশোর। আধ মাইল মত দূরে রয়েছে র‍্যাঞ্চার। এদিকেই আসছে। সে একা নয়।

ওর আগে আগে হাঁটছে টনি। ঘাড়ের পেছনে দুই হাত তোলা। পিঠের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে ডজ।

'টনি!' ইসাবেলও দেখেছে ছেলেকে।

হাত চেপে ধরে তাকে আটকে রাখতে হলো কিশোরকে। নইলে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল মহিলা।

'ওভাবে হবে না,' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'টনিকে বাঁচাতে পারবেন না। গুলি খাবেন ডজের।'

যে-কোন মুহূর্তে, ভাবছে সে, বারো দুটোকে দেখে ফেলতে পারে ডজ। টনির ওপর কড়া নজর না থাকলে এতক্ষণে দেখে ফেলত।

রাইফেল তুলল ইসাবেল। 'ওর হাতে গুলি করার চেষ্টা করি।' বাঁট ঠেকাল কাঁধে। নল রাখল পাথরের ওপর।

সাবধানে নিশানা ঠিক করল সে। ট্রিগারে চেপে বসতে শুরু করল আঙুল। টিপে দিল পুরোপুরি।

গুলির শব্দের অপেক্ষা করছে কিশোর। কিছুই ঘটল না। বেরোল না গুলি।

আবার ট্রিগার টিপল ইসাবেল। হলো না কিছু এবারেও। আবার টিপল। আবার।

'সেফটি ক্যাচ!' কিশোর বলল। 'অন করা আছে।'

দ্রুত হাতে ক্যাচ অফ করে দিল ইসাবেল। আবার নিশানা করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বারো দুটোকে দেখে ফেলেছে ডজ। লাফিয়ে এসে টনির কাঁধ চেপে ধরল। ওর শরীর দিয়ে আড়াল করল নিজেকে।

রাইফেল নামাল ইসাবেল। মৃদু কণ্ঠে স্প্যানিশ ভাষায় কি বলল, বোঝা গেল না। গালই দিল বোধহয়।

বেল্ট থেকে ছুরি খুলে নিল ডজ। টনির পিঠে ঠেকাল। ওকে হাঁটতে বলে নিজেও পা বাড়াল পেছনে।

ইসাবেলের কাঁধের ওয়াকিটকিটা নিজেই খুলে নিল কিশোর। সুইচ অন করল মেসেজ পাঠানোর জন্যে। ঠোঁটের কাছে ধরে বলল, 'পিরেটো! পিরেটো! শুনতে

পাচ্ছেন?' স্প্যানিশ ভাষায় বলল সে। 'পিরেটো! কাম ইন! ওভার।'

রিসিভ করার জন্যে সুইচ টিপল। নীরবতা।

পরের একটা মিনিট চেষ্টা চালিয়ে গেল কিশোর। একশ গজ দূরে আছে আর ডজ এগিয়ে আসছে। টনির পিঠে ছুরি ঠেকানো।

ওয়াকিটকি নামিয়ে রেখে ইসাবেলের বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'আপনার উইগ পরে নিন।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পরচুলা বের করে পরে নিল ইসাবেল।

দশ গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল ডজ।

'ইসাবেল, বেরিয়ে আসুন,' ডাক দিল সে।

নড়ল না ইসাবেল।

'ভয় পাবেন না,' স্প্যানিশ ভাষায় বলছে ডজ। 'আমি জানি ওই পাথরের আড়ালেই আছেন আপনি। ছেলেরা আপনার কথা সব বলেছে আমাকে। আমাদেরকে অনুসরণ করে আপনি এসেছেন এখানে। আমার রাইফেলটাও পেয়েছেন। যা হবার হয়েছে। আসুন। দেখি, একটা রফায় আসতে পারি কিনা আমরা।'

উঠে দাঁড়াল ইসাবেল। দু'হাতে চেপে ধরেছে রাইফেল।

কিশোর বসেই রইল। ভাবছে, মুসা আর রবিনকে কোন ভাবে কাবু করে ফেলেছে র‍্যাঞ্চার। বোধহয় ওই ছুরি দিয়েই বাঁধন কেটে ফেলেছিল। যেটা ঠেকিয়ে রেখেছে টনির পিঠে। তবে যতক্ষণ ডজ না জানছে সে এখানে রয়েছে, ততক্ষণ চমকে দেয়ার একটা আশা রয়েছে। হয়ত সুযোগ বুঝে কাবু করে ফেলতে পারবে লোকটাকে।

রাইফেলের ট্রিগারে ইসাবেলের আঙুল।

'আপনাকে আমি চিনি,' ইসাবেল বলল, 'সিনর মরিস। পঞ্চো ভিলার পেসোর খোঁজে এসেছেন।'

'ঠিকই ধরেছেন,' স্বীকার করল ডজ। 'আপনিও এসেছেন সেজন্যেই।'

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। 'আমি জানি কোথায় লুকানো আছে ওগুলো। আপনি জানেন না।'

'জেনে যাব।' টনিকে ঠেলা দিল ডজ চলার জন্যে, নিজেও এগোল। 'এই ছেলেটা আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে ও আর ওর বাবা মিলে জায়গাটা বের করে ফেলেছে।'

'ভুল বলেছে আগে জানত, এখন আর জানে না। কাল আমি গুহাটা পেয়ে গিয়ে পেসোগুলো সরিয়ে ফেলেছি। ছুরিটা সরান। তারপর, আসুন কথা বলি, দেখি কি করা যায়।'

'বেশ।' ছুরিটা বেল্টে গুঁজল আবার ডজ। 'দু'জনেই আমরা সমান সমান অবস্থায় আছি। দু'জনের কাছেই রাইফেল। তবে পেসোগুলো এই এলাকা থেকে সরাতে হলে আপনাকে আমার সাহায্য নিতেই হবে।' পর্বতের চূড়ার দিকে তাকাল সে। 'ওটাও আর সময় পেল না আগুন ছিটানোর!'

এখনও এগোচ্ছে ডজ, ধীরে ধীরে, টনিকে বর্ম বানিয়ে।

'থামুন!' কড়া গলায় বলল ইসাবেল। কিন্তু বিপদটা আঁচ করতে দেরি করে ফেলেছে।

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডজ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুমি!' ইংরেজিতে বলছে সে এখন, 'মেকসিকান উইগ দিয়ে বোকা প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলে! কিন্তু ওই নীল চোখ লুকাবে কোথায়, নেলি?'

কন্টাক্ট লেন্স লাগাতে ভুলে গিয়েছিল ইসাবেল।

তারপর পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।

রাইফেল তুলতে শুরু করল ইসাবেল। লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ডজ। নিশানা করল ইসাবেলের দিকে।

গুলির শব্দ শুনল কিশোর।

ডজের হাত থেকে যেন উড়ে চলে গেল রাইফেলটা। পাঁচ গজ দূরে পাথরের ওপর গিয়ে পড়ল।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে একটানে লোকটার কোমরে গোঁজা ছুরি কেড়ে নিল কিশোর।

খটাখট খটাখট শোনা গেল খুরের শব্দ। ঘোড়া ছুটিয়ে এল পিরেটো। হাতে একটা .৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট পিস্তল। সেটা তাক করল ডজের দিকে। হুঁশিয়ার করল, 'পরের বার আর বাঁটে সই করব না, মাথায় করব।' ইসাবেলের দিকে তাকাল। মহিলাও তার রাইফেল তাক করে রেখেছে ডজের দিকে। এইবার সেফটি ক্যাচ অফ করা আছে।

'গুলি করো না,' ইসাবেলকে বলল পিরেটো। 'ছেড়ে দাও। গুলি করে মারলে লাশ কবর দেয়ার সময়ও পাব না। আর কবর না দিতে পারলে, খোলা জায়গায় শকুনের খাবার বানিয়ে রেখে গেলে অভিশাপ লাগবে আমাদের ওপর।'

ডজের দিকে তাকাল সে। চিৎকার করে বলল, 'যাও, ভাগ! গিয়ে খুঁজে বের করো তোমার পেসো!'

কালো হয়ে গেছে ডজের মুখ, রাগে। চোখে তীব্র ঘৃণা।

'যাও! যাচ্ছ না কেন?' স্প্যানিশ ভাষায় আবার ধমকে উঠল পিরেটো। 'পঞ্চো ভিলার গুহায় যাও। টনিকে সঙ্গে নেয়ার আর দরকার নেই। ওটাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট চিহ্ন দেখতে পাবে। পায়ের ছাপের ছড়াছড়ি এখন ওপথে।'

এক সেকেণ্ড পিরেটোর দিকে তাকিয়ে রইল ডজ। ওর চোখে খুনীর দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। কিন্তু কিছু করার নেই। পুরোপুরি অসহায় এখন। গুলি করে ওর রাইফেলের বাঁট ভেঙে দিয়েছে পিরেটো। ছুরি কেড়ে নিয়েছে কিশোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ভিলার গুহাটা যেদিকে রয়েছে সেদিকে।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল মা-ছেলে। ঘোড়া থেকে নামল পিরেটো। 'হতচ্ছাড়া এই ওয়াকিটকি! কাল রাতে হাত থেকে পড়ে গিয়ে আবার নষ্ট হয়ে গেছে। শব্দই বেরোচ্ছে না।'

চূড়ার দিকে তাকাল কিশোর। আরেক ভলক কালো ধোঁয়া বেরোল।

'রবিন আর মুসাকে বের করে আনা দরকার,' বলল সে। 'গুহায় আটকা

থাকলে মরবে।'

মুখের ভেতর দুই আঙুল পুরে জোরে শিস দিল পিরেটো। ঢালের ওপাশ থেকে ছুটতে ছুটতে এল আরেকটা ঘোড়া। চিনতে পারল কিশোর ডজ ওটাতে করেই এসেছিল।

'ওটাকে বাঁধা দেখলাম,' পিরেটো জানাল। 'খুলে নিয়ে এসেছি। চলো, জলদি চলো, পালাই এখান থেকে।'

কিশোর চড়ল শারির পিঠে। ইসাবেল তার নিজের বারোতে, আর টনি চড়ল ডজের ঘোড়ায়। আগে আগে রওনা হলো কিশোর, টনির গুহার দিকে।

গুহা থেকে শ'খানেক গজ দূরে থাকতে কি যেন এসে বিঁধল কিশোরের গালে। তারপর হাতে। কপালে হাত রেখে ওপরে তাকাল সে।

পাথর-বৃষ্টি হচ্ছে!

খুদে পাথর ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। একটা পড়ল কাঁধে। ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে সে। ছ্যাঁকা লাগল হাতে। কিছুতেই শার্ট থেকে খুলতে না পেরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। পাথর নয়। ছোট একটা কাচের পুঁতি, আগুনের মত গরম।

পাহাড়ের চূড়ায় ঘটছেটা কি? দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে সাংঘাতিক বিপদ যে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শারিকে আরও জোরে চলার তাগাদা দিল কিশোর। পেছনে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়াগুলোও চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মিনিট খানেক পরেই দেয়ালের মত ঢালটার কাছে চলে এল ওরা। থামল।

জিনের নিচে ভাঁজ করে রাখা কম্বলটা বের করল পিরেটো। ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করতে লাগল।

ততক্ষণে রওনা হয়ে গেছে কিশোর। তাকে ডেকে বলল পিরেটো, 'তাড়াতাড়ি আসবে।'

সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর। গুহায় এসে দেখল, পিঠে পিঠ লাগিয়ে বাঁকা হয়ে আছে মুসা আর রবিন। মুসা সবে রবিনের বাঁধনের একটা গিঁট খুলেছে।

ডজের ছুরি দিয়ে দ্রুত ওদের বাঁধন কেটে মুক্ত করল কিশোর।

'আমি তো ভেবেছি পিজা কিনতে দেরি করছ।' হাত-পা ছড়িয়ে, ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগল মুসা। 'তারপর? কোথায় দোকানটা?'

রবিনও মুসার মতই হাত-পা ঝাড়ছে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের মাথার দিকে। 'ব্যাপার কি? মাথায় পুঁতি পরার শখ হলো কেন হঠাৎ?'

চুলে আঙুল চালিয়ে ওগুলো ফেলার চেষ্টা করল কিশোর। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে পুঁতির মত জিনিসগুলো, কিন্তু আটকে গেছে এমন করে, আঙুল দিয়ে চিরুনি চালিয়ে কিছুতেই সরাতে পারল না। 'আকাশ থেকে পড়ল। গরম কাচের টুকরো। এসো, বেরোও, জলদি।'

সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে প্রায় দৌড়ে বেরোল ওরা। কাচ-বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে আপাতত। কম্বলের লম্বা কয়েকটা টুকরো ওদেরকে দিয়ে বলল পিরেটো, 'নাও, মাথায় জড়াও। হাতেও পেঁচিয়ে নাও। খোলা রাখবে না।' ওর নিজের

মাথায় আর হাতে ইতিমধ্যেই জড়ানো হয়ে গেছে
লাল শালটা দিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢেকেছে ইসাবেল।

'চলো, এবার যাই,' তাগাদা দিল পিরেটো।

কাউকে বলতে হলো না। মুসা চড়ে বসল টনির পেছনে। রবিন পিরেটোর।

এই বার আগে আগে চলল মেকসিকান। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে জোরে চলা বিপজ্জনক, কিন্তু পরোয়া করল না সে, বার বার তাগাদা দিতে লাগল ঘোড়াকে। নেমে চলল নিচের উপত্যকার দিকে। যে নালাটা পাহাড়ের ঢালে গভীর খাঁজ সৃষ্টি করে নেমেছে, সেটাতে নেমে আরও তাড়াতাড়ি চলার নির্দেশ দিল পিরেটো। পেছনে ভারি একটা গুড়ুগুড়ু শোনা গেল, মেঘ ডাকার মত। বাতাসে গন্ধকের গন্ধ বেড়ে গেছে, শ্বাস নেয়াই কঠিন।

নালায় নামার খানিক পরেই ঘটল ঘটনাটা। আধ মাইল দূরেও নেই আর গুহাটা, এই সময় পেছনে ফেটে পড়ল যেন আগ্নেয়গিরি। মুসার মনে হলো, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে গোটা পর্বত।

চূড়া থেকে খাড়া উঠে গেল গরম গলিত লাভা, ফোয়ারার মত ঝরে পড়তে লাগল। আরও লাভা ছিটকে উঠল ওপরে। পড়ল, উঠল। প্রতিবারেই আরও বেশি ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওপরে উঠে এমন করে ছড়াচ্ছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। অসংখ্য বোমা ফাটার মত শব্দ হচ্ছে জ্বালামুখের ভেতরে। কানে তালা ল্যাগানোর জোগাড়। শুধু যে লাভা বেরোচ্ছে তা নয়, সাথে করে পর্বতের গভীর থেকে নিয়ে আসছে পাথর। ঢাল বেয়ে গড়াচ্ছে সেগুলো। গনগনে কয়লার মত গরম। নামতে শুরু করেছে লাভার স্রোত।

ক্রমেই জোর বাড়ছে লাভার। শত শত ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছে এখন। ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে পাথরের ওপর। ঢাল বেয়ে নামছে। চলার পথে ঢেকে দিয়ে আসছে পাথর, গাছপালা সব কিছু। বাষ্প উঠছে। এদিক-ওদিক থেকে এসে মিলিত হচ্ছে লাভার একাধিক স্রোত। যতই নামছে চওড়া হচ্ছে আরও। গলিত লাভার নদী হয়ে নামছে নিচের দিকে।

গরম ছাই, পাথরের কুচি আর কাচের টুকরোর বৃষ্টি পড়তে লাগল যেন অভিযাত্রীদের ওপর। চমকে চমকে উঠছে ভীত জানোয়ারগুলো। গরম পাথর আর কাচের ছ্যাঁকা লাগছে ওগুলোর খোলা চামড়ায়। আর সইতে না পেরে পিরেটোর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ পেছনের দুই পায়ে ভর করে। পরক্ষণেই মাটিতে নেমে লাথি মেরে যেন তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল অবাঞ্ছিত বিপদকে। পিরেটোও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ঘোড়াটাকে। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে রবিন।

'শারিকে নিয়ে এসো!' চেঁচিয়ে উঠল পিরেটো।

বারোটাকে নিয়ে দ্রুত এগোল কিশোর।

'ঘোড়াগুলোর মাঝে ঢুকিয়ে দাও ওকে!' পিরেটো বলল। 'শান্ত করুক!'

লম্বা দম নিল কিশোর। তারপর প্রায় চোখমুখ বুজে বারোটাকে নিয়ে এগোল আতঙ্কিত দুটো ঘোড়ার মাঝের সরু ফাঁকে ঢোকানোর জন্যে।

ওদের মাঝে একটা শান্ত জানোয়ারকে দেখে ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলোও শান্ত হয়ে এল। দুলকি চালে চলছে শারি। ঘোড়াগুলোও একই রকম করে চলতে লাগল।

পাথর-বৃষ্টি পাতলা হয়ে এল জোরাল বাতাসে। নাকে এসে ঝাপটা মারল বাতাস। গন্ধকের গন্ধে দম আটকে যাওয়ার অবস্থা হলো কিশোরের। তাড়াতাড়ি কম্বলের টুকরো দিয়ে নাকমুখ চাপা দিল। আশঙ্কা হতে লাগল তার, এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে তো?

পেছনে ফিরে তাকাল রবিন। এগিয়ে আসছে আগুন-গরম, লাল রঙের গলিত লাভা। পাথর গলিয়ে ফেলছে। আগে আগে ছুটছে প্রাণ ভয়ে ভীত ছোট ছোট জানোয়ারের দল, চিৎকার করে উড়ছে পাখিরা। জ্বলে উঠছে ঝোপঝাড়। শিল-নোড়া দিয়ে কাচ গুঁড়ো করার মত একটা শব্দ উঠছে কড়কড় কড়কড় করে। লাভার নদী বয়ে আসার সময়ই হচ্ছে শব্দটা।

গেছি, ভাবল সে। এভাবেই তাহলে মরণ লেখা ছিল কপালে! মুসাকে বলল, 'যাক, আর দশজনের মত সাধারণ মৃত্যু হচ্ছে না আমাদের।'

'ঠিক,' জবাব দিল মুসা। 'আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়ে মরার ভাগ্য ক'জনের হয়?'

পর্বতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জনে। ছুটে আসা লাভার উত্তাপ এসে লাগছে চোখে, জ্বালা করছে। কিন্তু তার পরেও চোখ বন্ধ করল না, জোর করে পাতা মেলে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

কাচ ভাঙার শব্দ বাড়ছে। সেই সাথে মারাত্মক ওই আগুনের নদীর ওপর কালো এক ধরনের আস্তর পড়ছে। জমে যাচ্ছে লাভা। ঢাল বেয়ে গড়ানো কমছে। আশা ঝিলিক দিয়ে গেল রবিনের মনে। গড়িয়ে গড়িয়ে যেন অনেক কষ্টে এগোল আরও কয়েক গজ, আগের সে জোর নেই, তারপর থেমে গেল একেবারেই।

ছাই আর গরম পুঁতি-বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেসব পেছনে ফেলে এল ভীত ঘোড়া আর বারোগুলো।

অবশেষে বিপদসীমা ছাড়িয়ে আসতে পারল ওরা।

আরও আধ মাইল পর পৌঁছল উপত্যকায়। পিরেটো ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পরের পর্বতটার দিকে। কিছুদূর গিয়ে থামল।

বিষাক্ত ধোঁয়া আর গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিয়েছে, এতক্ষণে তার জের শুরু হলো। কাশতে আরম্ভ করল সবাই। নাক উঁচু করে বড় বড় দম নিয়ে টেনে নিতে লাগল তাজা বাতাস। ফিরে তাকাল আগ্নেয়গিরির দিকে।

পিরেটো দেখতে পেল তাকে প্রথমে। হাত তুলে দেখাল অন্যদেরকে। বহু দূরে একটা মূর্তি লাফিয়ে চলেছে পাথর থেকে পাথরে। পড়ে যাচ্ছে, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠছে আবার, সরে আসার চেষ্টা করছে ভিলার গুহার কাছ থেকে।

পর্বতের এদিকটায় লাভার স্রোত সবে চূড়ার একটা নিচে নেমেছে, তরল রয়েছে এখনও, নেমে আসতে শুরু করল দ্রুত। সামনে এখন জীবন্ত যা কিছু পড়বে, ধ্বংস করে দেবে ওই মৃত্যু নদী!

পর্বতের ভেতরে শব্দ অদ্ভুত সব কাণ্ড করে। আগ্নেয়গিরির গর্জনকে ছাপিয়েও কি ভাবে জানি শোনা গেল ডজের আতঙ্কিত চিৎকার। একবারই, তারপর হারিয়ে গেল গলিত লাভার নিচে। ঢেকে দিয়ে ছুটে নামতে থাকল মারাত্মক ওই তরল পদার্থ।

চোখ বন্ধ করে ফেলল চার কিশোর। কিশোর ভাবছে, বাজে লোক ছিল ডজ মরিস, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার খাবার খেয়েছে ওরা, তার বাড়িতে থেকেছে, এক সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সাধারণ ভাবে মরলে এতটা খারাপ লাগত না। কিন্তু এরকম ভয়াবহ মৃত্যু! মনই খারাপ হয়ে গেল।

নিজের বুকে ক্রুশ আঁকল পিরেটো। বিড়বিড় করে প্রার্থনা কারল স্প্যানিশ ভাষায়।

'তোমাকে বলেছিলাম না,' কিশোরকে বলল সে। 'বিপদ আছে পাহাড়ে। দেখলে তো।'

পাহাড়ের পাদদেশের পথ ধরে এগোল আবার ওরা। পিরেটোর পাশে পাশে চলছে ইসাবেল। 'পিরেটো, কিছু মনে কোরো না। জানি, তোমার লোভ নেই, কিন্তু পেসোগুলো পেলে অনেক সুবিধে হত। র‍্যাঞ্চটা আবার কিনে নিতে পারতে।'

'কে জানে?' পিরেটো বলল আনমনে, 'আপনাআপনিই হয়তো আমার র‍্যাঞ্চ আমার কাছে ফিরে আসতে পারে আবার।'

হাসল সে। লোভের ছিটেফোঁটাও নেই সে হাসিতে।

'ভিলার গুহাটার কথা প্রথম শুনি মায়ের কাছে,' জানাল মেকসিকান। 'মা আমাকে বলেছিল, অভিশপ্ত ওই পেসো কেউ কোনদিন পাবে না। ভিলার বহু লোক মারা গেছে এর জন্যে। এখনও মরা সৈন্যদের প্রেতাত্মা পাহারা দিচ্ছে ওগুলোকে।' একটা মুহূর্ত থামল সে। তারপর বলল, 'পাহারা দিয়ে যাবে আজীবন।'

সতেরো

বিপদ সীমার বাইরে থেকে, আগ্নেয়গিরিকে বহুদূর দিয়ে ঘুরে চলতে লাগল দলটা। পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে যাবে, যেখানে আগ্নেয়গিরির উৎপাত পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া ঘনঘন অগ্ন্যুৎপাত হয় বলে কাছাকাছি থাকেনি লোকে, এমন জায়গায় রয়েছে যেখানে লাভা পৌঁছতে পারে না কোনমতেই। এমনকি গরম ছাইও না।

কথাবার্তা তেমন বলছে না ওরা। কিশোরের মন এখন শান্ত। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

পিরেটোর কাছে ভিলার গুপ্তধনের কথা প্রথম শুনেছে ইসাবেল। ১৯১৬ সালে ওর দাদা ছিল পঞ্চো ভিলার সেনাবাহিনীতে। ইসাবেল পিরেটোকে কথা দিয়েছিল, তার স্বামী আর ছেলে যদি পেসোগুলো খুঁজে পায় তাহলে অর্ধেক দিয়ে দেবে ওকে।

ডজ জানত না গুপ্তধনের কথা। তার কাছ থেকে এটা গোপন রাখা হয়। পিরেটো ঘুণাক্ষরেও কখনও তার সামনে উচ্চারণ করেনি। এই সময় টনি এসে একদিন হাজির হলো অন্ধ বারোটাকে নিয়ে। পিরেটোর সঙ্গে পেসোগুলোর কথা

আলোচনা করার সময় শুনে ফেলে ডজ। জেনে যায় টনি আর তার বাবা গুহাটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

টনিকে রাজি করাতে না পেরে শেষে শারিকে দিয়ে গুহাটা খুঁজে বের করার ফন্দি আঁটে ডজ।

র‍্যাঞ্চারের বীভৎস মৃত্যুর ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি কিশোর। ডজের লোভই তাকে ওরকম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে এটা দেখার পরেও যদি পেসো আনতে না যেত তাহলে আর এভাবে মরতে হত না।

একটা গর্তের ধারে থামল ওরা, জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্যে। তারপর আবার এগোনোর পালা। কয়েক মাইল এগিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ কানে এল কিশোরের। দূর থেকে আসা অসংখ্য বারোর মিলিত ডাক। সাড়া দিল শারি। বাড়িয়ে দিল চলার গতি।

একটা বন থেকে বেরোতেই জোরাল শোনা গেল আওয়াজ।

বিশাল উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল তৃণভূমি। শত শত বুনো বারো চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। লাফালাফি করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে গেছে শারি। খাড়া হয়ে গেছে লম্বা কান, ডগা কাঁপছে মৃদু মৃদু। হঠাৎ জোরে তীক্ষ্ণ এক ডাক ছাড়ল সে। ওর পিঠ থেকে নেমে পড়ল কিশোর। জিন আর লাগাম খুলে নিল। তারপর আদর করে চাপড় দিল গলায়।

বড় বড় কোমল চোখ মেলে তার দিকে তাকাল শারি। নাক ঘষল গায়ে, যেন বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তারপর এগিয়ে গেল টনির কাছে। ঘোড়ার পিঠে থাকায় ওর বুক নাগাল পেল না বারোটা, পায়েই নাক ঘষল। নিচু হয়ে শারির মাথা চাপড়ে দিল টনি।

আর দেরি করল না শারি। মহা আনন্দে ছুটল স্বজাতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

ইসাবেলের বারোর পেছনে চড়ে বসল কিশোর।

আবার রওনা হলো দলটা। তাড়াতাড়ি করলে অন্ধকারের আগেই পৌঁছে যেতে পারবে গাঁয়ে। ওখান থেকে চিহুয়াহুয়ায় বাবাকে ফোন করবে টনি। জানাবে সে আর তার মা নিরাপদেই পিরেটোর সঙ্গে গাঁয়ে চলে এসেছে।

পরদিন সকালে বাস ধরে আমেরিকায় রওনা হবে তিন গোয়েন্দা।

'লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখা করব আমি তোমার সাথে,' একসময় রবিনকে বলল টনি। 'রক কনসার্ট আমার খুব ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখব কয়েকটা।'

'চলে এসো, যে-কোন সময়, খুশি হয়েই দেখাব।'

পাশাপাশি চলছে মুসা আর কিশোর। পিরেটো আর ইসাবেলের সঙ্গে। মুসা বলল, 'একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, ডজ কি করে জানল লস অ্যাঞ্জেলেসেই পাওয়া যাবে টনির মত কণ্ঠস্বরের লোক? যেন একেবারে জেনেশুনেই গেছে, ওখানে রয়েছে কিশোর পাশা। আমেরিকার অন্য কোন জায়গায় গেল না কেন?'

'জেনেশুনেই তো গেছে,' জবাব দিল পিরেটো।

'জেনেশুনে গেছে?'

'তাই তো।' হাসল মেকসিকান। 'তোমরা যে কতখানি বিখ্যাত, তা তোমরা নিজেরাও জানো না। অনেকেই চেনে তোমাদেরকে। বিশেষ করে তোমাদের ওই টিভি অনুষ্ঠান "পাগল সঙ্ঘ" দেখার পর।'

'অনুষ্ঠানটা ডজও দেখেছিল নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'দেখেছিল। আমিও দেখেছি। টনি যখন র‍্যাঞ্চে গেল, ওর গলা শুনে তো আমি চমকেই উঠেছিলাম। আরি, টেলিভিশনের মোটুরাম এল কোত্থেকে!' বলেই চোখ পড়ল কিশোরের ওপর। মুখ কালো করে ফেলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলল পিরেটো, 'সরি, কিশোর, তোমাকে রাগানোর জন্যে বলিনি।' টেলিভিশনের সৌজন্যে সে-ও জানে, ওই ডাকনাম একদম পছন্দ নয় কিশোরের।

হাসল মুসা। 'তাহলে এই ব্যাপার। মোটুরামই ডজকে টেনে নিয়ে গেছে রকি বীচে। আসলে আমাদের জন্যে ফাঁদ পাততেই গিয়েছিল লোকটা।'

'এবং সেই ফাঁদে দিব্যি পা দিয়ে বসেছে রহস্য পাগল কিশোর পাশা,' মুচকি হাসল টনি।

নীরবে পথ চলতে লাগল আবার দলটা।

কিশোর ভাবছে, বীন আর চাল সেদ্ধর কথা। যতদিন বেঁচে থাকবে, আর একটা বীন কিংবা চাল দেখতে চায় না সে। যদিও জানে, চাল ছাড়া থাকতে পারবে না। লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকলেও সে ভাতেরই পাগল। সে এবং তার চাচা রাশেদ পাশা। ভাত ছাড়া চলে না। আমেরিকাতে থেকেও পুরোদস্তুর বাঙালী।

চলতে চলতে হঠাৎ মুসার চোখ পড়ল রবিনের টি-শার্টের ওপর। লেখা রয়েছেঃ সারভাইভার!

তাই তো! এর চেয়ে সত্যি কথা আর হতে পারে না ওদের জন্যে। সারভাইভার! অনেক কষ্টেই তো বেঁচে ফিরল।

পেছনে ফিরে তাকাল মুসা। তাকিয়ে রইল পর্বতমালার দিকে। এত বিপদ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে, তবু আবার যদি তাকে ওখানে যেতে বলা হয়, নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যাবে, এর এমনই এক আকর্ষণ। এই আকর্ষণই যুগ যুগ ধরে টেনেছে মানুষকে। সাড়া না দিয়ে পারেনি মানুষ। সমস্ত বিপদ, বাধা, ভয় উপেক্ষা করে ছুটে গেছে ওর কাছে। মুসাও তো মানুষ, প্রচণ্ড এই আকর্ষণ এড়ানোর ক্ষমতা তার কোথায়?

—x—
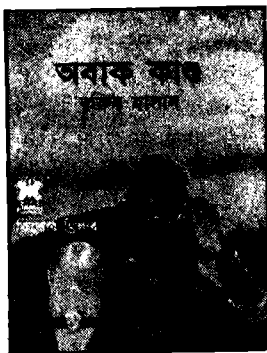
অবাক কাণ্ড

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

'ঘটনাটা কি…?' গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর পাশা। সোজা হতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল পুরানো সাদা রঙের শেভি ইমপালার হুডে।

মাল নিয়ে ফিরে এসেছেন রাশেদ পাশা। উদ্ভট সব জিনিস কেনায় জুড়ি নেই তাঁর, কিন্তু এবার যেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন।

ইয়াডের বড় ট্রাকটার ড্রাইভিং হুইল ধরে বসে আছেন তিনি। মাথায় পুরানো একটা রোমশ টুপি, পেছনে ঝুলে রয়েছে র‍্যাকুনের লেজ। টুপি বটে একখানা! ট্রাকের পেছনে ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী, ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভার বিচিত্র সব জিনিসের মধ্যে বসে আছে।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রাশেদ পাশার! সেদিকে তাকিয়ে সরে আসতে গিয়ে কনুই লেগে উল্টে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর রাখা একটা মবিলের ক্যান। ক্র্যাংককেসের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে ঢুকে যেতে শুরু করল ঘন তেল।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা আমান। গাড়ির চেসিসের নিচ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল। 'না বলতেই ঢেলে দিলে কেন?'

দেখার মত চেহারা হয়েছে তার। চেসিসের নিচে কাজ করতে গিয়ে এমনিতেই কালিতে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর পড়েছে মবিল। কোঁকড়া চুল বেয়ে গড়াচ্ছে। ইঞ্জিনের মবিল পাল্টাতে নিচে ঢুকেছিল সে। কিশোরকে বানিয়েছিল সহকারী। কিন্তু বলার আগেই তেল ঢেলে দিয়েছে কিশোর।

রেগে গিয়ে মুসা বলল, 'কি হয়েছে?'

ক্যানটা আবার সোজা করে ফেলেছে কিশোর। কিন্তু দেরিতে। সমস্ত তেল পড়ে গেছে ততক্ষণে। বলল, 'সরি! চমকে গিয়েছিলাম!'

'কেন? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে?' বলেই চোখ পড়ল মেরিচাচীর ওপর। অফিসের বারান্দা থেকে নেমে গটমট করে এগিয়ে আসছেন ট্রাকের দিকে। রাশেদ পাশার দিকে তাকিয়ে মুসাও চমকে গেল কিশোরের মতই। 'খাইছে! এ কি কাণ্ড!'

'রাশেদ পাশা!' ফেটে পড়লেন যেন মেরিচাচী। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! এসব কি এনেছ!' মালগুলোর দিকে হাত নাড়লেন তিনি। 'এই জঞ্জাল দিয়ে কি হবে!'

'জঞ্জাল নয় এগুলো,' শান্তকণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। 'ইয়ার্ডের মাল, বিক্রির জন্যে। যারা চিনবে, তারা কিনবে।'

'তোমার মাথার ওই টুপিটাও? আয়নায় দেখেছ মুখটা?'

পেছন থেকে লেজটা সামনে নিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। লম্বা বেনিতে যেমন হাত বোলায় মেয়েরা, তেমনি করে বোলাতে বোলাতে বললেন, 'একেবারে আসল মাল। খাঁটি জিনিস। র‍্যাকুনের চামড়ায় তৈরি ডেভি ক্রকেট ক্যাপ।'

দ্রুত ট্রাকের পেছন দিকে চলে এলেন মেরিচাচী। 'যারা চিনবে, তারা কিনবে! হতচ্ছাড়া সব জিনিস! ট্রাঙ্কটার মধ্যে কি?'

নিজেই উঠে গিয়ে টান দিয়ে ডালা তুলে ফেললেন। 'এতগুলো কমিকের বই! এর জন্যে টাকা নষ্ট করলে!'

কয়েক লাফে ট্রাকের পেছনে পৌঁছে গেল কিশোর। কৌতূহলে ফাটছে। উঠে পড়ল ট্রাকে। ট্রাঙ্কের ভেতর গাদা গাদা কমিকের বই।

'মারছে!' মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাকের কাছে। 'লোকটা সাংঘাতিক কমিক ভালবাসত তো! যার কাছ থেকে এনেছে।'

'অনেক পুরানো,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় অনেকদিন ফেলে রেখেছিল।' মুসার দিকে ঝুঁকল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা আছে তোমার কাছে?'

'বেশি না,' পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা।

'অ্যাই, কি হয়েছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। সবেমাত্র ইয়ার্ডে ঢুকেছে সে। গায়ে সাদা পোলো শার্ট। পরনে খাকি প্যান্ট। সুন্দর লাগছে ওকে।

দেখে খুশি হলো কিশোর, 'এই যে, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। দেখো তো পকেটে কত টাকা আছে?'

পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। 'বেশি নেই। টানাটানি। কেন?'

হাসল কিশোর। 'কিছু কমিক কিনব।'

বইগুলো ঘাঁটছেন মেরিচাচী। আরও কিছু আছে কিনা দেখছেন ট্রাঙ্কের ভেতরে। 'কি কারণে যে এগুলো আনল! এখন কার কাছে বিক্রি করি? কাস্টোমার কোথায়?'

'এখানে।' রবিনের হাত থেকে টাকাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে নিল কিশোর। নিজের পকেটে যা আছে বের করল। তিনজনেরটা একসাথে করে দ্রুত গুনে ফেলল। 'নাও,' বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'একুশ ডলার সত্তর সেন্ট। তোমার সমস্ত যন্ত্রণা কিনে নিলাম আমরা। কি বলো, চাচী?'

'নিয়ে যা! জানে বাঁচলাম!' টাকাটা নিতে গিয়েও দ্বিধা করলেন মেরিচাচী। 'কি করবি ওসব পচা কমিক দিয়ে?'

'কমিক নিয়ে কি করে মানুষ? পড়ব।'

চোখে সন্দেহ দেখা দিল মেরিচাচীর। 'তোর মতলবটা কি বলো তো? কমিক নিয়ে ডুবে থেকে কাজে ফাঁকি দেয়ার ফন্দি না তো?'

হেসে ফেললেন রাশেদ পাশা। 'টাকা দিচ্ছে, নিয়ে নাও। এতক্ষণ তো কোথায় বেচবে কোথায় বেচবে করছিলে। কাস্টোমার পেয়েছ, দ্বিধা কিসের?'

তবু দ্বিধা করছেন মেরিচাচী। কোন উদ্দেশ্য না থাকলে কিশোর টাকা দিয়ে কিনত না। এমনিতেও অবশ্য বিক্রির জিনিস প্রয়োজন হলে কিনে নেয় সে, আর দশজন কাস্টোমারের মতই। আবার নিজে যখন কাজ করে দেয়, তখনও তার পারিশ্রমিক নিয়ে নেয়। কঠোর ভাবে মেনে চলে ব্যবসার নিয়ম কানুন। যদিও

পুরো ব্যবসাটা একদিন তারই হবে, তবু 'নিজের মনে করে' কিছু নিয়ে নেয় না। তার এই নিয়মনিষ্ঠায় খুবই খুশি মেরিচাচী। বলেন, সাংঘাতিক উন্নতি করবে একদিন তাঁর ছেলে। কিশোরকে ছেলেই ভাবেন নিঃসন্তান মারিয়া পাশা।

'আরে নাও না,' টাকাটা চাচীর হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'একলা তো কিনিনি। তিনজনে মিলেই কিনেছি।'

'সেজন্যেই তো ভয়! কি ফন্দি করেছিস কে জানে!'

আর কথা বাড়াল না কিশোর। মুসাকে নিয়ে মাল নামাতে শুরু করল। নিচে দাঁড়িয়ে সাহায্য করল রবিন। 'এগুলোর জন্যে টাকা নিয়েছ?'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে আজকে ওর,' মুসা বলল। 'প্রথমে আমার মুখে তেল ঢালল। তারপর টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে গিয়ে কতগুলো পুরানো কমিক...'

'মবিল?' মুসার মাথা শুঁকে নাক কুঁচকাল রবিন। 'আমি তো ভেবেছিলাম, মাথায় তেল দেয়া আরম্ভ করেছ বুঝি।'

'এসব কথা বাদ দাও তো!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল। 'বললে তো টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে কতগুলো পুরানো কমিক কিনেছি। আসলে টাকা খাটালাম, মস্ত লাভের জন্যে।'

'টাকা খাটালে?' ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের।

'যা দিয়েছ তার বহুগুণ ফেরত পাবে।' ট্রাঙ্কটায় টোকা দিল কিশোর।

'এই আবর্জনা থেকে?' মুসার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'অত অবহেলা কোরো না। এর মধ্যে গুপ্তধন লুকানো আছে। জানো, পুরানো কমিকের দাম মাঝে মাঝে কত বেড়ে যায়? কিছু তো হাজার হাজার ডলারে বিক্রি হয়।'

'হাজার হাজার...?' ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'নিশ্চয়ই। তবে কয়েকশো ডলার তো পাবই।' দুই হাতের তালু এক করে জোরে জোরে ডলল কিশোর। 'বেশিও হতে পারে। তাতে আমার একটা গাড়ি কেনা হয়ে যাবে হয়তো। তবে যাই লাভ হবে, তিনজনে ভাগাভাগি করে নেব আমরা।'

পরের শুক্রবারে মুসার ইমপালায় চড়ে শহরতলীতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। তিনজনেরই অবসর। মুসার বাড়িতে কাজ নেই, রবিনের ছুটি, আর মেরিচাচীও কিশোরকে নতুন কাজ গছাতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ সেদিন কোন কাজই নেই ইয়ার্ডে।

প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে এগজস্ট পাইপ থেকে। রিয়ারভিউ মিররে সেই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল মুসা। 'তুমি একটা সর্বনাশ করেছ, কিশোর। সেই যে মবিল ফেললে তার জের এখনও চলছে। ইঞ্জিনের গা থেকে পুড়ে শেষ হয়নি।...আমার চুলে তো এখনও গন্ধ আছে!'

'তেল তো অনেক ভাল,' রবিন ফোড়ন কাটল। 'পুরানো কমিক পড়তে পড়তে যে অন্ধ হয়ে যাইনি এটাই বেশি। বাপরে বাপ! লাইব্রেরিতে পুরানো বই মোছার চেয়ে বিরক্তিকর এটা।'

‘তোমার মত বইয়ের পোকাও একথা বলছ?’ সামনের রাস্তার ওপর মুসার নজর। ‘তবে যা-ই বলো, কিছু কিছু পড়তে কিন্তু ভালই লেগেছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে, যখন ওসব পড়তাম। যেমন ধরো, ক্রিমসন ফ্যান্টমের কথাই।’ মাথা নেড়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। ‘ও তো সাংঘাতিক জিনিস। এখনও ভাল্লাগে।’

‘তোমার লাগে,’ পেছনের সীটে বসেছে রবিন। মেঝেতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা মলাটের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখভঙ্গি করল। ‘আমার লাগে না।’ বাক্সটায় একটা লাথি মেরে বলল, ‘এগুলো আমার পড়তে হয়েছে, ভাল না মন্দ বোঝার জন্যে, ভাবলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। কমিকের মধ্যে কিছু আছে নাকি!’

‘সাবধান!’ ঘাড় ঘুরিয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, ‘এগুলো ব্যবসার মাল। নষ্ট করলে টাকা নষ্ট হবে। মাখনগুলো খুঁজে বের করতে হবে আগে আমাদের, সব চেয়ে দামিগুলো। ছিঁড়েটিড়ে নিয়ে গেলে হয়তো কিনতেই রাজি হবে না ইন্টারকমিকনের ওরা।’

‘ওরাই যদি বাঁচায়। নইলে এসব আবর্জনা কিনবে কে গাঁটের পয়সা খরচ করে? ভাগ্যিস কাগজে কমিকস কনভেশনের খবরটা পড়েছিলে।’

কিশোর হাসল। ‘রবিন, এতটা কিপটে হয়ে গেলে কি করে তুমি? দাঁড়াও, আগে পেয়েনি টাকাটা। গোনার কাজে লাগিয়ে দেব। গুনতে গুনতে শেষে টাকার ওপরই ঘেন্না ধরে যাবে…’

‘এসে গেছি,’ ঘোষণা করল মুসা। ‘দ্য সেনচুরি গ্র্যাণ্ড প্লাজা।’

কাচ আর ইস্পাতে তৈরি পরিষ্কার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো চকচকে টাওয়ারটার দিকে তাকাল রবিন। ‘এরকম একটা জায়গায় কমিক বিক্রি হয়!’

আগস্ট মাসের পচা গরম পড়ছে। ঘামছে কিশোর। বলল, ‘এই মুসা, গাড়ি এখানেই রাখ কোথাও। গিয়ে দেখা যাক কি ধরনের সম্মেলন হচ্ছে।’

ড্রাইভওয়ে দিয়ে হোটেলের আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে এল মুসা। আজব এক কংক্রীটে তৈরি জঙ্গলের মত লাগছে জায়গাটাকে। মোটা মোটা থাম ধরে রেখেছে ছাত এবং তার ওপরের বাড়িটাকে। উজ্জ্বল রঙ করে জায়গাটাকে মোটামুটি একটা সুন্দর রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু কতটা সফল হয়েছে বলা মুশকিল। মুসার অন্তত ভাল লাগছে না। গাড়ির এগজস্টের ধোঁয়া, অল্প আলো, আর অসংখ্য থামের ছায়া কেমন যেন ভূতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ।

খালি একটা জায়গায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে মুসা বলল, ‘নাও, থামলাম। বেরোও সবাই।’

‘বেরোও বললেই কি আর হয়,’ রবিন বলল। ‘যা একখান বোঝা নিয়ে এলাম। লেখাগুলো যেমন বিচ্ছিরি, ওজনটাও তেমনি বাজে। ‘দেখি, নাও তো।’

‘আবার এটাতেও আমাকে টানছ কেন?’ প্রতিবাদ জানাল মুসা ‘তোমাদেরকে ড্রাইভ করে যে এখানে নিয়ে এলাম, সেটা কিছু না?’

‘সেটা আমিও করতে পারতাম।’

‘পারলে তো তোমার ফোক্স ওয়াগেনে করেই আসতাম। ওই গোবরে পোকার

ভেতরে জায়গা হলো না বলেই তো···আসলে ওই বাক্সটার জন্যেই হলো না।'

বিরক্ত চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের যখন এতই কষ্ট লাগছে, ঠিক আছে, আমিই নিতে পারব।' বাক্সটা ধরে টান দিল সে। 'আগের মত শুঁটকি ভাব নাকি আমাকে?'

'না, তা ভাবব কেন?' মুসা বলল। 'জুডো ক্লাসের ব্যায়াম অনেক মেরামত করে দিয়েছে তোমাকে। শরীর আরও ভাল হয়ে যেত, যদি কারাতে শিখতে।'

'এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে।' ভারি বোঝা নিয়ে এলিভেটরের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই হাঁপিয়ে উঠল কিশোর।

কল বাটন টিপতেই খুলে গেল এলিভেটরের দরজা।

ঢুকল তিনজনে। পায়ের শব্দ কানে এল। দৌড়ে আসছে কেউ এলিভেটর ধরার জন্যে। ঝট করে একটা হাত ঢুকে গেল দরজার ফাঁকে, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই। আবার ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। একজন লোক। শরীরের মাংস খসে খসে পড়ছে তার।

দুই

ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখে আরেকটু হলেই হাত থেকে কমিকের বাক্স খসে পড়ে যাচ্ছিল কিশোরের।

লাফিয়ে এলিভেটরে উঠে লোকটা বলল, 'সরি, চমকে দিলাম।' গোয়েন্দাদেরকে একধারে সরে যেতে দেখে হাসল। কাঁধের গিঁটলি হয়ে যাওয়া একটুকরো মাংস দুই আঙুলে টিপে ধরল সে। 'ল্যাটেক্স সেজেছি আমি। কমিকের মাংস খসা ভূত। প্রতিযোগিতার সাজ। কেমন লাগছে?'

'একেবারে বা-বা-বা,' তোতলাতে লাগল কিশোর, 'বাস্তব!'

লবিতে পৌঁছল এলিভেটর। যেমন তাড়াহুড়ো করে উঠেছিল, তেমনি করেই নেমে গেল 'মাংস খসা ভূত'। জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেল। লবির আরও অনেকেই নানা রকম সাজে সেজেছে। সবই কমিক বইয়ের চরিত্র। এলিভেটর থেকে নেমে মারবেলের মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর দিয়ে ক্রোমের ফ্রেম করা অ্যানাউন্সমেন্ট বোর্ডের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। 'ইনটারকমিকন,' পড়ল কিশোর, 'মেইন কনফারেন্স হল।' তাকাল দুই সহকারীর দিকে। 'অনেক বড় মনে হচ্ছে।'

সম্মেলন যেখানে হবে সেদিকে এগোল ওরা। সাধারণ একটা কাঠের টেবিলের সামনে একদল মানুষকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। টেবিলের পেছনে বসে একটা মেয়ে। সোনালি রঙ করা চুল। মাঝখানে কালো রঙের একটা শিং গজিয়েছে, চুলগুলোকেই বাঁধা হয়েছে ওরকম করে। গায়ে কালো রঙের টি-শার্ট, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা: ইনটারকমিকন স্টাফ। তিন গোয়েন্দা কাছে যেতেই বলল, 'দশ ডলার করে প্রতিটি।'

ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, কালো কালির বড় একটা ইঙ্ক প্যাড থেকে

স্ট্যাম্পে কালি নিয়ে ছাপ দিয়ে দিল গোয়েন্দাদের ডান হাতের উল্টো পিঠে।

কিশোর লক্ষ করল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় রবিনের হাতটা ধরে রাখল মেয়েটা। এবং এই প্রথম হাসল।

মুসাও ব্যাপরটা লক্ষ্য করেছে। কিশোরের দিকে মাথা কাত করে বলল, 'রবিনটা যে কি জাদু করে বুঝি না! মেয়েগুলো ওকে দেখলেই আরেক রকম হয়ে যায়...'

'যা খুশি করুকগে।' হাতের ছাপটার দিকে তাকাল কিশোর। লেখা হয়েছেঃ ইন্টারকমিকন—ডে ১। বিড়বিড় করল সে, টিকেটের চেয়ে খরচ কম, ফাঁকিবাজিরও ভয় নেই। ইচ্ছে করলেই আমরা নিয়ে গিয়ে কোন বন্ধুকে দিয়ে দিতে পারব না এটা, টিকেট হলে যেমন পারা যায়। মোট কথা যাকে দেয়া হয়েছে শুধু তার জন্যেই এটা প্রযোজ্য।'

রবিনের পেছন পেছন কনফারেন্স হলের দরজায় এসে দাঁড়াল দু'জনে। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। ষাঁড় যেন। এর গায়েও কালো টি-শার্ট। হাত বাড়াল টিকেট চাওয়ার ভঙ্গিতে।

যার যার ডান হাত বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।

ছাপগুলো পরীক্ষা করল লোকটা। তারপর হাসল। বেরিয়ে পড়ল একটা ভাঙা দাঁত। সরে গেল একপাশে। পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। ঢুকল এসে যেন এক সাংঘাতিক পাগলখানার মধ্যে।

লবির শান্ত পরিবেশের তুলনায় এই জায়গাটাকে মনে হলো আরব্য রজনীর কোন সরগরম মেলা, কিংবা বাজার। বিশাল হলঘরে পাতা হয়েছে কাঠের শত শত ফোল্ডিং টেবিল। কিছু টেবিল ব্যবহার হচ্ছে কাউন্টার হিসেবে, রাশি রাশি কমিকের বই স্তূপ হয়ে আছে ওগুলোতে। কিছু টেবিলে গায়ে গায়ে লাগিয়ে স্টল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলের পেছনে লাগানো হয়েছে তাক আর ডিসপ্লে বোর্ড, ওগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে রঙচঙে কমিকের বই। বইগুলোকে যত্ন করে অয়েল পেপারে মোড়া হয়েছে। সংগ্রাহকের জিনিস। যার পছন্দ হবে অনেক দাম দিয়ে কিনবে।

অনেক মানুষ। যেখানে ফাঁক পেয়েছে গাদাগাদি করে রয়েছে। হাঁটার উপায় নেই। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে এগোতে হয়। বুড়ো-বাচ্চা, সব বয়েসের মানুষই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কমিকের ওপর, দামদর করছে। পছন্দ হলে কিনছে, না হলে সরে যাচ্ছে আরেক কাউন্টারে। বিচিত্র সব পোশাক পরে রয়েছে অনেকে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় দলেই আছে এই সাজের বাহার। হট্টগোলে কান ঝালাপালা।

পাথর হয়ে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তিন বন্ধু। লম্বা, পাতলা লাল চুলওয়ালা, ইনটারকমিকনের টি-শার্ট পরা একজন মানুষ সরে এলেন ভিড়ের ভেতর থেকে। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'প্রথম এলে বুঝি,' বললেন তিনি। 'তোমাদের অবাক হওয়া দেখেই বুঝেছি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'ইনটারকমিকনে স্বাগতম। আমি লুই মরগান। এই কনভেনশনের চীফ।' হাসলেন। 'পাগলাগারদ মনে হচ্ছে তো?' কিশোরের হাতের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তো, কি নিয়ে এলে?'

ওদের কথা শোনার পর হাসিটা বাড়ল তাঁর। 'অনেক পাইকার পাবে এখানে।' হাত ছড়িয়ে স্টলগুলো দেখালেন তিনি। সব চেয়ে বড় গ্রুপটা হলো সুমাতো কমিকস। তাদের টাকা আছে, ভাল দাম দিতে পারবে। ওই যে, ওদিকটায় ওদের স্টল।' লম্বা একটা আঙুল তুলে ঘরের একধারে দেখালেন।

নির্দেশ মত ঘরের ওই পাশটায় চলে এল তিন গোয়েন্দা। ছোট একটা স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে থামল কিশোর, কমিকের সাথে সাথে টি-শার্টও বিক্রি হয় ওখানে। তিনজনের জন্যেই একটা করে শার্ট কিনল সে। ওগুলোতে ছাপ মারা রয়েছেঃ কমিক লাভারস ডু ইট উইথ পিকচারস।

সুমাতো কমিক লেখা স্টলটা চোখে পড়ল ওদের। অনেক বড়। ডান পাশের অর্ধেক জুড়ে দেয়াল ঘেঁষে বিরাট এক দোকান সাজানো হয়েছে। খরিদ্দারও প্রচুর।

টেবিলের কাছে যাওয়ার আগে দ্বিধা করল তিন গোয়েন্দা। সব কিছু দেখে নিয়ে তারপর যেতে চায়।

পাঁচজন অল্পবয়েসী লোক দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপাশে। খরিদ্দার সামলাচ্ছে। একজনের এক কানে দুল। সে কথা বলছে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে। একটা 'থাণ্ডারবীম' কমিকের তিন নম্বর সিরিজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দিয়ে দিলাম চার ডলারেই।' বইটার মলাটে নায়কের ছবি আঁকা। নিজের চোখ থেকে লেজার রশ্মি বের করে ট্যাঙ্ক ফুটো করে ফেলছে। 'তোমার ভাগ্য ভাল, খোকা। পেয়ে গেলে। এখানে আর কোন দোকানে এই কমিক পাবে না।'

তাড়াতাড়ি টাকা বের করে দিল ছেলেটা, যেন দেরি করলেই হাতছাড়া হয়ে যাবে ওই অমূল্য সম্পদ ।

নিচু গলায় দুই বন্ধুকে বলল রবিন, 'আসার সময় এইমাত্র দেখে এলাম আরেকটা স্টলে, এক ডলারের কমিকের স্তূপে ফেলে রেখেছে ওই একই জিনিস।'

মুসা বলল, 'পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে আমি নতুন কিনে পড়েছি।'

সুমাতো স্টলের আরও কাছাকাছি এসে তিন গোয়েন্দা দেখল এক জায়গায় একটা টেলিভিশনে ভিসিআর লাগিয়ে রেখেছে একজন সেলসম্যান। শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল, গায়ে কালো টি-শার্ট। 'অ্যাসট্রোঅ্যাইসেস' কমিকের কিছু দৃশ্য দেখাচ্ছে। ইদানীং টিভিতে বেশ গরম করে রেখেছে ওই নতুন সাইন্স ফিকশনটা। বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। লোকটা বলছে, 'এই পার্টটা টিভিতে আসতে আরও দু'এক হপ্তা লাগবে। চালাকি করে আগেই জোগাড় করে ফেলেছি আমরা। শহরের কেউ দেখার আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। জলদি নিয়ে নিন, শেষ হওয়ার আগেই।'

বলে খরিদ্দারদের দিকে কি-করে-ফেলেছিনু-রে এমন একটা ভঙ্গিতে তাকাল সে।

বছর বিশেক বয়েসের এক তরুণ টাকা বাড়িয়ে দিল।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'অযথা টাকা খরচ করছে। কয়েকদিন অপেক্ষা করলে বিনে পয়সায়ই দেখতে পারত। চাইলে ভিসিআরে রেকর্ডও করে নিতে পারত।'

'টাকা দিচ্ছে একটা জালিয়াতি করে আনা টেপের জন্যে,' রবিন বলল।

নিশ্চয় ঘুষ দিয়ে নিয়ে এসেছে। নয়ত সিণ্ডিকেট যখন টিভি কোম্পানিতে পাঠাচ্ছিল ছবিটা, তখন স্যাটেলাইট বীম দিয়ে ধরে রেকর্ড করে ফেলেছে। মহা শয়তান ব্যাটারা!'

'কত রকমের পাগল যে আছে দুনিয়ায়,' কিশোর বলল। 'টাকাও আছে খরচও করছে। ওরা কিনছে বলেই ঠকানরও সুযোগ পাচ্ছে। দেখি, আমরা কি করতে পারি?'

এগিয়ে গেল কিশোর।

একজন সেলসম্যান মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলো, কি করতে পারি?'

দ্বিধা করছে তিন গোয়েন্দা।

'ও, তোমরা কিনবে না? বেশ, না কিনলে সরে দাঁড়াও। যারা কিনবে তাদের জায়গা দাও।'

'না,' কিশোর বলল, 'আমরা কিনব না।'

স্টলের কাছ থেকে সরে এসে রবিনের দিকে তাকাল সে। বলল, 'এরা ডাকাত। বেচতে পারব না এদের কাছে। ওটা কোথায় দেখেছিলে? চার ডলারেরটা যেখানে এক ডলারে বিক্রি করে?'

'ওদিকে,' রবিন বলল। 'ইমারজেন্সি একজিটের কাছে। কি যেন একটা নাম। পাগল না উন্মাদ, কি যেন।'

স্টলের নামের সঙ্গে ম্যাড কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে অবশ্য, তবে মালিক সত্যি পাগল কি-না কে জানে! যদিও তাঁকে দেখলে পাগল বলেই সন্দহ হবে। এলোমেলো কোঁকড়া কালো চুল, পুরু গোঁফ। দোকানের নাম 'ম্যাড ডিকসন'স ওয়ার্ল্ড'। তরুণ সহকারীকে ডেকে বললেন, 'জনি, চট করে ওপরে গিয়ে আরও কয়েক বাক্স কমিক নিয়ে এসো।' তারপর ঘুরতেই চোখ পড়ল লম্বা, বিষণ্ন চেহারার একজন মানুষের দিকে। চাঁদিতে টাক। তিনপাশে পাতলা চুল, ধূসর হয়ে এসেছে।

ধমকে উঠলেন ম্যাড, 'আবার এসেছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ফ্যান ফানের কপিটার জন্যে সাড়ে তিনশো দিতে রাজি আছি।'

মাথা নাড়লেন ডিকসন। 'পাঁচ।'

আরও বিষণ্ন হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। দর কষাকষি শুরু করলেন, 'ঠিক আছে, সাড়ে চার।'

'ছয়।'

'কিন্তু লেখা তো রয়েছে মাত্র সাড়ে চারশো!' মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন ক্রেতা।

'এখন আর ছয়ের কমে বেচব না।' জনাব পাগলও কম যান না। বুনো দৃষ্টি ফুটেছে চোখে।

হাত মুঠো করে ফেললেন ক্রেতা। 'বেশ ছয়ই দেব।'

হাসি ফুটল পাগলের চোখে। 'বলতে বেশি দেরি করে ফেলেছেন। এখন

সাত।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার। 'সাত! বেচতে চান না নাকি কারও কাছে?'

'কারও কাছে বেচতে চাই না কথাটা ঠিক নয়। আপনার কাছে চাই না।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্রেতা। গটমট করে চলে গেলেন। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মিস্টার ডিকসনের দিকে ফিরে বলল, 'কাস্টোমারদের সঙ্গে এরকম আচরণই করেন নাকি?'

'সবার সঙ্গে করি না। যারা বেশি বিরক্ত করে, ঘাড়ে এসে চাপতে চায়, তাদের সঙ্গে করি। বড় একটা কমিক পাবলিশিং কোম্পানিতে চাকরি করে। ভীষণ বিরক্ত করে এসে।' কিশোরের বাক্সটার দিকে তাকালেন ডিকসন। 'তোমরা কি জন্যে এসেছ? কিনবে, না বেচবে?'

'বেচব।' বাক্সটা টেবিলে রেখে ডালা খুলল কিশোর।

ভেতরের জিনিসগুলো দেখলেন ডিকসন। 'ভাল জিনিস কিছু আছে।' চোখ চকচক করছে তাঁর। 'সিলভার এজ-এর বই দুটো তো বেশ ভাল কণ্ডিশনে আছে। তাছাড়া কিছু নাম্বার ওয়ানস···ঠিক আছে, যা আছে, আছে। পুরো বাক্সটাই বেচে দাও। চারশো ডলার দেব।'

দাম শুনে কান গরম হয়ে যাচ্ছে টের পেল কিশোর। বুঝল, মুখেও রক্ত জমছে। শুরুতেই এত! তার পরেও বলল, 'মাত্র চার? অর্ধেকও তো বলেননি। দাম জানা আছে আমার···'

বাধা দিয়ে ম্যাডম্যান বললেন, 'ওভারস্ট্রীট গাইডে দেখিয়েছ তো? ওরা বলবেই। আরও অনেক দাম হাঁকবে, কিন্তু কিনবে না। শয়তানি আরকি। কি লিখে রেখেছে দেখোনি? কেউ যাতে এসে কিছু বলতে না পারে। লিখেছে, আমাদের কাছে যা আছে, ওগুলো আরও অনেকের কাছেই থাকতে পারে। দামেরও তফাৎ হতে পারে। কাজেই কেনার আগে চিন্তা করে নেবেন। আমরা লাভ করার জন্যেই বসেছি, লাভ করব।'

'সেটা তো সততার পরিচয় দিয়েছে,' কিশোর বলল। 'লাভ করবে বলেছে ডাকাতিও করছে না, ঠকাচ্ছেও না···'এর বেশি আর বলতে পারল না সে। টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে রবিন আর মুসা। নিচু গলায় বলল, 'কি যা-তা বকছ অনেক বেশি দিতে চাইছে, দিয়ে দাও। খরচ করেছি একুশ ডলার, পাচ্ছি চারশো আর কত!'

'বেশিই পাব,' কিশোর বলল। 'এক কথায়ই যখন চারশো দিতে রাজি হয়েছে, জিনিসের দাম আরও অনেক বেশি। দরাদরি করতে অসুবিধে কী?'

ম্যাডম্যানের দিকে ঘুরতে গেল কিশোর। কিন্তু ঘোরা আর হলো না। দৃষ্টি আটকে গেল নীল সোনালি রঙের ওপর।

ওদেরই বয়েসী একটা মেয়ে। বেশ লম্বা। সুন্দর সোনালি চুল প্রায় কোমরের কাছে নেমে এসেছে। নীল সিল্কের আলখেল্লা গায়ে। ভেতরে পরেছে হলুদ রঙের একটা বাদিং স্যুট, রঙটা এতই উজ্জ্বল, সোনালিই লাগছে। হাত আর পা পুরোপুরি বেরিয়ে আছে। পায়ে হলুদ বুট। হাঁটাও খুব সুন্দর। চোখ ফেরানো যায় না।

কিশোরও ফেরাতে পারছে না।

সেটা দেখে হাসলেন ম্যাড। 'চোখে লেগে যায়, না? কস্টিউম কনটেস্টে স্টেলারা স্টারগার্লের মত পোশাক পরেছে। কেন প্রতিযোগিতায় জিতে যায় এরা, বুঝি...'

'হ্যাঁ, দামের ব্যাপারটা,' কমিক বিক্রির কথায় ফিরে এল কিশোর। বলেই আবার চোখ ফেরাল মেয়েটার দিকে।

'দেখি তো আবার,' বলে বাক্সে আবার হাত ঢোকালেন ডিকসন। দশটা কমিক টেনে বের করে বললেন, 'এগুলো আমি সহজেই বেচতে পারব। আসলে দামও এগুলোরই। ঠিক আছে, একটারই দামদর হোক। তিনশো দিতে রাজি আছি।'

শুনছে না কিশোর।

'তোমাকে দামের কথা বলছে, কিশোর,' কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল রবিন।

জোর করে যেন মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরাল গোয়েন্দাপ্রধান। মেয়েদের দিকে এভাবে সাধারণত তাকায় না সে। নিশ্চয় কোন কারণ আছে, বুঝতে পারছে তার দুই সহকারী।

'মোটামুটি ভালই দাম বলেছেন,' বলেই আবার মেয়েটার দিকে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের মুখ।

এক পলকের জন্যে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল হলুদ রঙ। পরক্ষণেই লাল কস্টিউম পরা একটা মূর্তির আড়ালে চলে গেল মেয়েটা। মঠবাসী ভিক্ষুর আলখেল্লার মতই লাগছে পোশাকটা, রঙ বাদে। মূর্তিটা আরও কাছে এলে কিশোর দেখল, মুখোশ পরেছে লোকটা। সাদা-কালো মড়ার মুখ। না না, কঙ্কালের মুখ।

আনমনেই মাথা নেড়ে আবার ম্যাডম্যানের দিকে ফিরল কিশোর। অন্যমনস্ক অবস্থাটা চলে গেছে। বলল, 'তিনশো ডলার বললেন, না? আমাদের সব চেয়ে দামি মাল এগুলোই। যে কেউই কিনতে চাইবে, কেবল এগুলোর জন্যেই...'

আলখেল্লা পরা 'মড়াটা' তার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল। বাদুড়ের ডানার মত দুলে উঠল লাল আলখেল্লার প্রান্ত। বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর।

নাটকীয় ভঙ্গিতে মূর্তিটাকে হাতে তুলতে দেখল সে। ছড়িয়ে দিয়েছে লম্বা লম্বা আঙুল। টান টান হয়ে গেছে হাতের ফ্যাকাসে চামড়া। চারটে ছোট ছোট বল পড়ল মেঝেতে।

ধোঁয়ায় ঢেকে গেল ম্যাড ডিকসনের স্টলটা।

তিন

হঠাৎ এই ধোঁয়া দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল কিছু কমিক ক্রেতা। কিন্তু এই চিৎকার কিছুই না, আসল হট্টগোল শুরু হল ধোঁয়া সরে যাওয়ার পরে।

'হায় হায়রে!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন ম্যাড ডিকসন, 'আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে! ডাকাতি!' মাথা ঝাঁকাচ্ছেন বার বার, তাতে এলোমেলো চুল আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গোঁফ কেমন যেন ফাঁক ফাঁক হয়ে বিকট করে

তুলেছে মুখটাকে। 'গেল কোথায় ব্যাটা! লাল আলখেল্লা! ক্রিমসন ফ্যান্টম কস্টিউম! খুন করব আমি ওকে।'

উধাও হয়েছে লাল পোশাক পরা লোকটা।

কিশোর বলল, 'ধোঁয়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল, যাতে কেউ না দেখে ওকে। টেবিল টপকে গিয়ে দামি কমিকগুলো নিয়ে চলে গেছে।'

পেছনের কাঠের ডিসপ্লে বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সাজানো কমিক বইয়ের মাঝে বড় একটা ফোকর হয়ে আছে। ডিকসনও তাকিয়ে রয়েছেন সেদিকে। 'ফ্যান ফান নাম্বার ওয়ানের কপিটা নিয়ে গেছে...'

সেই কমিকটাই, যেটার জন্যে চাপাচাপি করছিল টেকো লোকটা, নিতে পারেনি, ভাবছে কিশোর।

'...আরও নিয়েছে,' বলছেন ম্যাড। 'একগাদা! বিশ থেকে তিরিশ ডলার দাম ওগুলোর।' হঠাৎ বদলে গেল বিক্রেতার কণ্ঠস্বর। কেন, দেখতে পেল কিশোর। একটা বই দেখা গেল, তাতে দামের ট্যাগ লাগানো রয়েছেঃ ৪,৫০০ ডলার।

'ধোঁয়াটা তেমন স্মার্ট আইডিয়া নয়,' কিশোর বলল। 'এগুলো পুরানো পদ্ধতি। এতে অসুবিধে হলো, চোর নিজেও কিছু দেখতে পায় না। অনেক সময় যেটা নিতে আসে সেটাই ফেলে যেতে হয়। ফেলে গেছে দেখতে পায়নি বলেই।'

'যা নিয়েছে তা-ই যথেষ্ট,' ম্যাড বললেন। 'আমারগুলো যা পেয়েছে তা তো নিয়েছেই, তোমার যেগুলো আমার হাতে ছিল, সেগুলোও নিয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ক্রিমসন ফ্যান্টম বা লাল ভূত ওদের কমিকগুলোও নিয়ে গেছে, সব চেয়ে দামিগুলো, যেগুলোর প্রাথমিক দামই উঠে গিয়েছিল তিনশো ডলার।

'তার মানে সমাধান করার জন্যে একটা কেস পেয়ে গেলাম,' বিড়বিড় করল মুসা।

'কেস? সমাধান?' ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন ম্যাড।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা দেখলেই এসব কথার মানে বুঝবেন।'

'তিন গোয়েন্দা!...দাঁড়াও, দাঁড়াও!' টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলেন একটা ছোট বাক্স। তার ভেতর থেকে বের করলেন একটা ময়লা প্রায় দোমড়ানো কার্ড। কোণগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

'আরি! এ কি কাণ্ড!' রবিন বলল, 'আমাদের কার্ড!'

'নিশ্চয়,' ডিকসন বললেন। 'অনেক পুরানো। তোমাদের এখনকারটার সঙ্গে মেলে না। এটা বোধহয় প্রথম দিককার ছাপা কার্ডগুলোর একটা। পঁচাত্তর ডলারে বিক্রি করতে পারব।'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। 'তার মানে আপনি এটা বিক্রি করবেন?'

শ্রাগ করলেন ডিকসন। 'কেন করব না? কিছু কিছু লোক আছে, যা পায় তা-ই সংগ্রহে রাখে।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'তাহলে তোমরাই সেই লোক, যারা যে-কোন রহস্যের সমাধান করো বলে ঘোষণা দাও। বেশ, তোমাদেরকেই আমার এখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। কেন, বলছি

আমার কমিকগুলো খুঁজে বের করে দাও। সেই সাথে তোমাদেরগুলোও করো। ওভারস্ট্রীট যা বলেছে, তখন আমি সেই দাম দিয়েই তোমাদের কমিকগুলো কিনব, যাও, কথা দিলাম।'

আবার একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। অবশেষে কিশোর বলল ডিকসনের দিকে তাকিয়ে, 'বেশ, আমরা রাজি।' যে বইগুলো আছে এখনও সেগুলোসহ বাক্সটা তুলে এক হাতে নিয়ে আরেকটা হাত বাড়িয়ে দিল কমিক বিক্রেতার দিকে।

'আমার নাম আসলে জেমস ডিকসন,' হাসলেন বিক্রেতা। গোঁফের জন্যে হাসিটা অনেকখানিই ঢাকা পড়ে গেল। 'ওরকম একটা হাস্যকর নাম নিয়েছি স্রেফ প্রচারের জন্যে।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি আমরা।' কিশোরও হাসল। 'আমি কিশোর পাশা। ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড। তাহলে কাজ শুরু করা যাক। প্রথম প্রশ্ন, মিস্টার ডিকসন, বিশেষ কাউকে কি সন্দেহ হয় আপনার?'

'কাউকে? এখন তো মনে হচ্ছে সবাইকেই সন্দেহ করি।' স্টলের আশপাশে ভিড় জমানো জনতাকে দেখালেন তিনি হাত তুলে। তারপর দেখালেন পুরো হলঘর। 'তুমি জানো না, কারা এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সব চেয়ে বড় পাগলগুলোই এখানে ভিড় জমায়।' হাসলেন তিনি আবার। 'তোমাকে অবশ্য পাগল বলছি না, কারণ তুমি কিনতে আসোনি।'

'তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, এরা সবাই পাগল?'

হাত ওল্টালেন ডিকসন। 'একটা কথা বলতে পারি, সংগ্রহের নেশায় যখন পেয়ে বসে মানুষকে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় অনেকের। বিগড়ে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়। কি সংগ্রহ করল, কিভাবে করল, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকে না। আমার বিশ্বাস, অসুস্থই হয়ে পড়ে তখন ওরা।'

'চুরিও করে বলতে চাইছেন,' কিশোর বলল। 'চোরটা কি বইগুলো বেচবে? কি মনে হয় আপনার?'

'অত সহজ হবে না। বিশেষ করে ফ্যান ফানের মত জিনিস।' ভ্রূকুটি করলেন ডিকসন। 'যেখানেই বেচতে যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। দোকানদার জানতে চাইবেই, কোত্থেকে জোগাড় করা হয়েছে ওগুলো।'

'চোরটা তা বলতে চাইবে না,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকালেন ডিকসন। 'মুশকিলটা হলো কি, সংগ্রাহকের ব্যাপারে তদন্ত করছ তোমরা। কি যে করবে লোকটা, বলা কঠিন। হয়তো সারাটা জীবনই মাটির তলার ঘরে লুকিয়ে রাখবে কমিকগুলো। বেরই করবে না।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী দর্শক এসে ভিড় জমিয়েছে স্টলের কাছে, তাদেরকে সরিয়ে দিল হোটেলের কর্মচারীরা। আবার নিয়মিত বেচাকেনা শুরু হলো ঘরে। বারো বছরের একটা ছেলে এগিয়ে এল। হাতে একটা সাদা-কালো ছবি। ছবিটা মলাটে সাঁটা। একজন বন্ধুকে দেখিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'দেখ দেখ, কি পেয়েছি। পুরো পাতাটাতেই আইজাক হুফারের আর্ট। ক্রিমসন ক্রিস্টমাস থেকে এঁকেছে। মাত্র সত্তর ডলার দিয়ে নিয়ে ফেললাম।'

লম্বা, পাতলা, ধূসর চুলওয়ালা একজন লোক এগিয়ে এল। চামড়ার রঙ বেশি ফ্যাকাসে। কোন সময়েই যেন বাইরে বেরোয় না, খালি ঘরে বসে থাকে। বলল, 'এই খোকা, আমার কাছে বেচে দাও ওটা। পঁচাত্তর দেব।'

'না,' জবাব দিল ছেলেটা।

একটানে ছেলেটার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিল লোকটা। ওর হাতে গুঁজে দিল কতগুলো নোট। 'নাও, একশোই দিলাম। অনেক কিছু কিনতে পারবে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটা। ফড়াৎ ফড়াৎ করে টেনে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল লোকটা। বড় একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে লাইটার বের করে আগুন ধরিয়ে দিল টুকরোগুলোতে।

'কে আপনি?' চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। 'আমার জিনিস কেন ছিঁড়লেন?'

বেঁটে, মোটা, কালো চুল, কালো দাড়ি এক লোক এগিয়ে এল। 'ঠিকই করেছে ছিঁড়ে। ওর নাম আইজাক হুফার। ওটা তারই আঁকা ছিল।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ছেলেটার। 'আপনিই আইজাক হুফার! একটা অটোগ্রাফ দেবেন?'

ছেলেটার বাড়িয়ে ধরা নোটবুকে হেসে সই দিয়ে দিল পাতলা লোকটা।

'ইস!' দুঃখ করে বলল ছেলেটা, 'যদি ওই ছবিটাতে আপনার-সই নিতে পারতাম!'

হুফারের মুখ থেকে হাসি চলে গেল। 'ক্রিমসন ফ্যান্টমে জীবনে সই দেব না আমি!'

মোটা লোকটা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'কেন রাগল জানো? তুমি নিশ্চয় জানো না, ওই সিরিজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে হুফারকে। ঠকিয়েছে। হিরোয়িক কমিকস তার সমস্ত শিল্পকর্ম বিক্রি করে দিয়েছে, অথচ একটা পয়সা দেয়নি ওকে। তাই যেখানে যা পাচ্ছে নষ্ট করে ফেলছে সে, যাতে আরও দামি না হয়ে ওঠে, আরও বেশি রোজগার করতে না পারে হিরোয়িক কমিক।'

'হুফার!' ডাক দিলেন ডিকসন। 'আপনাকেই আমার দরকার ছিল। একটা জিনিস দেখাতাম। সংগ্রহে রাখার মত।' মুখ বাঁকালেন তিনি। 'কিন্তু এখন আর পারব না। চুরি হয়ে গেছে।'

'তাই!' স্টলের কাছে এগিয়ে এল মোটা লোকটা। 'চোর বলছে তার দোকানে ডাকাতি হয়েছে। চমৎকার!'

জ্বলন্ত চোখে লোকটার দিকে তাকালেন ডিকসন। 'দেখ এডগার, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না!'

'তুমি চোর নও বলতে চাও? লোকে পছন্দ করে কিনতে আসে বলে তাদের গলা কাট তুমি। তোমাদের মত লোকেরাই এই কালেকটিং ব্যবসাটাকে মাটি করল! সুযোগ পেয়ে ছিলে ফেল মানুষকে।'

স্টলের টেবিল ঘুরে এডগারের দিকে এগোতে গেলেন ডিকসন। তাঁর হাত চেপে ধরল হুফার। তার হাতের উল্টো পিঠে কনভেনশন স্ট্যাম্প মারা দেখতে পেল কিশোর। 'ওখানেই থাকুন। এডগার ঠিকই বলেছে। ডাকাতিই চলছে এখানে।

কমিক থেকে সবাই লাভবান হয়, কেবল আর্টিস্ট বাদে।'

'এই যে, ডিকসন!' তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেন কনভেনশন চীফ লুই মরগান। 'এইমাত্র পেলাম খবরটা। কি যে কাণ্ড! কারও কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আমি এখান থেকে সরেও সরতে পারলাম না, ঘটে গেল…! দুঃখজনক। কি নিয়েছে চোর?'

'বেশি কিছু না। সব চেয়ে দামি যেটা নিয়েছে সেটা ফ্যান ফানের একটা কপি। তাতে হুফারের কিছু কাজ করা ছিল।' হুফারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন ডিকসন। 'থাকলে এখন ওকে দেখাতে পারতাম।'

'কমিক বিক্রির ব্যাপারে নানা জনের নানা মত থাকতে পারে,' বললেন মরগান। 'তবে চুরিদারিটা মানা যায় না। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

'তা তো হবেই। চোখ খোলা রাখব আমরা,' এডগার বলল। 'হুফার, চলো, যাই। রক অ্যাস্টারয়েড বোধহয় শুরু হয়ে গেল। এখনও গেলে ধরা যায়।'

রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

'কয়েকজন ডিটেকটিভকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি আমি,' ডিকসন বললেন। তিন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দিলেন মরগানের সঙ্গে।

কার্ডে চোখ বোলালেন মরগান। 'গোয়েন্দা, না? বেশ বেশ। সাহায্যের দরকার হলে জানিও। আমার এখন কাজ আছে, যেতে হবে। আরেক সমস্যা। গোল্ড রুমে রক অ্যাস্টারয়েডের সিরিয়াল দেখানো হবে, সব কটা, ষাট ঘণ্টা ধরে চলবে। অথচ চালানর মানুষই এখনও আসেনি। প্রোজেকশনিস্ট। এডগারকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'প্রোজেকটর সেট করেই রেখেছি। চালানর একজন মানুষ পেলেই এখন হয়ে যেত। কস্টিউম প্রতিযোগিতাও শুরু হওয়ার সময় হয়েছে।'

কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন তিনি।

'রক অ্যাস্টারয়েড?' ঠিক বুঝতে পারছে না রবিন।

'চল্লিশ দশকের শেষ দিকে একটা বেশ চালু সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ছিল, বোধহয় সেটার কথাই বলছে,' কিশোর বলল। হাতের বাক্সটা আবার টেবিলে নামিয়ে রেখে প্রায় দৌড় দিল লুই মরগানের পেছনে। রবিন আর মুসাও পিছু নিল।

মরগানকে ধরল কিশোর, 'স্যার, এক সেকেণ্ড। একটা সাহায্য করবেন দয়া করে? ওই লোক দুটো কে, বলতে পারেন, একটু আগে যারা মিস্টার ডিকসনের স্টল থেকে গেল?'

'পাতলা, লম্বা লোকটার নাম আইজাক হুফার। ছবি আঁকিয়ে এবং লেখক। মোটা লোকটার নাম এডগার ডুফার। হুফারের হাতের লেখা ভাল না, তাই তার কমিকের কথাগুলো লিখে দিতে হয় ডুফারকে। চমৎকার মিলেছে দু'জন, হুফার এবং ডুফার।' হাসলেন মরগান। 'ডুফারটা পাজি। নিজের সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা। সবাইকে বলে বেড়ায়, তার অনেক বড় কিছু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কমিক প্রকাশকদের জন্যে সেটা হতে পারেনি। খালি গোলমাল করার তালে থাকে এই লোক।'

'হুফারের সঙ্গে ভাবসাব তো বেশ ভালই দেখলাম,' কিশোর বলল।

'তা তো থাকবেই। বললাম না দু'জনে একসাথে কাজ করে। মাসখানেক আগে হুফার থাকত ওহায়ওতে। আমার বিশ্বাস, লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছে এখানে তার কমিক কেমন চলে দেখতে। ভাল চললে থেকে যাবে। কিন্তু আসার পর থেকে কোন কমিক আঁকতে দেখিনি।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমি তাকে কনভেনশনে দাওয়াত করেছি। সম্মান দেখিয়ে একটা ঘরও দিয়েছি থাকার জন্যে। মনে হয় ভুলই করে ফেলেছি।'

ঘড়ি দেখলেন মরগান। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। যেতে হবে।'

তাড়াহুড়া করে তাঁকে চলে যেতে দেখল তিন গোয়েন্দা।

'ভালই একটা কেস মিলল মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

'সন্দেহ করার মত একজনকে পেয়েও গেলাম,' রবিন বলল।

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ডুফার, না হুফার?'

'আইজাক হুফার। চুরিটাই সন্দেহজনক। হয়তো সে-ই করিয়েছে, ওই কমিকগুলো তার পছন্দ নয় বলে। ছেলেটার হাত থেকে নিয়ে কিভাবে নষ্ট করে ফেলল দেখলে না। ফ্যান ফানের ছবিগুলোও নিশ্চয় তার পছন্দ ছিল না।'

'কিন্তু কমিকগুলো চুরি হওয়ার পর পরই এসে উদয় হয়েছিল সে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'ধোঁয়াও সরে সারেনি তখনও।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'লোকটা কোথায় উঠেছে, জানি আমরা। তার ঘরে গিয়ে দেখলেই তো পারি কমিকগুলো আছে কি-না?'

রাজি হয়ে গেল অন্য দু'জন।

রিসিপশন ডেস্ক থেকে হুফারের রুম নম্বর নিল কিশোর। তিন মিনিট পরেই ৩১৮ নাম্বার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

একবার দেখেই মাথা নাড়ল কিশোর, 'এই তালা খুলে ঢোকা সহজ হবে না। বিশেষ যন্ত্রপাতি দরকার।'

ভুরু কুঁচকে তালাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। পাশের ৩২০ নম্বর ঘরের খোলা দরজার ওপর চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হলো চেহারা। ছোট একটা ঠেলাগাড়ি রাখা দরজার পাশে। তার মানে ঘর যে পরিষ্কার করে সে ওটা নিয়ে এসেছে।

দরজায় জোরে জোরে দু'বার থাবা দিল কিশোর। ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে কেউ আছেন?' এপাশ ওপাশ একবার তাকিয়েই ঢুকে পড়ল শূন্য ঘরের ভেতরে। পেছনে ঢুকল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'এবার?' জানতে চাইল মুসা, 'ওঘরে যাব কি করে? দেয়াল ফুটো করে?'

'তার দরকার হবে না,' বলতে বলতে স্লাইডিং-গ্লাস ডোরের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। এখান থেকে হোটেলের ভেতর দিকের চত্বর আর সুইমিং পুল চোখে পড়ে। বাঁয়ে তাকাল সে। ৩১৮ নম্বর ঘরের ব্যালকনির দরজা রয়েছে চার ফুট দূরে। 'ছোট্ট একটা লাফ দিলেই পৌঁছে যাওয়া যায়,' আনমনে বলল। 'তবে সেই লাফটা দেয়ার মত লোক প্রয়োজন, খেলাধুলায় যে পারদর্শী। বিশেষ করে ফুটবল প্লেয়ার।'

'না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা। 'আমি পারব না!'

তাকে রাজি করাতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগল না কিশোরের। ২২০ নম্বর ঘরের ব্যালকনির রেলিঙে চড়ে বসল মুসা। বিড়বিড় করে বলছে, 'জ্বালিয়ে মারল! কিছু বলতেও পারি না! গাধার মত রাজি হয়ে যাই!' কিশোরের দিকে তাকাল না। জানে, কি দেখতে পাবে। দেখবে, মুচকি হাসছে গোয়েন্দাপ্রধান। চোখে চোখ পড়লে হা হা করে হেসে ফেলবে। ওকে সেই সুযোগটা দিতে চাইল না।

কিন্তু রবিনকে ঠেকানো গেল না। হেসে বলল, 'দেরি করছ কেন? লাফ দাও। মাত্র তো চার ফুট।'

'তা তো বটেই,' গজগজ করল মুসা। 'মাত্র চার ফুটই যদি কোনভাবে মিস করি, পড়ব গিয়ে তিরিশ ফুট নিচে।'

শক্ত করে রেলিঙ চেপে ধরে আছে সে। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর রেখে আচমকা হাত ছেড়ে দিল। চোখ সামনের ব্যালকনির দিকে। নিচে তাকাচ্ছে না। লাফ দিল অনেকটা ব্যাঙের মত করে।

অন্য ব্যালকনিটা যেন উড়ে চলে এল তার কাছে। ডান পা-টা রেলিঙে জায়গামতই বসল, কিন্তু পিছলে গেল বাঁ পা। দম বন্ধ করা ভয়াবহ একটা মুহূর্ত, উল্টে পড়ছে সে। দু'হাতে থাবা দিয়ে ধরে ফেলেছে রেলিং। চেপে ধরার ফলে সাদা হয়ে গেছে হাতের পেছনটা। ধীরে ধীরে টেনে তুলতে লাগল শরীরটাকে।

অনেক কষ্টে পতন রোধ করে আবার শক্ত হয়ে বসল রেলিঙে। লাফিয়ে নামল ব্যালকনিতে। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত তুলে কাচ লাগানো দরজাটা দেখাল কিশোর। ঢোকার ইঙ্গিত করল।

'বাহ্, চমৎকার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা, 'আমার জন্যে খুব তো চিন্তা করো দেখছি!'

দরজার কাছে গিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল সে। কাউকে দেখতে পেল না। দরজা খোলার জন্যে নব ধরে টানতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা।

ভেতরে ঢুকল মুসা। ভাল মত দেখে নিল হুফার আছে কি-না ঘরে। নেই। অসংখ্য বোর্ডে আঁকা রয়েছে নানা রকম ড্রইং, সম্মেলনে বিক্রির জন্যেই নিশ্চয় এঁকে রেখেছে হুফার। কিছু পত্রপত্রিকাও চোখে পড়ল। বেশির ভাগই কমিক ম্যাগাজিন। ওগুলোতে ফ্যান ফানের কপিটা দেখতে পেল না সে।

আলমারির দরজা খুলে দেখল ভেতরে আলখেল্লাটা আছে কি-না। তা-ও নেই। তারপর ড্রেসারে খুঁজতে এল মুসা। প্রথম ড্রয়ারটা সবে টান দিয়ে খুলেছে, এই সময় নড়াচড়া লক্ষ করল পেছনে।

ঝট করে সোজা হয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল সে। জমে গেল যেন বরফ হয়ে। বাথরুম থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা কুৎসিত মূর্তি। শরীরটা মানুষের মত, বিশাল চওড়া বুকের ছাতি, পরনে কালো জিনসের প্যান্ট। মুখটা ভয়ঙ্কর। সবুজ রঙের একটা গিরগিটির মুখকে যেন বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। কমিকের ফ্রগ মিউট্যান্ট।

জীবটা যে মানুষ, সেটা বুঝতে সময় বেশি লাগল না মুসার। তবে যতটুকুই

লাগল, তাতেই দেরি হয়ে গেল। মানুষটা লাফ দিয়ে সরে এল তার কাছে, ধাঁ করে চোয়ালে ঘুসি মেরে বসল।

টলে উঠল মুসা। ঝটকা দিয়ে পেছনে সরে গেল মাথাটা, বাড়ি লাগল ব্যালকনিতে বেরোনর দরজার ফ্রেমে।

প্রচণ্ড ব্যথায় যেন অন্ধ হয়ে গেল মুসা। ওই অবস্থায়ই কারাতের কোপ বসানর চেষ্টা করল লোকটার ঘাড়ে। লাগাতে পারল না। মারটা সহজেই ঠেকিয়ে ফেলল ফ্রগ মিউট্যান্ট, আবার ঘুসি মারল। পেছনে যেন উড়ে গেল মুসার শরীরটা, বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে।

ব্যালকনির রেলিঙে ধাক্কা খেল সে, তারপর উল্টে পড়তে শুরু করল। পাগলের মত হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরার চেষ্টা করল, কিছুই ঠেকল না হাতে। চারিদিকে সব ফাঁকা, শুধুই শূন্যতা।

চার

মাথা নিচু করে নিচের চত্বরে পড়তে যাচ্ছে মুসা। মরিয়া হয়ে শূন্যেই শরীরটাকে বাঁকাল সে। বান মাছের মত শরীর মুচড়ে সরাসরি চত্বরে পড়া থেকে বাঁচল কোনমতে। ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিতে দিতেই এই কায়দাটা রপ্ত করেছে। সুইমিং পুলের দিকে সরে চলে এসেছে। নামছে তীব্র গতিতে। এই ডাইভ তাকে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক এনে দেবে না, কিন্তু পদকের চেয়ে অনেক অনেক দামি জীবনটা তো বাঁচল।

ঝপাং করে পানিতে পড়ল মুসা। যতটা ডোবার ডুবে ভেসে উঠতে শুরু করল। ভুস করে মাথা তুলল পানির ওপরে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। কাঁপছে এখনও। অল্পের জন্যে বেঁচেছে। পুলের কিনার থেকে ডজনখানেক হাত এগিয়ে এল তাকে টেনে তোলার জন্যে। কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই রইল সে, শকটা হজম করে নেয়ার জন্যে।

আরেক গ্রহে নামল নাকি, ভাবছে মুসা। তার সামনের লোক-গুলোকে মনে হচ্ছে স্টার ওঅরস ছবির এক্সট্রাদের মত। রোবট, সবুজ মানুষ, মূল মাথা ছাড়াও আর দুটো বাড়তি মাথাওয়ালা মানুষ, আর বিচিত্র সব জীব। ওরাও আসলে মানুষ, এই সাজে সেজেছে।

মুসার মনে পড়ল কস্টিউম কনটেস্টের কথা। সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে অনেকে। তাদের ঠিক মাঝখানেই পড়েছে সে। তীরে দাঁড়ানো অনেকের চোখেই বিরক্তি দেখতে পেল। কারণ আছে। আচমকা পানিতে পড়ে ওদেরকে ভিজিয়ে দিয়েছে সে।

তার পরেও কয়েকজন টেনেটুনে তুলল ওকে। ওদের মাঝে তার বন্ধু কিশোর আর রবিনও রয়েছে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

ভিড় সরানোর চেষ্টা করছে কিশোর।

'দেখলাম ঢুকলে,' রবিন বলছে, 'একটু পরেই দেখি দরজা দিয়ে উড়ে

বেরোলে। ব্যাপারটা কি?

'উড়তে সাহায্য করা হয়েছিল আমাকে। এমন জোরে ঘুসি মারল...'

'তোমার মত মানুষও সামলাতে পারল না,' কথাটা শেষ করে দিল রবিন। 'কে মারল? হুফার? না লাল আলখেল্লা পরা লোকটা?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'আমার মনে হয় না ভূতটা হুফার। ওর ঘরে কোন কস্টিউম দেখলাম না। আমাকে যে মেরেছে তার গায়ে মোষের জোর। সারা গায়ে পেশী আর পেশী। মুখ দেখতে পারিনি। ফ্রগ মিউট্যান্টের মুখোশ পরা ছিল।'

'হুঁ,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'দু'জন জুটল এখন। একজন কমিক লিখে হিরো হয়ে গেছে, আরেকজন মুখোশ পরে ভিলেন সেজেছে, চুরি করে ঢুকেছে হুফারের ঘরে।' মুখ তুলল। 'দু'জনের মাঝে সম্পর্ক নেই তো?'

'ওই যে, এসে গেছে,' নিচু গলায় বলল রবিন।

হোটেলের ব্লেজার পরা একজন লোক এগিয়ে এলেন। পকেটের মনোগ্রাম দেখে বোঝা গেল, তিনি হোটেলের ম্যানেজার। চেহারাটা রুক্ষ, মোটেও আন্তরিক নয়। পেছনে দৌড়ে আসছেন আরেকজন, লুই মরগান।

'কি হয়েছিল?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ম্যানেজার।

'আমি-ইয়ে...পড়ে...গিয়েছিলাম,' আমতা আমতা করে জবাব দিল মুসা। প্লাস্টিকের একটা পুল চেয়ারে বসেছে।

'পড়ে গিয়েছিলে? কি করে? কোত্থেকে?' মুসার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ম্যানেজার।

'আমি...' মরিয়া হয়ে যেন চারপাশে তাকাল মুসা। তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল কিশোর।

'আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া দরকার,' ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল কিশোর। 'ব্যালকনিতে ওগুলো কি রেলিং লাগিয়েছেন? এত নিচু! পড়ল তো সেজন্যেই। ভাগ্যিস ডাইভ দেয়ার অভ্যেস আছে ওর। নইলে তো...' কেঁপে ওঠার অভিনয় করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'দরজার দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে এসেছিল আমার বন্ধু। হঠাৎ দিল হাঁচি। তাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল। আপনাদের রেলিংগুলো আরেকটু উঁচু হলে এই অবস্থা হত না। শুকনোয় পড়ে যদি মরত, পারতেন আর ফিরিয়ে দিতে?'

কিশোরের এই ভাষণে থতমত খেয়ে গেছেন ম্যানেজার। সামলে নিয়ে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই হোটেলের গেস্ট?'

এগিয়ে এলেন লুই মরগান 'হ্যাঁ। রুম নম্বর তিনশো ষোলো। আমার সঙ্গে উঠেছে।'

প্রতিবাদ করল না কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে মরগানের দিকে।

'তাই!' কনভেনশন চীফের দিকে ঘুরলেন ম্যানেজার। 'দিনটাই আজ খারাপ যাচ্ছে, কি বলেন মিস্টার মরগান? প্রথমে হলো ডাকাতি, তারপর এই কাণ্ড...আশা করি আর কোন গোলমাল দেখতে হবে না আজ।' বলে রওনা হয়ে গেলেন

গটমট করে হেঁটে যাচ্ছেন ম্যানেজার। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন মরগান, 'তদন্ত করতে গিয়েই নিশ্চয় এটা ঘটল?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল কিশোর। 'তদন্ত করতে গেলে অনেক সময় মাথার ঠিক থাকে না মুসার, উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। বোধহয় পানিতে ঝাঁপ দেয়ার শখ হয়েছিল। যা-ই হোক, সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু ম্যানেজার যদি তিনশো ষোলোতে আমাদের খোঁজ নিতে যান…?'

'তাহলে তোমাদের পেয়ে যাবেন। ঘরটা তোমাদেরকে দিতে চাই। পাশের ঘরটাই আমার, দু'শো আট নম্বর। আমি বুঝতে পারছি, এই কেসের তদন্ত করতে হলে হোটেলের একটা ঘর তোমাদের লাগবেই।' চাবি বের করে দিলেন মরগান। 'তোমার বন্ধুর কাপড় বদলানোও দরকার। তবে, ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে সগিম্যান সেজে থাকার ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে আমার আপত্তি নেই।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বিচারক মণ্ডলীকে বলে দেব, এই কস্টিউম যেন শো করার ব্যবস্থা করা হয়।'

এমন ভঙ্গিতে বললেন মরগান, সত্যি ভেবে বসল মুসা। তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিষেধ করল, 'না না, ওকাজ করবেন না!'

হাসলেন মরগান। এগিয়ে গেলেন বিচারকের মঞ্চের দিকে।

তিন গোয়েন্দা চলল ৩১৬ নম্বর কামরায়।

ঘরে দুটো ডাবল বেড আছে, একটা ড্রেসার আছে, আর আছে একটা তালা দেয়া দরজা, যেটা খুললে ৩১৪ নম্বরে ঢোকা যায়।

তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল মুসা। এখানে রবিন আর কিশোরের আপাতত কিছু করার নেই। আবার নিচে রওনা দিল দু'জনে।

সম্মেলনে যাওয়ার টিকেট চেক করছে এখন অন্য একজন। গোলগাল মুখ, যেন একটা কুমড়ো। এলোমেলো চুল। লোকের টিকেট দেখে হাতের উল্টো পিঠে সীল মেরে দিচ্ছে। দরজা পাহারা দিতে বসেছে এখন সেই মেয়েটা, যার চুল দুই রঙে ডাই করা, যে তিন গোয়েন্দার হাতে সীল মেরেছিল। কিশোরের দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কিন্তু রবিনের দিকে তাকিয়েই রইল। হাসল। বলল, 'হাই, আমার নাম ডোরা।'

রবিন তার মধুরতম একটা হাসি উপহার দিল মেয়েটাকে। 'ডোরা! চমৎকার নাম! আমার খুব পছন্দ। আচ্ছা, ডোরা, ওই স্মোক বম্ব ফাটার পর কালো আলখেল্লা পরা কোন মানুষকে কি এখান দিয়ে যেতে দেখেছ?'

রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। মাথা নাড়ল।

এডগার ডুফারের বর্ণনা দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল ডোরাকে, ওরকম কাউকে যেতে দেখেছে কি-না।

ভ্রূকুটি করল মেয়েটা। 'ওরকম মোটকা কত লোক এখানে কমিক কিনতে আসে জানো? হাজার হাজার। ওদের ন'শো নব্বই জনই যায় এখান দিয়ে। সব দেখতে এক রকম। কতজনের কথা মনে রাখব?'

'এই লোকটা মোটামুটি পরিচিত,' রবিন বলল। 'কমিকের লেখা লেখে। দাড়ি আছে…'

'ডুফারের কথা বলছ না তো? তোমার বন্ধু তাহলে ওকথা বললেই পারত, নামটা বললেই বুঝতে পারতাম। হ্যাঁ, দেখেছি। এই তো মিনিট দুই আগে বেরিয়ে

রেস্টুরেন্টের দিকে গেল।'

রেস্টুরেন্টে এসে লোকটাকে পেল গোয়েন্দারা।

ওদেরকে লাঞ্চের দাওয়াত দিল ডুফার। 'চলো, বাইরের টেবিলে গিয়ে বসি। তাহলে খেতে খেতে সম্মেলন দেখতে পারব।'

সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটাকে আরেকবার দেখার আশায় রাজি হয়ে গেল কিশোর।

সুইমিং পুলের কিনারে একটা টেবিলে এসে বসল ওরা। ছাতার নিচে। সম্মেলন চলছে। একজন করে প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, আর সেই ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটছে সুইমিং পুলের কিনার দিয়ে, চারপাশে এক চক্কর, দর্শক আর বিচারক মণ্ডলীকে দেখাচ্ছে তার পোশাক।

দুটো করে চীজবার্গারের অর্ডার দিল ডুফার।

একটা করে তুলে নিল কিশোর আর রবিন।

কামড় বসাল কিশোর। চিবিয়ে গিলে নিয়ে বলল, 'কমিকের ব্যাপারে আমাদের কিছু তথ্য দরকার। আপনি কি বলতে পারবেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল ডুফারের। দাড়িও যেন উঠে এল সামান্য ওপরে। 'বলো, কি জানতে চাও?'

ওরা কথা বলছে, এই সময় পুলের কিনারে এসে দাঁড়াল আরেকজন প্রতিযোগী। অদ্ভুত এক পোশাক পরেছে। যেন বিশাল একটা টোস্টারের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে শরীরটা। হাত, পা আর মুখ বেরিয়ে আছে শুধু।

কিশোরের প্রশ্নের জবাবে ডুফার বলল, 'আমি কমিক সংগ্রহ করি, তার কারণ, করতে আমার ভাল লাগে। পাতা উল্টাই ওগুলোর। কোন ছবি ভাল লেগে গেলে, সেগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায় লিখি নিজের মত করে। লিখতে আমার ভাল লাগে। কমিক অনেকেই পছন্দ করে, তবে শুধু পড়তেই। আঁকাআঁকি কিংবা লেখার ঝোঁক নেই তাদের।'

'সবার নেই,' রবিন বলল। 'একথা বলা যাবে না।'

'তা ঠিক। আমার আছে। হুফারেরও আছে। ও অবশ্য লিখতে পারে না, হাতের লেখা ভাল নয় তো। তবে তার ছবিগুলো দেখার মত, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চোখ অন্যদিকে। তাকিয়ে রয়েছে সেই মেয়েটার দিকে। সোনালি চুল।

বলে চলেছে ডুফার, 'হুফারের কাজগুলো একেকটা ক্ল্যাসিক। দশ বছর আগে, মাত্র আঠারো বছর বয়সেই দুর্দান্ত এক হিরো তৈরি করে বসেছিল সে। গল্প তৈরি করল, ছবি আঁকল, ছাপতে দিল এক কমিক ম্যাগাজিনে। সাংঘাতিক সাড়া জাগাল। রাতারাতি অংসখ্য ভক্ত জুটে গেল তার। কমিকের নায়কের নাম রেখেছিল সে, গ্রে ফ্যান্টম।'

হাসল ডুফার। 'ফ্যানজাইন ম্যাগাজিনে ছাপার ব্যবস্থা হয়েছিল তার কমিক। রঙের ব্যাপারে একটা বাধা ছিল। চার রঙা ছাপার উপায় ছিল না, সাদা-কালোতে ছাপা হত ম্যাগাজিনটা। তৃতীয় আর একটামাত্র রঙে ছাপা যেত, তাহল ধূসর। আর তাই বাধ্য হয়ে নায়কের নাম দিতে হলো হুফারকে, গ্রে ফ্যান্টম বা ধূসর

ভূত। ওই রঙেতেই ছাপল তার কমিক। যা-ই হোক, খুবই সাড়া জাগাল গ্রে ফ্যান্টম। হিরোয়িক কমিকস নামে একটা কোম্পানি কাজের অফার দিল ডুফারকে; এবং তখন তার হিরোর নাম হয়ে গেল...'

'ক্রিমসন ফ্যান্টম!' প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। 'টকটকে লাল ওই হিরোর গল্প আমি পড়েছি!'

'ডুফারের এক সাংঘাতিক সৃষ্টি। শুধু যে কাহিনীই ভাল, তা-ই না, আঁকতেও পারে বটে লোকটা। আর সব কমিকের চেয়ে একেবারে আলাদা, গতানুগতিকার বেড়া ডিঙাল ক্রিমসন ফ্যান্টম। তারপরে রয়েছে একটা বিশেষ ব্যাপার...'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ঠিকই বলেছেন। গোপন গোপন ভাব। একটা রহস্য। ক্রিমসন ফ্যান্টম যে আসলে কে, তা-ই জানে না লোকে। তার পরিচয় গোপন থাকে। ওভাবেই কাজ করে যায় সে। তিন-চার রূপ, একেক বার একেক রূপে উদয় হয়। কমিকের তিন-চারটে চরিত্রের যে কোন একটা হতে পারে সে, কোনটা আসল ফ্যান্টম, বোঝা মুশকিল। ওই ধাঁধার জবাব খুঁজতে খুঁজতে তো মাথাই খারাপ হয়ে যেত আমার।'

'এ যাবৎ হাতে গোনা যে ক'টা ভাল কমিক বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা ছিল ওই ক্রিমসন ফ্যান্টম,' ভোঁতা গলায় বলল ডুফার। 'অথচ ধ্বংস করে দেয়া হলো ওটাকে।'

'ধ্বংস?' এতক্ষণে সতর্ক হলো কিশোর, 'কিভাবে?'

'নীল বোরাম নামে একজন লোকের সঙ্গে কাজ করত ডুফার। লোকটা ছিল তার কমিকের এডিটর। বোরামকে বিশ্বাস করেছিল সে। কপিরাইটের ব্যাপারে কি জানি একটা ঘাপলা বাধিয়ে ক্রিমসন ফ্যান্টমের কপিরাইট নিজের নামে করিয়ে নিল বোরাম।' টেবিলে চাপড় মারল ডুফার। 'মহা শয়তান। নিয়ে নেয়ার পর সিরিজটাকে আরও জনপ্রিয় করার জন্যে নানা রকম কায়দা করতে লাগল সে। একটা বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল। ক্রিমসন ফ্যান্টম আসলে কোন চরিত্রটা, বলতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে।'

রবিন বলল, 'ওই প্রতিযোগিতার কথা জানি আমি।'

'তা তো জানবেই। অনেক ছেলেই জানে ক্রিমসন ফ্যান্টম প্রতিযোগিতার কথা। তারপর আরও দুটো নতুন ক্রিমসন ফ্যান্টম বই বের করল বোরাম। একটার নাম দিল সিক্রেটস অভ দি ক্রিমসন ফ্যান্টম, আরেকটা দ্য ব্যাটেলিং ক্রিমসন ফ্যান্টম। নতুন লেখক আর আর্টিস্ট নিয়োগ করল একাজে। ওরা খারাপ করেনি, তবে ডুফারের তুলনায় একেবারেই সাধারণ।'

রাগে ভুরু কোঁচকাল ডুফার। 'আসলে চরিত্রটার যা যা বিশেষত্ব ছিল, সব নষ্ট করল বোরাম, খুন করল চরিত্রটাকে। ক্রিমসন ফ্যান্টম এখনও আছে, ভালই বিক্রি হয়, তবে এটা একেবারেই অন্য কমিক। আসলটার ধারেকাছেও লাগে না। অবশ্য বিক্রি হয় প্রচুর। হিরোয়িক কমিকসকে তুলেছে ওটাই, বোরামকেও বড়লোক বানিয়েছে।'

'এডগার ডুফার কিছুই করতে পারল না?' প্রশ্ন করল কিশোর। এই সময় ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে গেল কস্টিউম পরা আরেকজন প্রতিযোগী। এই

লোকটার পোশাক বিচিত্র। টমেটোর চারপাশে সাজিয়ে রাখা অনেকগুলা লেটুসপাতা যেন বিশাল আকার নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'চেষ্টা অনেকই করেছে,' জানাল ডুফার। 'ঠেকানর চেষ্টা করেছে বোরামকে। পারেনি। আর পারবেই বা কি করে? চালাকি করে ততদিনে ক্রিমসন ফ্যান্টমের কপিরাইট নিজের নামে করে ফেলেছে বোরাম। ডুফার ভাবল, সে কাজ না করলেই কমিকটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর কেউ আঁকতে পারবে না। তাই হিরোয়িক কমিকস থেকে বেরিয়ে চলে আসে সে। কিন্তু বোরাম ধুরন্ধর লোক। অন্য লোক দিয়ে কমিক আঁকাতে শুরু করল। কিছুই করতে না পেরে নিজের সৃষ্টির ওপরই ভীষণ রেগে গেল ডুফার। যেখানেই পায় নষ্ট করে ফেলে। 'তোমাদের সামনেই তো নষ্ট করল। দেখলেই ওরকম করে পোড়ায়।'

'তার মানে,' কিশোর বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন কোম্পানিটা ক্রিমসন ফ্যান্টমের ভক্তদেরকে ঠকাচ্ছে?'

'ঠকাচ্ছে আসলে অনেকেই, এক বোরাম নয়,' হাত ওল্টাল ডুফার। ঘুরে তাকাল পাশের টেবিলে বসা কালো-চুল এক তরুণের দিকে। তাকে বলল, 'অ্যাই, পিটার, তোমার কাছে ওভারস্ট্রীটের কপি আছে?'

বার্গার খাচ্ছিল লোকটা। হাতের খাবার প্লেটে নামিয়ে রেখে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের করে আনল একটা দোমড়ানো মোটা বই। 'এই নাও,' বলে ছুড়ে দিল ডুফারের দিকে।

লুফে নিল ডুফার। টেবিলে বিছিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। 'এই যে, পাওয়া গেছে। সেরিবাস। সাদা-কালো কমিক, প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সাতাত্তর সালে। আসল একেকটা কপি বিক্রি হবে এখন পাঁচশো ডলারে। এই যে, দেখ, নকলও রয়েছে। জালিয়াতি। যারা চেনে তারা ঠিকই বুঝতে পারবে এটা নকল। নকলগুলো বিক্রি হয় বিশ-তিরিশ ডলার দামে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে গিয়ে বইটা ফেরত দিয়ে এল ডুফার। ছেলেদেরকে বলল, 'কমিক ভক্তদের ব্যাপারটা বুঝি না। অনেক সময় যারা ঠকায় তাদেরও লাভবান করে দেয়। জাল বলেই কিনে নেয় অনেকে অনেক দাম দিয়ে, সংগ্রহে রাখার জন্যে।'

আবার ভ্রূকুটি করল ডুফার। 'ঠকিয়েও পয়সা কামায়। লোকে আসল ভেবে বেশি দাম দিয়ে কেনে। লাভটা যায় প্রকাশকের পকেটে। সেগুলো বিক্রি করারও মানুষ আছে। আসল বলে গছিয়ে দেয় ক্রেতাকে।'

মুখ তুলল কিশোর, 'যেমন? কার মত বিক্রেতা?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ডুফার। 'লোকে তো প্রায়ই অভিযোগ করে জেমস ডিকসনের নামে। ওর কাছে কিছু কিনতে গেলে সাবধান। হাতে ঘড়ি থাকলে, হাত মেলানর পর ভালভাবে দেখে নেবে বদলে দিল কি-না।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে।

প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। বিজেতার নাম ঘোষণা করার আগে বাঁশি বাজল। ঘোষণা করলেন বিচারক। প্রথম হয়েছে রোমশ পোশাক পরা একজন। ও সেজেছিল গ্লোর্জ দ্য প্ল্যানেট ইটার।

পাশের টেবিলে বিরক্তি প্রকাশ করল পিটার। 'এটা একটা কাজ হলো? আমি তো ভেবেছিলাম ওই সোনালি চুল মেয়েটাই জিতবে!'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কিশোরও একই কথা ভাবছে, তবে সেটা প্রকাশ করল না।

উঠে দাঁড়াল ডুফার। 'এবার যেতে হয়। রকের জাহাজ ভাঙার তোড়জোড় করছে মাকর্ম্যান।' দ্রুত গিয়ে খাবারের বিল দেয়ার জন্যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল সে।

হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। হেসে উঠল পিটার। 'বুঝলে না? রক অ্যাসটারয়েড ছবির কথা বলল ডুফার। সিনেমার খুব ভক্ত, সাইন্স ফিকশন। অনেক কিছুই মনে রাখে। ভাল ভাল ডায়লগ মুখস্থ করে রাখে, জায়গা মত ঝাড়ে। হাহ হা।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। বিড়বিড় করে বলল, 'কি সব মানুষ! সবাই-ই পাগল নাকি এখানকার!'

বেরোনোর জন্যে রওনা হল দুই গোয়েন্দা। চোখের কোণ দিয়ে কিশোর দেখতে পেল সোনালি ঝিলিক।

ঘুরে তাকাল সে। রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখের কাছে একটা টেবিলে বসেছে সোনালি চুল মেয়েটা। সঙ্গে আরেকজন বয়স্ক মহিলা, বোধহয় মেয়েটার মা। তৃতীয় আরও একজন রয়েছেন, যাঁকে চিনতে পারল কিশোর। সেই টাকমাথা লোকটা, ম্যাড ডিকসনের কাছ থেকে যে ফ্যান ফানের কপিটা কিনতে চেয়েছিলেন।

দরজার দিকে এগোনোর সময় কথা কানে এল কিশোরের। টাকমাথা লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় মেয়ের কাঁধে আলত চাপড় দিল বয়স্ক মহিলা। বলল, 'ফটোকভারের জন্যে আমাদের মিরার মত মেয়ে আর পাবেন না, মিস্টার বোরাম। ও আপনার পারফেক্ট মডেল।'

ও, এ-ই তাহলে নীল বোরাম, ভাবল কিশোর, আইজাক হুফারের প্রথম দিককার কাগজগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন লোকটা?

হঠাৎ রাগী একটা জোরাল কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল সে। প্রবেশ পথের একটু দূরে চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুফার। চিৎকার করে বলল, 'হচ্ছেটা কি এখানে, মরগান! আমার ঘরে কে জানি ঢুকে সব তছনছ করে দিয়েছে!'

পাঁচ

'হুফার,' মরগান বললেন, 'এসব নিয়ে কি এখানেই কথা বলতে হবে?' দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন, মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যেই লোক জমা আরম্ভ হয়েছে। কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে।

জনতার ভিড়ে সামিল হলো কিশোর আর রবিন।

চিৎকার করে বলছে তখন হুফার, 'কে জানি ঢুকেছিল আমার ঘরে! আমার কাপড় কেটেছে, চিরে ফালাফালা করেছে সমস্ত ছবি!'

গুঞ্জন উঠল সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।.

'ও কাজ কে করতে যাবে?' মরগানের প্রশ্ন।

'সেটাই তো জানতে চাইছি আমিও। তোমার সিকিউরিটি কোথায়? এটা কি ধরনের সম্মেলন হলো?'

আর্টিস্টকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মরগান, 'তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। যদি যেতে চাও...'

'যেতে চাইব?' গলা আরও চড়ল হুফারের। 'আমি যেতে চাই না। আমি চাই ওই লোকটাকে। আপনি জানেন, কি করে আমার জিনিসগুলো নষ্ট করেছে সে! আমি এখানে টাকা রোজগারের জন্যে এসেছিলাম এবং সেটা করেই ছাড়ব আমি। তার জন্যে যা কিছু করতে হয় করব।'

দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়ার সময় ঘুরল সে। 'আমাকে প্রয়োজন হলে কনভেনশন ফ্লোরে খোঁজ করবেন।'

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। গুঞ্জন করছে। মরগানের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।

মাথা নাড়ছেন তিনি। 'দেখলেন কাণ্ডটা? কমিক বুকের আর্টিস্টেরও কত দাপট?' শ্রাগ করলেন। 'হুফারের এখানে আসার উদ্দেশ্য ছবি বিক্রি করা। সেটা করতে না পারলে হোটেলের ভাড়া নিয়েই বিপদে পড়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মানুষকে চুরি করতে বাধ্য করে। 'আরও কয়েকজনের ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে, প্রশ্ন করতে চাই। সোনালি পোশাক পরা মেয়েটা কে?'

হাসলেন মরগান। 'ও, মিরিনা জরডানের কথা বলছ? মেয়েটা যথেষ্ট চালাক। সম্মেলনে এই প্রথম যোগ দিয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, স্টেলারা স্টারগার্লের চমৎকার নকল ওই মেয়েটা। স্টার বানাতে চাইছে ওকে ওর মা।'

'টেবিলে বসা ওই লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওর নাম নীল বোরাম। হিরোয়িক কমিকসের সিনিয়র এডিটর। স্টেলারা স্টারগার্ল ছাপে ওরাই। মিসেস জরডান মেয়ের চেয়ে আরও চালাক, করিতকর্মা। কোন্ কাজে কাকে ধরতে হবে খুব ভাল জানে। দুই মাসের মধ্যেই কোন কমিক বইয়ের মলাটে যদি মিরিনার হাসি হাসি মুখ জ্বলজ্বল করে, অবাক হব না।' কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই মাথা নাড়লেন মরগান। 'সব মহলের লোকের সঙ্গে জানাশোনা আর খাতির মহিলার। আমার জন্যে যদি কাজ করত, ভাল হত।'

পকেটে হাত দিলেন মরগান। 'ওদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইলে আজ রাতের পার্টিতে এসো, খাওয়া-দাওয়াও হবে। বাড়তি কয়েকটা টিকেট আছে। এই যে নাও, এটা তোমার...' রবিনকে দিলেন তিনি। কিশোরকে একটা দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার, আর এই এটা তোমাদের আরেক বন্ধুর জন্যে।' হাসলেন। 'তোমাদের ভেজা বন্ধু।'

একটু থেমে যোগ করলেন, 'পার্টিতে ভিড় হবে খুব। অনেক সময় ধরে চলবে, অনেক রাত পর্যন্ত। তবে অসুবিধে নেই। তোমাদের জন্যে ঘর রেখে দেব আমি, ঘুমাতে পারবে।'

ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'এবার যেতে হয়। সাংবাদিকদের কাছে ফ্যান গেস্ট অভ অনারদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

প্রায় ছুটে চলে গেলেন মরগান।

'ফ্যান গেস্ট অভ অনারটা কি বলো তো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'জানি না। বুঝতে পারছি না সাংবাদিক কেন দরকার মরগানের। নিজে নিজেই তো অনেক কিছু করে ফেলেছেন।'

'এখন আমাদের কাজটা কি?'

'চলো, ওপরে যাই। তারপর মুসাকে নিয়ে বাড়ি যাব। শুকনো কাপড় দরকার ওর। আর রাতে আমাদেরকেও অন্য পোশাক পরে আসতে হবে। ব্যাংকোয়েট পার্টিতে এই জিনস আর টি-শার্টে চলবে না।'

এখনও শুকায়নি মুসার কাপড়, ভেজা রয়েছে। আর কোন উপায় নেই। ওগুলোই পরল সে। গাড়িতে এসে উঠল তিনজনে।

রকি বীচের দিকে চলতে চলতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো, কাকে বেশি সন্দেহ হয় তোমাদের?'

'অবশ্যই আইজাক হুফার,' রবিন বলল।

'কেন?'

সামনের সীট থেকে কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল রবিন। 'ওর নিজের ছবি নিজেই পোড়ানোর দৃশ্যটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না আমি। মনে হল যেন জোর করে কিছু প্রমাণের চেষ্টা করছে। এবং আমরা জানি, ফ্যান ফান বইতে তার আঁকা ছবিগুলো চুরি গেছে।'

'এটা একটা পয়েন্ট,' একমত হলো কিশোর।

'তারপর রয়েছে আরেকটা ব্যাপার, টাকাপয়সার টানাটানি আছে ওর। কারণ ওর ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে দেখে সাংঘাতিক হতাশ হয়ে পড়েছে, আচরণেই বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা। অথচ একশো ডলার দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল! নষ্ট করল কেন অতগুলো টাকা? অদ্ভুত নয় এসব আচরণ?'

'বেশ,' কিশোর বলল। 'ধরা যাক, হুফারই আমাদের চোর। কিন্তু তার ঘরের জিনিসপত্র তছনছের ব্যাপারটা কিসের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়?'

'বলতে পারছি না। অনেকগুলো ঘোরপ্যাঁচ রয়েছে পুরো ব্যাপারটাতে। একবার মনে হচ্ছে হুফারই সব কিছুর হোতা, আবার মনে হচ্ছে তা হতে পারে না। তাহলে তার ঘরে লোক ঢুকে জিনিস নষ্ট করে কেন? তাছাড়া সে চুরি করে থাকলে তার ঘরে চোরাই মালগুলো নেই কেন? প্রমাণ যাতে না থাকে সেজন্যে অবশ্য সরিয়ে রাখতে পারে অন্য কোথাও। আরও একটা কথা ভাবছি, লাল আলখেল্লা পরা জীবন্ত ক্রিমসন ফ্যান্টম আর মুসাকে যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, ফ্রগ মিউট্যান্ট, একই লোক নয় তো? আর সেই লোকটা কি আইজাক হুফার?'

'তা হতে পারে না,' ড্রাইভিং সীট থেকে বলল মুসা। 'হুফারের শরীরের গঠন আর ব্যাঙটার গঠনে তফাত আছে। এক রকম নয়।'

'এই ক্রিমসন ফ্যান্টমের রহস্যটায় আরও লোক জড়িত রয়েছে,' কিশোর বলল। 'এই যেমন, ডিকসন আর বোরাম।' পেছনের সীটে হেলান দিল সে।

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, একজন আরেকজনের ব্যাপারে কেমন পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা বলছে? ডুফার ভাবে হুফার একজন জিনিয়াস। ডিকসন ভাবেন পাগল, আর মরগান দুঃখ করেন তার জন্যে। ডিকসন নিজেকে ব্যবসায়ী ভাবেন, অথচ হুফার আর ডুফার বলে লোকটা একটা শয়তান।'

হেসে উঠল রবিন। 'হুফার ভাবে সে কমিকের সংস্কারক, দামি কমিকগুলো বাঁচানর চেষ্টা করছে। কিন্তু ডিকসন আর মরগান ভাবছেন, সে কেবল একটা কাজেই পটু, গোলমাল বাধানো।' এক সেকেণ্ড ভাবল সে। 'বোরামের ব্যাপারটা কি? আমার তো মনে হয় না কেউ ওকে পছন্দ করে। ডুফার তাকে ঘৃণা করে, কারণ তাকে ঠকিয়েছে এডিটর। হুফারের বিশ্বাস, ক্রিমসন ফ্যান্টমের বারোটা বাজিয়েছে বোরাম। ডিকসনও দেখতে পারেন না। কমিক কেনার জন্যে এত চাপাচাপি করেও তাঁকে রাজি করাতে পারেনি লোকটা।'

'যে বইটা সে কেনার এত চেষ্টা করল, সেটাই চুরি হয়েছে, এতে কি কিছু প্রমাণিত হয়?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়,' জবাব দিল কিশোর। 'তাকে সন্দেহ হয়। তোমার ওপর হামলা চালিয়েছে বলেও সন্দেহ করতে পারতাম, যদি শরীরের গঠন মিলে যেত। বোরামকে দেখলে মনে হয় একটা বগা, ভুঁড়িওয়ালা বগা। আর তোমার ওপর যে হামলা চালিয়েছিল, সে স্বাস্থ্যবান লোক, পেশীবহুল শরীর।'

গাড়ির ছাতের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল কিশোর। তার সন্দেহের তালিকায় মিরিনা জরডানকেও যোগ করতে চাইছে। কিন্তু মেলাতে পারছে না। ডিকসনের সঙ্গে যখন দরাদরি করছে কিশোর, তখন স্টলের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে কি অপরাধ করেছে মিরিনা?

অপরাধ জগতের এটা একটা পুরানো কৌশল। সুন্দরী একটা মেয়েকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দিয়ে লোকের নজর সেদিকে আকৃষ্ট করা, এবং সেই সুযোগে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মত করে অপরাধটা ঘটিয়ে ফেলা।

কিন্তু মিরিনাকে এই অপরাধের সঙ্গে জড়াতে ভাল লাগছে না কিশোরের। ও এতে জড়িত না থাকলেই সে খুশি হয়।

'কেসটা বড়ই অদ্ভুত,' অবশেষে বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ডিকসন একটা কথা ঠিকই বলেছেন, সংগ্রহ-টংগ্রহ যারা করে, ওই মানুষগুলোর মাথায় আসলেই কিছুটা ছিট আছে। নইলে কমিক বুক জোগাড়ের মত একটা ছেলেমানুষীতে এত আগ্রহ কেন?'

'ঠিক,' শুকনো গলায় বলল রবিন। 'চালাক হলে তো ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র জোগাড়ের মত বড়মানুষীই করত। কম্পিউটার নিয়ে পাগল হত।' হাসিটা চওড়া হল তার। 'কিংবা পুরানো গাড়ি নিয়ে।'

মুসা কিছু বলল না। তবে কিশোর টিটকারিটা হজম করল না। খোঁচা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিছু কিছু মানুষের মেয়ে দেখলে পাগল হয়ে যাওয়ারও একটা বাতিক আছে।'

কেসের ব্যাপারে আলোচনার আপাতত এখানেই ইতি ঘটল।

রকি বীচে পৌঁছে ইয়ার্ডের কাছে কিশোরকে নামিয়ে দিল মুসা।

ভেতরে ঢুকে অফিসের বারান্দায় চাচা-চাচীকে বসে থাকতে দেখল কিশোর। তাঁদেরকে জানাল, রাতে বাড়ি ফিরবে না। হোটেলে থাকবে। কাজ আছে। রাশেদ পাশা কিছুই বললেন না। মেরিচাচী জানতে চাইলেন, কাজটা কি। জানাল কিশোর, অবশ্যই অনেক কিছু গোপন করে, ঢেকেঢুকে। তারপর চলে এল নিজের ঘরে। পোশাক পাল্টানোর জন্যে।

আধ ঘণ্টা পরেই ইয়ার্ডে এসে পৌঁছল অন্য দুই গোয়েন্দা। পোশাক পাল্টে এসেছে। বাইরে রাত কাটাতে হবে, তাই ব্যাগে করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। মুসার ইমপালাতে করেই চলল ওরা, কোস্ট হাইওয়ে ধরে। মুসাকে সান্তা মনিকা হয়ে যেতে বলল কিশোর।

কেন, জানতে চাইল মুসা।

'ম্যাড ডিকসনের স্টলে লেখা রয়েছে, তাঁর দোকানটা সান্তা মনিকায়, দেখনি?' কিশোর বলল, 'ফোন বুক দেখে ঠিকানা জেনে নিয়েছি। পথেই পড়বে, বেশি ঘুরতে হবে না আমাদের। দেখেই যাই কি ধরনের বই বিক্রি হয় ওখানে।'

ম্যাড ডিকসনের কমিক এমপোরিয়ামটা রয়েছে পিকো বুলভারে। বাণিজ্যিক এলাকার একধারে একটা সাধারণ দোকান। দু'পাশে আরও দুটো দোকান, দুটোরই করুণ চেহারা, ব্যবসা ভাল না বোঝাই যায়। একটাতে বেতের তৈরি আসবাব বিক্রি হয়, আরেকটাতে নানা ধরনের ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার।

ডিকসনের দোকানটায় রঙের ছড়াছড়ি। ডিসপ্লে উইনডোগুলোর কাচে সাঁটানো রয়েছে রঙ-বেরঙের ছবি, সবই কোন না কোন কমিকের বিচিত্র হিরোর। দরজার কাছে লাগানো রয়েছে স্টেলারা স্টারগার্লের বিশাল এক ছবি। দেখতে হুবহু মিরিনা জরডানের মত। কিংবা বলা যায় মিরিনাই দেখতে স্টেলারার মত।

'বাহ্,' সবুজ একটা ভ্যানের পাশে গাড়ি রাখতে রাখতে বলল মুসা, 'দেখো, কে এসেছেন!'

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডিকসন। দরজার দিকে নজর। দুটো ছেলে কমিক বইয়ের দুটো ভারি বাক্স নিয়ে বেরোচ্ছে। বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাকল কিশোর, 'মিস্টার ডিকসন?'

'আরে, তোমরা,' এলোমেলো চুলে আঙুল চালালেন ম্যাড। হাতে একগাদা কমিক।

'স্টলে বিক্রির জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝি,' কিশোর বলল আলাপ জমানো ভঙ্গিতে। 'শূন্য জায়গা ভরবেন, চোরে যেগুলো খালি করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' হাতের কমিকগুলোর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ডিকসন। তারপর মুখ তুলে হাসলেন। 'শুনলাম, বাতাসে ওড়ার কায়দা শিখে ফেলেছ? তিন তলা থেকে চত্বরে না পড়ে গিয়ে পড়েছ সুইমিং পুলে?' মাথা দুলিয়ে বললেন, 'তোমরা গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে সঙ্গে এসবও প্র্যাকটিস করো নাকি?'

ডিকসনের হাতের দিকে তাকাল কিশোর। সবচেয়ে ওপরের কমিকের ছবিটা দেখল। ফ্যান ফান নাম্বার ওয়ানের আরেকটা কপি। প্রাইস স্টিকারটায় দৃষ্টি আটকে গেল তার। দাম লেখা রয়েছে দু'শো পঞ্চাশ ডলার।

'ঠিক এরকম একটা কমিকই চুরি হয়েছে দেখেছি,' কিশোর বলল। 'এটার দাম তো অনেক কম। নীল বোরামের কাছে অনেক বেশি চেয়েছিলেন?'

'ওটা একটা বিশেষ বই ছিল...' বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ডিকসন। কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন। 'আমাকে এসব প্রশ্ন কেন? বরং ওই চোরটাকে ধরার চেষ্টা করা উচিত তোমাদের।'

'তা-ই তো করছি। তদন্ত চালাচ্ছি আমরা। জানেন বোধহয়, তদন্ত করতে গেলে অনেক প্রশ্ন করতে হয়।'

'ভুল লোককে করছ। আমার লোক তোমাদেরকে রেস্টুরেন্টে হুফারের সঙ্গে দেখেছে। শোনো, ওই লোকটাকে পাত্তা দিও না। ওর কথাও শুনো না। হুফার আর ডুফারের মত মানুষের সঙ্গে কারও মেশাই উচিত না। বাজে স্বভাব। ওদের মতই কমিক সংগ্রহ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম আমিও। কিন্তু আস্তে আস্তে পেশা হিসেবে নিয়ে নিলাম কাজটাকে, ব্যবসা শুরু করলাম। ভালই করছি এখন। ওদের মত শয়তানি করে কাটাচ্ছি না।'

ভ্রূকুটি করলেন ম্যাড। 'এমন সব কাণ্ড করে ওরা, এমন সব ফালতু কারণে রাগ পুষে রাখে, যেগুলোর কোন মানেই হয় না। একবারও ভেবে দেখে না কমিক ডিলার আর কমিকের দোকানদাররাই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন হুফার, তেমনি ডুফার। আমাদের মত ব্যবসায়ীদের কষ্ট দিতে পারলেই যেন ওদের যত আনন্দ।'

আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ম্যাডকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কি চুরি করতেও পিছপা হবে না ওরা?

ছয়

ডিকসনকে তাঁর দোকানের সামনে রেখে আবার রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। সেঞ্চুরি গ্র্যাণ্ড ধরে এগোল। ড্রাইভিং হুইল ধরে বসেছে মুসা, সামনের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'ভাবসাবে মনে হলো, আমাদেরকে তিন গোয়েন্দা না ভেবে তিন ভাঁড় ভেবেছেন ম্যাড। থ্রী স্টুজেস।'

'এবং তাঁর সেই ভাবনাটারই অবসান ঘটাতে হবে আমাদের,' গম্ভীর হয়ে বলল পেছনের সীটে বসা কিশোর। 'আর তা করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। জানতে হবে কমিক চুরির সময়টায় সন্দেহভাজনদের কে কোথায় কি করছিল।'

'ডিকসন কোথায় ছিলেন, জানি,' রবিন বলল। 'আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

কিশোর ভাবছে, মিরিনা জরডান কোথায় ছিল, তা-ও জানি। ক্রিমসন ফ্যান্টম যখন এগিয়ে আসছিল, আমাদের কাছ থেকে তখন সরে যাচ্ছিল মেয়েটা। হয়তো ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল...ভাবনাটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। অন্যান্য সন্দেহভাজনদের কথা ভাবতে লাগল। 'আমি জানতে চাই, নীল বোরাম কোথায় ছিল তখন। আর এডগার ডুফার। বিশেষ করে, আইজাক হুফারের কথা তো জানতেই চাই। প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

মাটির নিচের গ্যারেজে গাড়ি রেখে, এলিভেটরে করে উঠে এসে নিজেদের ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ব্যাগ নামিয়ে রাখল। তারপর রওনা হলো মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে। কনভেনশন ডোরের বাইরে অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে ভিড়, কিন্তু ভেতরে যেন আরও বেড়েছে। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে আছে। রুক্ষ চেহারার সিকিউরিটি গার্ড, সামনের দুটো দাঁত ভাঙা যার, সে আবার ফিরে এসে বসেছে নিজের জায়গায়। তিন গোয়েন্দাকে আটকাল। ভাল করে ওদের হাতের সিল দেখে তারপর ঢুকতে দিল।

সঙ্গীদের নিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ঘরের একধারে চলে এল কিশোর। সারি সারি টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলের সামনে বসে ভক্তদের বাড়িয়ে দেয়া খাতায় অটোগ্রাফ দিচ্ছে কমিক আর্টিস্টরা। কেউ কেউ পেন্সিল দিয়ে কমিকের হিরোর স্কেচ এঁকে দিচ্ছে। কিছু টেবিলে কমিক বই, ম্যাগাজিন, আর ইলাসট্রেশন বোর্ডের সাথে সাথে উঁচু হয়ে আছে পোস্টারের স্তূপ। সেগুলোও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে।

চুটিয়ে ব্যবসা করে চলেছে আর্টিস্টেরা। শত শত লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে টেবিলের সামনে। ছেলে-বুড়ো-মাঝবয়েসী সব বয়েসের সব ধরনের লোক। মানিব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে এসেছে। অকাতরে সেগুলো খরচ করছে কমিকের পেছনে। অনেক ভক্তেরই চোখ চকচক করছে তাদের প্রিয় শিল্পীকে দেখতে পেয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে যেন ধন্য হচ্ছে। কিছু কিছু তো আছে, ওদের কাণ্ড দেখে মাথার স্থিরতা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। খাতায় তো অটোগ্রাফ নিচ্ছেই, বই, পোস্টার যত পারছে কিনে সেগুলোতে নিচ্ছে, গায়ের শার্টে নিচ্ছে, কেউ কেউ কাগজের কফি কাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে আর্টিস্টের দিকে, সই করে দেয়ার জন্যে।

অটোগ্রাফের অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে চলছে নানা রকম প্রশ্ন, ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে আর্টিস্টদের। ধৈর্যের সাথে সই করে দিচ্ছে ওরা, প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে, ব্যবসার স্বার্থে। এত মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কোলাহলে পরিণত হয়েছে।

'আপনি না থাকলে স্লাইম ম্যান আর স্লাইম ম্যান থাকত না, জ্যাক,' বলল এক ভক্ত। 'ওকে কেউ আপনার মত করে আঁকতে পারত না।'

আরেকজন তরুণ ভক্ত আরেক আর্টিস্টের সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'রোবট অ্যাভেঞ্জারের বারোটা বাজিয়েছেন আপনি। একমাত্র স্টেবিনস জানত কি করে ওই রোবট আঁকতে হয়। আপনি তো ওটার মাথাকে ভলভো গাড়ির নাক বানিয়ে দিয়েছেন। কিছু হয়েছে ওটা? আপনাকে বের করে দেয় না কেন কোম্পানি?' একটা বই বাড়িয়ে ধরে বলল সে, 'দিন, এখানে একটা সই করে দিন।'

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর্টিস্ট। 'আমার আঁকা ভাল না লাগলে অটোগ্রাফ নিতে এসেছ কেন? বইটাই বা কিনেছ কেন?'

'কিনেছি বিক্রি করার জন্যে। আপনার সই থাকলে ডবল দামে বেচতে পারব।'

বিহ্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বইটাতে সই করে দিল আর্টিস্ট।

এই কনভেনশন রুমটাকে কেন ম্যাডহাউস বলে বুঝতে পারছে কিশোর। 'পাগলখানা!' বিড়বিড় করল সে, 'ঠিক নামই দিয়েছে!' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো, আইজাক হুফারকে খুঁজে বের করি।'

সব চেয়ে লম্বা লাইন পড়েছে হুফারের টেবিলের সামনে। অন্য আর্টিস্টদের মত তার টেবিলে বই, ম্যাগাজিন কিংবা পোস্টার নেই বিক্রির জন্যে। ভক্তদের বাড়িয়ে দেয়া খাতায় দ্রুত এঁকে দিচ্ছে কমিকের বিভিন্ন চরিত্র। কোন কোন ভক্ত সহানুভূতির সুরে বলছে কি করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তার চিত্রকর্মকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। অনুরোধ করছে আরও ভাল কোন চরিত্র তৈরি করার জন্যে, যেটা আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। শিল্পীর নিজের হাতে এঁকে দেয়া ছবি পেয়ে খুব খুশি ওরা।

কয়েকটা ছেলে এসে ধরল হুফারকে ক্রিমসন ফ্যান্টম এঁকে দিতে হবে, কিংবা ক্রিমসন ফ্যান্টমের বইতে সই করে দিতে হবে।

'দেরি করছেন কেন!' চিৎকার করে উঠল এক কিশোর, 'দিন, এঁকে দিন!'

হুফারের নাকের কাছে ক্রিমসন ফ্যান্টমের একটা নতুন সংস্করণ দুলিয়ে বলল আরেকজন, 'এটাতে সই করুন।'

ছেলেটার কব্জি চেপে ধরল হুফার। 'ক্রিমসন ফ্যান্টমে সই আমি করব না। করাতে হলে বোরামের কাছে নিয়ে যাও। আরও বিশটা চরিত্র তৈরি করেছি আমি। ওগুলোর কোনটা চাও তো বলো, এঁকে দিই।'

'না, ক্রিমসনেই দিতে হবে,' গোঁয়ারের মত বলল অবুঝ ছেলেটা। 'আঁকতে পেরেছেন, সই দিতে পারবেন না কেন?'

'ওটা এখন বোরামের সম্পত্তি। তার কাছে যেতে বললাম তো।'

'না, আপনাকেই দিতে হবে।'

'আমি পারব না,' মাথা নাড়ল হুফার। 'আর ওভাবে আমার নাকের সামনে ওটা নাড়তে থাকলে মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে দিলাম। কালি ঢেলে নষ্ট করে দেব বইটা।'

হাত ছেড়ে দিল হুফার।

তার নাকের কাছে বইটা নাড়তেই থাকল ছেলেটা।

'ছিঁড়ে ফেলব কিন্তু!' হুমকি দিল হুফার।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর বিরক্ত করতে সাহস করল না ছেলেটা। হাত সরিয়ে নিয়ে হারিয়ে গেল ভিড়ের ভেতরে।

'দাঁড়াও, আমি একবার কথা বলে আসি হুফারের সঙ্গে,' ফিসফিসিয়ে দুই বন্ধুকে বলল রবিন। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ভিড় ঠেলে টেবিলের দিকে এগোতে শুরু করল সে। গুঁতো খেয়ে রেগে গিয়ে তার দিকে ঘুরে জ্বলন্ত চোখে তাকাতে লাগল লোকে। পাত্তাই দিল না সে। এগোতেই থাকল। কিন্তু যে হারে ঠেলাঠেলি করছে লোকে, হুফারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিভাবে? কাজেই, সরাসরি পথটাই বেছে নিল সে। নাম ধরে ডাক দিল, 'মিস্টার হুফার?'

মুখ তুলে তাকাল হুফার। 'আবার কি?' রবিনের শূন্য হাত দেখে বলল, 'ও, আলতু-ফালতু জিনিস অন্তত সই করতে আননি। তা কি চাই? স্কেচ? কার ছবি আঁকব? তোমাকে দেখে কিন্তু লাগছে তুমি কিলার ব্রেন-এর ভক্ত। ঠিক বলেছি না?' ততক্ষণে ওর কলম কাগজের ওপর ছোটাছুটি শুরু করেছে।

'আপনাকে আমি ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে দেখেছিলাম। দোকানটায়

বোমা ফাটার আগে। ছেলেটার হাত থেকে কমিক নিয়ে পোড়ানর দৃশ্যটা দারুণ লেগেছিল আমার কাছে।'

আচমকা ব্রেক কষার পর পিছলে গিয়ে যেন থেমে গেল হুফারের কলম।

'কমিকগুলো ডাকাতি হওয়ার সময় আপনি ওখানে থাকলে খুব ভাল হত,' আবার বলল রবিন। 'লোকটাকে হয়তো ধরে ফেলতে পারতেন। কোথায় ছিলেন তখন? লোকটাকে দেখেননি?'

নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হুফার। ভক্তরা বিরক্ত হতে আরম্ভ করেছে। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'এই, আগেই এসে বকবক শুরু করলে কেন? লাইনে দাঁড়াও। তোমার পালা আসুক, তারপর জিজ্ঞেস করো।'

'হুফার,' আরেকজন বলল, 'আমাদের দিকে নজর দিন। ও তো অনেক পরে এল। যেতে বলুন ওকে।'

'কোথায় ছিলাম?' কারও দিকে না তাকিয়ে অবশেষে রবিনের কথার জবাব দিল হুফার। 'এই চিড়িয়াখানার ভেতরেই।' তিক্ত কণ্ঠে কথাটা বলে আবার আঁকতে শুরু করল সে। মুখ না তুলেই বলল, 'যাও, ভাগ। আমি ব্যস্ত।'

স্কেচটা তুলে ধরে বলল, 'কিলার ব্রেন কিনতে চান কেউ?'

তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এত তাড়াতাড়ি এভাবে ওর দিক থেকে নজর সরিয়ে নেবে হুফার, কল্পনাও করেনি। এরকম আচরণ করতে না পারলে যে ভক্তদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারত না, এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সে। কানের কাছে অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল, ছবিটা কিনতে চায় ওরা, একজন একটা দাম বললে আরেকজন তার চেয়ে বেশি আরেকটা বলছে। নীলামে চড়ানো হয়েছে যেন ওই সদ্য আঁকা ছবি। কোনমতে দু'পাশের দু'জনকে সরিয়ে আরেকটু আগে বাড়ল রবিন। তার একটা কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের।' এর বেশি আর বলতে পারল না। টেনে তাকে পেছনে নিয়ে গেল কয়েকটা হাত।

ঢুকতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, বেরোতে তার চেয়ে কম হল না। সবাই হুড়াহুড়ি করছে টেবিলের কাছে যাওয়ার জন্যে।

ভিড়ের ঠিক বাইরেই অপেক্ষা করছে কিশোর আর মুসা।

রবিন বেরোতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি বলল?'

'কমিক ডাকাতির সময় সে নাকি এই ঘরেই ছিল,' পেছনের জনতার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন। 'এখন যারা আছে, তখনও হয়তো তাদের অনেকেই ছিল। তার মানে অনেকেই তাকে দেখেছে। সাক্ষ্য দিতে পারবে তারা।' হাত দিয়ে ডলে পোলো শার্টটা সমান করার চেষ্টা করতে লাগল সে। ভিড়ের চাপে কুঁচকে গেছে জায়গায় জায়গায়।

'হুঁ!' সরু হয়ে এল কিশোরের চোখের পাতা, 'তাহলে ডাকাতির পর পরই এত তাড়াতাড়ি স্টলের কাছে পৌঁছে গেল কি করে?'

'সে আর ডুফার একই সময়ে হাজির হয়েছে,' রবিন বলল। 'হয়তো একই সাথে ছিল দু'জনে!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ভাল বলেছ। ডুফারকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

পরিচিত একটা মুখ দেখা দিল ভিড়ের ভেতরে। পিটার, যে লোকটা ওভারস্ট্রীপ কমিকের কপি ধার দিয়েছিল ডুফারকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে জানতে চাইল, কি করছে এখানে।

এমনি এসেছে, দেখতে, জানাল কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করল, ডুফারকে দেখেছে কিনা। মাথা নেড়ে পিটার জানাল, 'গত এক ঘণ্টা ওর সঙ্গে দেখা নেই।' হাসল হঠাৎ করেই। 'গোল্ড রুমে গিয়ে দেখতে পারো।' কি করে যেতে হবে পথ বলে দিয়ে বলল, 'না গেলেও অবশ্য পারো। যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে ডুফার।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'নীল বোরামকে দেখেছেন কোথাও?'

'দেখেছি,' হাত তুলে দেখাল পিটার। 'ওই যে ওখানে। হিরোয়িক কোম্পানির লোক নিয়ে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছে বোরাম। নতুন কোন হিরোয়িক ক্লাসিকের ঘোষণা দিচ্ছে মনে হয়।'

সেদিকে তাকিয়ে ক্যামেরার আলো ঝিলিক দিতে দেখল কিশোর। আর সোনালি পোশাকের চমক। দ্রুত এগোল দুই সহকারীকে নিয়ে। জায়গাটার স্টল সব সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে বিশেষ কাজের জন্যে। হিরোয়িক কমিকের কয়েকজন আর্টিস্ট পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইফ সাইজ কিছু কার্ডবোর্ডে আঁকা কমিকের বিভিন্ন চরিত্রের ছবির সামনে।

কিন্তু তাদের দিকে নজর নেই ক্যামেরার। আলো ফেলা হয়েছে স্টেলারা স্টারগার্লের ওপর, ক্যামেরার চোখও তারই ওপর আটকে আছে যেন। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। ছবির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা জরডান, এখনও সোনালি কসটিউম পরনে, সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসছে।

একটু দূরে তার মা কথা বলছে সাংবাদিকদের সঙ্গে। তার পেছনে নীল বোরাম।

সম্পাদকের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। 'মিস্টার বোরাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'কেন নয়?' টাকে হাত বোলালেন বোরাম। 'করো, প্রশ্ন করো।'

'আমি আপনাকে ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে দেখেছি, ডাকাতির একটু আগে,' কিশোর বলল। 'আপনার কি মনে হয়, যে কমিকগুলো চুরি হয়েছে ওগুলো মূল্যবান?'

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বোরাম। 'এটা কি ধরনের প্রশ্ন হলো?'

'আমি আর আমার দুই বন্ধু এই কেসের তদন্ত করছি, ম্যাড ডিকসনের হয়ে।' মুসা আর রবিনকে দেখাল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল বোরামের হাতে। 'আপনার মতামত জানা দরকার...'

বাধা দিয়ে বোরাম বললেন, 'শুধু মতামত নয়, আরও অনেক কিছুই জানতে চাও তুমি।' কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন বোরাম। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে। 'ডাকাতি হওয়ার সময় কনভেনশন ফ্লোরেই ছিলাম না আমি, স্টলের কাছে থাকা তো দূরের কথা। গোল্ড রুমের বাইরে কমিকের এক মাথামোটা পূজারি আটকে ফেলেছিল আমাকে।'

'পুজারি?'

'এডগার ডুফার।' ভ্রূকুটি করলেন বোরাম। যেন ডুফারের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই স্মৃতিটাও বিরক্ত করছে তাঁকে। 'গোল্ড রুম থেকে বেরিয়ে এল, গাধাগুলো যেখানে সিনেমা দেখাচ্ছিল সেখানে। মনে হলো, প্রোজেকটরের কিছু একটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মেরামতের চেষ্টা করছিল লুই মরগান। এই সময় ডুফার বেরিয়ে এসে বিরক্ত করতে শুরু করল আমাকে।'

'তারপর?'

'কে জানি এসে বলল, ম্যাড ডিকসনের স্টলে গণ্ডগোল হয়েছে। দেখতে গেল ডুফার। ভাবলাম, মরগান বোধহয় জানে কিছু, তাই তাকে ধরলাম। সত্যি বলছি, এভাবে ডুফারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশিই হয়েছিলাম। নিজের সম্পর্কে তার উঁচু ধারণা।' কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসলেন বোরাম। 'অনেক অনেক উঁচু।'

একটু থেমে বললেন সম্পাদক, 'তোমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে? কাজ আছে আমার, যেতে হবে।'

লোকটা চলে যাচ্ছেন, তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কিশোর। কেসটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না এখনও।

কাঁধে হাত পড়তে ফিরে তাকাল সে। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন লুই মরগান।

'বোরামের সঙ্গে কথা বললে দেখলাম,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তোমাদের কেসে সে-ও জড়িয়েছে নাকি?'

'জড়াতেও পারে,' অনিশ্চিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'ডাকাতির আগের মুহূর্তেও ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন অস্বীকার করছেন। অ্যালিবাই রয়েছে বলছেন। সেটাই তদন্ত করে দেখতে হবে আমাদের।'

'আর কার কার ব্যাপারে তদন্ত করবে?'

'এডগার ডুফার। আইজাক হুফারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলে এসেছি।'

আগ্রহ ফুটল মরগানের চোখে। 'তারও কি অ্যালিবাই আছে নাকি?'

'বলল তো সেরকমই। আর্টিস্ট সেকশনে নাকি জিনিসপত্র বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। আমার তো বিশ্বাস, নয়শো অটোগ্রাফ শিকারি তার পক্ষে রায় দেবে।'

'আমার মনে হয় না,' ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লেন মরগান। 'ঢোকার মুখে তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, তখন কিন্তু আমি আর্টিস্ট এরিয়ার ভেতর দিয়েই এসেছি। একটা লোককেও তখন দেখিনি হুফারের টেবিলের সামনে। কারণ, হুফার তখন টেবিলেই ছিল না।'

সাত

'আজ রাতেই অ্যালিবাইগুলো সব যাচাই করে দেখতে হবে,' বলল কিশোর। ব্যাংকোয়েট রুমে ঢুকেছে দুই সহকারীকে নিয়ে। 'ডাকাতির সময় ম্যাড ডিকসনের স্টলের কাছাকাছি ছিল এরকম কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলব।' টাইটা সমান করতে লাগল সে। অস্বস্তি ফুটেছে চোখে।

ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। 'কাণ্ডটা কি হলো! এমন করছ কেন? সেই সোনালি চুল মেয়েটাই মাথা গরম করেছে তোমার। এরকম অবস্থা তো দেখিনি! রহস্য রেখে সুন্দরী মেয়ের দিকে ঝুঁকেছে আমাদের কিশোর পাশা! অবিশ্বাস্য!'

'ফালতু কথা রাখো তো!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল কিশোর। গাল লাল হয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ঘুরছে চোখ, নিশ্চয় মিরিনা জরডানকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দেখা গেল মেয়েটাকে। স্টেলারা স্টারগার্লের অনুকরণে আরেকটা পোশাক পরেছে। এটা আগেরটার চেয়ে অনেক সহনীয়। উঁচু কলারওয়ালা আলখেল্লা। সোনালি চুলগুলোকে সোজা করে আঁচড়ে নিয়ে ঠিক চাঁদিতে বসিয়েছে একটা মুকুট। সোনালি রঙের সিল্কের কাপড়ে তৈরি হয়েছে পরনের স্কার্টটা। হাঁটতে গেলেই আলখেল্লা আর স্কার্টের ঝুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দর লম্বা পা। এই পোশাকে তাকে আগের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় লাগছে।

মিরিনার মা কয়েকজন কমিক ভক্তের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ডুবে না যাওয়াতক অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর এগিয়ে গেল মিরিনার দিকে, কথা বলার জন্যে।

পরিচয় দিল কিশোর।

'ও, তুমি ওদেরই একজন,' মিরিনা বলল, 'চোরাই কমিক খুঁজছে।' বড় বড় চোখ জ্বলজ্বল করছে আগ্রহে। 'কনভেনশন ফ্লোরের সবাই তোমাদের কথা বলাবলি করছে। তোমার বন্ধু সুইমিং পুলে পড়ার পর থেকে।'

'তাই!' ঢোক গিলল কিশোর। কিভাবে শুরু করবে ভাবছে। সোজাসুজি বলাই ভাল, তাই বলল, 'ডাকাতির সময় তুমি ঘটনাস্থলেই ছিলে।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মিরিনা।

'ম্যাড ডিকসনের স্টলের কাছে,' আবার বলল কিশোর। 'আমি···ওখানে তোমাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

হাসল মিরিনা। 'শুধু তুমি নও, অনেকেই আমাকে দেখেছে ওখানে। তাকিয়ে ছিল। এই সম্মেলনে ঢোকার সাহসটা যে কিভাবে করলাম, ভাবলে আমারই অবাক লাগে।'

'খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু তোমাকে।'

'এভাবেই কথা বলো নাকি তুমি?' আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মিরিনা। 'এত সোজাসাপ্টা?'

'ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে লাভটা কি?' বলল বটে কিশোর, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, এভাবে বললে লোকে যেমন খুশি হয়, রেগেও যায়। প্রশংসা করছে বলে রাগছে না মেয়েটা, কিন্তু যদি সমালোচনা করত? সত্যি হলেও রেগে আগুন হয়ে যেত। বহুবার নিজেকে বুঝিয়েছে কিশোর, এভাবে আর বলবে না। কিন্তু বলার সময় ঠিক রাখতে পারে না। স্বভাব মাফিক সরাসরিই বলে ফেলে সব কথা। মিথ্যে করে বলল, 'তোমার মত একজন বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলছি।'

'বিশিষ্ট চরিত্র' কথাটা কিভাবে নিল মিরিনা বোঝা গেল না। কারণ হাসতে দেরি করল সে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর ব্যাঙ্গ করল কি-না। হাসিটা

ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। 'ডাকাতটার কথা জিজ্ঞেস করবে তো? না, ভাই; আমি ওকে দেখিনি।'

'অন্য কিছু তো দেখেছ? অস্বাভাবিক কিছু? পরিবেশের সঙ্গে মেলে না এমন?'

শ্রাগ করল মিরিনা। 'নাহ্, ওরকম কিছু দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আসলে, ভয়েই অস্থির হয়ে ছিলাম তখন। ওই যে, প্রথম স্টেজে উঠতে গেলে কিংবা বক্তৃতা দিতে গেলে এক ধরনের ভয় ভয় লাগে না। আসলে, ভয় না বলে অস্বস্তি বলাই উচিত। বুঝতেই পারছ, জীবনে প্রথম এতবড় সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি।'

ভাবছে মেয়েটা। কপালে হালকা ভাঁজ পড়েছে। হঠাৎ হাত তুলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে পড়েছে। ম্যাড ডিকসনের স্টলটার দিকে তাকিয়েছিলাম বটে, নামটা আজব বলেই চোখ আটকে গিয়েছিল। কালো এলোমেলো চুলওয়ালা এক লোক দাঁড়িয়েছিল টেবিলের ওপাশে...' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'তুমি কথা বলছিলে তার সাথে!' আবার কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'তোমার পাশে ছিল লম্বা একটা নিগ্রো ছেলে, আর একটা আমেরিকান ছেলে, চুলের রঙ...'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসা আর রবিনের কথা বলছে। এসব শুনতে চায়নি সে। 'আর কিছু দেখনি? অস্বাভাবিক কিছু?'

মাথা নাড়ল মিরিনা। 'নাহ্। পোশাক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চলেছি তখন, সেদিকেই খেয়াল ছিল, আর কোনদিকে নয়। পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল লাল আলখেল্লা পরা লোকটা, তার গায়ের বাতাস এসে লাগল। কমিকের চরিত্রের মতই উড়ছিল আলখেল্লার ঝুল। তবে স্লাইম ম্যান বলা যাবে না তাকে কোনমতেই। বিচ্ছিরি লেগেছে আমার, তার ওভাবে গা ঘেঁষে যাওয়াটা।' নাক কুঁচকাল মিরিনা।

'ওর কোন কিছু চোখে পড়ার মত ছিল? মানে, খটকা লাগে ওরকম কিছু?'

'কি আর লাগবে? ওর পোশাকটাই তো অদ্ভুত,অবশ্য এই কনভেনশন রুমের বাইরে। এখানে কোন কিছুই অস্বাভাবকি নয়। নানা রকম বিচিত্র পোশাক পরে এসেছে মানুষ প্রতিযোগিতার জন্যে। ও-ও পরেছে। লাল আলখেল্লা। তাড়াহুড়া ছিল অনেক।'

'ভাব না ভাল করে। ছবিটা মনে গেঁথে নাও। কি কি করছিল মনে করার চেষ্টা কর।'

চোখ বন্ধ করল মিরিনা। 'আলখেল্লার ভেতরে হাত ঢুকিয়েছিল। কি যেন বের করেছিল।'

'হতে পারে,' মিরিনাকে মনে করায় সাহায্য করতে চাইল কিশোর, 'স্মোক বম্ব বের করছিল লোকটা।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান, মেয়েটার মুখের দিকে। 'আলখেল্লার নিচে কি পরেছিল মনে আছে? দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল মিরিনা। 'আসলে ওভাবে খেয়ালই করিনি। আমি তখন আমার চিন্তায়। কে কি করছে এত দেখার সময় ছিল নাকি। তাছাড়া কি করে জানব লোকটা বোমা বের করছে?'

'তা-ও তো বটে,' ভাবল কিশোর। বলল, 'বোমা ফাটার পর অনেক চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছে। এটাও কি খেয়াল করোনি?'

'সেটা তো করতেই হয়েছে। এত চিৎকার করলে কি আর কানে না ঢুকে যায়। তবে একবারই তাকিয়েছি। দেরি হওয়ার ভয়ে থাকতে পারিনি, তাড়াহুড়া করে চলে গেছি। ও, লাল আলখেল্লা পরা লোকটাকে ছুটে যেতে দেখেছি।'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'আরেকবার তোমার গা ঘেঁষে গেল?'

'না, দ্বিতীয়বার আর গা ঘেঁষে নয়। মনে হলো, লাল একটা ঝিলিক দেখলাম। ছুটে যাচ্ছে দরজার দিকে, বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'তুমি কোন দিকে যাচ্ছিলে?'

'কেন, দেখোনি? আর্টিস্টরা সব যেখানে বসে ছিল সেদিকে। ঘরের একধারে, ঢোকার দরজা থেকে দূরে। ওখানেই তো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'দরজার দিকেই যাচ্ছিল, তুমি শিওর?'

আবার শ্রাগ করল মিরিনা। 'শিওর হওয়ার কোন উপায় ছিল না। ধোঁয়া দেখলাম, লাল রঙের ঝিলিক দেখলাম, এর পর আর দেখিনি লোকটাকে।'

'প্রবেশ পথের কাছে কেউই তাকে দেখেনি,' কিশোর বলল। 'ওরকম লাল আলখেল্লা পরা একজন লোককে দেখেও মনে থাকবে না কারও, এটা হতে পারে না।' মিরিনার দিকে তাকাল সে। আরও কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবছে। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন এল না মাথায়। 'আপাতত আর কিছু মনে পড়ছে না। আমার প্রশ্ন শেষ।'

'এবার যেতে পারি?' হেসে জিজ্ঞেস করল মিরিনা। যেন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশিই হয়েছে।

'নিশ্চয়ই।' বলল কিশোর। মেয়েটা যেন কথা বলার জন্যে মুখিয়েই আছে। খটকা লাগল তার।

'তোমার ওই যে আমেরিকান বন্ধুটি,' অবশেষে বলেই ফেলল মেয়েটা, যেন এটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই কিশোরের এত প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। 'ও কি সোনালি চুল পছন্দ করে?'

ও, এই ব্যাপার! দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর হাসল। কিছু বলতে যাবে এই সময় ডাক শোনা গেল, 'মিরিনা, অ্যাই মিরিনা!'

'ওই যে, তোমার আম্মা ডাকছেন,' কিশোর বলল। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে চট করে গুঁজে দিল মিরিনার হাতে। 'আশা করি আবার দেখা হবে। পকেটে রেখে দাও। প্রয়োজন হতে পারে আমাদেরকে।'

হাসল মিরিনা। 'হয়তো।'

আলাদা হয়ে দু'জনে দু'দিকে এগোল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। কয়েক মিনিট পরেই এসে রবিন খামচে ধরল কিশোরের হাত। বলল, 'এডগার ডুফারকে পেয়েছি।'

'কি বলল?'

'বোরাম যা বলেছে। দু'জনে নাকি গোল্ড রুমের বাইরে তর্ক করছিল।'

'কি নিয়ে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ক্রিমসন ফ্যান্টমের লেটেস্ট বই নিয়ে। নতুন আর্টিস্ট জোগাড় করেছে বোরাম। ডুফার বলল, ওই আর্টিস্ট কোন কাজেরই না। ছায়া তৈরি করতে পারবে না।'

'ছায়া?'

'ক্রিমসন ফ্যান্টমকে সৃষ্টি করে সেটাকে ফোটানর জন্যে নানা রকম বিচিত্র আলোআঁধারি তৈরি করেছিল হুফার। এই যেমন, চরিত্রটার মাথায় কালো ছায়া। এমনিতেই মড়ার খুলির মত মুখোশ পরানো ওটার, তার ওপর ওই ছায়া একটা দুর্দান্ত আবহ তৈরি করে দিল। নতুন আর্টিস্টরা ওগুলো সব বাদ দিয়ে দিয়েছে । ডুফার বলছে, চরিত্রটার কোন কিছুই রাখেনি ওরা। সব কিছু উড়িয়ে-ফুড়িয়ে একেবারে জলো করে দিয়েছে।'

'ইনটারেসটিং,' কিশোর বলল। 'চোরের মুখোশটার কথা মনে আছে? মড়ার খুলির মত। তার ওপর হালকা কালো রঙ, যেন ছায়াই তৈরি করা হয়েছে। আশা করি ডুফার সেকথা স্বীকার করবে।'

'স্বীকার করবে মানে?'

'ফ্যান্টমের মাথায় কালো ছায়া যাদের পছন্দ, তাদেরই কেউ নিশ্চয় ওরকম মুখোশ পরবে,' কিশোর বলল। 'আরেকটা ব্যাপার, আলখেল্লা অনেক কিছু ঢেকে দেয়। ছদ্মবেশীদের জন্যে এটা এক মহা প্রয়োজনীয় পোশাক। ভেতরে কে আছে, বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে।' পেটে চাপড় দিল কিশোর। 'খিদে পেয়েছে। চলো, মুসাকে খুঁজে বের করি।'

'সীটের ব্যবস্থা হয়েই আছে,' জানাল রবিন। 'ডুফার আমাদেরকে তার টেবিলে খাওয়ার দাওয়াত করেছে।'

'তাই নাকি? তাহলে তো খুবই ভাল। মুসা গেল কোথায়?' ভিড়ের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। চোখে পড়ল নীল বোরামকে। আইজাক হুফারের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'তোমার মুখটা বড় বেশি পাজি, হুফার। আমার নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছ। কানে এসেছে আমার।'

'পাজি! তুমি আমাকে পাজি বলে গাল দিলে!' রেগে আগুন হয়ে গেল বদমেজাজী আর্টিস্ট। 'দাঁড়াও, আমিও ছাড়ব না। বক্তৃতা যখন দেব, তখন বুঝবে।'

'ঘোড়ার ডিম করবে!' জোরে এক ধাক্কা মারলেন হুফারকে বোরাম। ঘুসি মারার জন্যে হাত তুললেন।

ভিড়ের ওপর পড়ল হুফার। সামলে নিয়ে সোজা হলো। সে-ও ঘুসি তুলল।

ঘুসি চালালেন বোরাম। লাগাতে পারলেন না। রেঞ্জের বাইরে রয়েছে হুফার। হুফারও ঘুসি চালাল। সে-ও লাগাতে পারল না। বোঝা গেল, মারামারি করতে জানে না দু'জনের একজনও।

দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল একজন লোক।

ঘরের দরজায় পাহারারত সেই ষাঁড়ের মত সিকিউরিটি গার্ড। হুফারের কাঁধ চেপে ধরে টেনে সরাতে গেল তাকে. এই সময় আবার ঘুসি মেরে বসলেন বোরাম।

হুফারের চোয়ালে লাগল। রেগে গাল দিয়ে উঠল হুফার। কিন্তু গার্ড ধরে রেখেছে বলে কিছু করতে পারল না। একপাশ থেকে এসে বোরামকে ধরে ফেললেন মরগান।

বোরামের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচাচ্ছে আর গালাগাল করছে হুফার। টেনেটুনে দু'জনকেই মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। বসিয়ে দেয়া হলো সীটে। একজনের কাছ থেকে আরেকজনকে বহুদূরে, এমাথায় আর ওমাথায়। সম্মেলনে যোগ দিতে আসা অন্য সদস্যরাও বসে পড়তে লাগল চেয়ারে।

মুসাকে খুঁজে পেল রবিন আর কিশোর। কিশোর জিজ্ঞেস করল মুসাকে, 'হুফারের সম্পর্কে কি জানলে?'

'ডাকাতির সময় আর্টিস্টদের কোন টেবিলের কাছেই তাকে দেখা যায়নি,' মুসা বলল।

'সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! মেলাতে পারছি না! পোশাক প্রতিযোগিতায় এরকমই হয় নাকি?'

হাত ওল্টাল মুসা। 'কয়েকজন আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ওরা জানিয়েছে, ওখানে তখন ছিল না হুফার।'

'তাহলে হুফারকেও কিছু প্রশ্ন করা দরকার আমাদের,' পরামর্শ দিল রবিন।

'আগে খেয়ে নিই, চলো,' কিশোর বলল।

'চলো।'

টেবিলে বসে গেছে হুফার। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল। খাবারের চেহারা দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। সালাদটা তো সহ্য করা যায়, কিন্তু মুরগীর যা চেহারা—নিশ্চয় সেদ্ধ হয়নি ঠিকমত, রবার হয়ে আছে। আলুগুলোও পোড়া।

রবিনের কানে কানে বলল মুসা, 'কিছু বলো না। পয়সা তো আর দিতে হবে না আমাদের। মুফতে পেয়েছি। যা পেলাম খেয়ে নেয়া ভাল।'

খাওয়ার পরে হুফারের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিল তিন গোয়েন্দা, সেটা সম্ভব হলো না। দেখা গেল, ডিনার শেষের বক্তা হিসেবে তাকেই বেছে নেয়া হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল হুফার। 'আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে, সে জন্যে প্রথমেই মিস্টার মরগানকে ধন্যবাদ দিয়ে নিচ্ছি।' হাসল সে। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় আসার পর এই প্রথম আমাকে এতটা গুরুত্ব দিল কেউ।'

তার উদ্দেশে মৃদু হাসল শ্রোতারা।

'আমি জানি, কিছু লোকের ধারণা, আমি এখানে এসে কমিক তৈরি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।' মাথা নাড়ল হুফার। 'ভুল। তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। নতুন একটা হিরো তৈরির কাজে হাত দিয়েছি আমি। খুব তাড়াতাড়িই সেটাকে দেখতে পাবেন আপনারা।'

কেউ হাততালি দিয়ে, কেউবা কথা বলে তার এই কাজকে স্বাগত জানাল।

'কার হয়ে কাজ করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল একজন।

সেদিক ঘুরল হুফার। 'আমি আমার নিজের হয়ে ছাড়া আর কারও জন্যে কাজ

করি না। অন্তত এখন। এবার আমার কমিক আমি নিজেই পাবলিশ করব। এতে অনেক ঝামেলা হয় বটে, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর,' নীল বোরামের দিকে তাকাল সে। 'হাতছাড়া হওয়ার ভয়ও থাকে অনেক কম। ঠকিয়ে নেয়ার কেউ থাকে না তো।'

জ্বলন্ত চোখে আর্টিস্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সম্পাদক। তার চকচকে টাকের চামড়া লালচে হয়ে উঠেছে।

নিজে পাবলিশ করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল হুফার। বক্তৃতা শেষে উৎসাহী অনেক ভক্ত তুমুল করতালি আর চিৎকার-চেঁচামেচি করে আনন্দ প্রকাশ করল। জানাল, তার নতুন হিরোর আশায় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করবে তারা।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এক টেবিলে বসে মাথা দোলাল ডুফার। 'হুফার নতুন কমিক তৈরি করছে একথাটা আমার কানেও এসেছিল। যাক, সত্যিই করছে তাহলে। খুশি লাগছে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল সে। 'ভাবছি, পাবলিশ করার টাকা পেল কোথায়?'

'আমার বিশ্বাস,' কিশোর বলল। 'সেজন্যেই এখানে এসেছে সে। টাকা জোগাড়ের জন্যে।'

'অনেক টাকা দরকার। পাবলিশিং মুখের কথা নয়।'

'আইজাক হুফারের ব্যাপারে আরেকটা প্রশ্ন জমা হলো!' বিড়বিড় করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ডাকাতির সময়কার কোন অ্যালিবাই নেই হুফারের। এখন মনে হচ্ছে, ডাকাতি করার একটা উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে তার। মোটিভ? তা মোটিভটা হলো, টাকা।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। হাই তুলছে গোয়েন্দা সহকারী। 'কেমন লাগছে তোমার, বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। 'আপাতত হুফারের সঙ্গে কথা বলা বাদ দিয়ে ঘুমোতে যাই চলো।'

'তা-ই চলো,' রবিন বলল।

মুসা তো রাজি হয়েই আছে।

'আমিও চলে যাব এখুনি,' ডুফার বলল।

তাকে গুড নাইট জানিয়ে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

পথে একটা টেবিলে আবার দেখা হলো মিরিনার সঙ্গে। সাথে তার মা রয়েছেন এবং বরাবরকার মতই টেবিলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছেন।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল মিরিনা।

কিশোরের মনে হলো, হাসিটা বোধহয় রবিনের উদ্দেশেই। মনে মনে হাসল সে। রবিনকে বড় বেশি পছন্দ করে মেয়েরা।

তবে সেকথা মুহূর্তে ভুলে গেল কিশোর। তার মন জুড়ে রয়েছে কেসটার নানা প্রশ্ন, নানা রকম সমস্যা। বিছানায় শুয়েও ভাবতেই থাকল সে। ঘুম আসছে না। একটু পরেই কানে এল দুই সহকারীর নাক ডাকার শব্দ।

হোটেলের অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছে কিশোর। একসময় মনের পর্দায় ভেসে উঠল মিরিনা জরডানের মুখ। মনে হতে লাগল, মেয়েটা···মেয়েটা সত্যিই এসবে জড়িত নেই তো? থাকতেও পারে···

ভাবনায় ছেদ পড়ল তার। খুট করে একটা শব্দ হলো দরজায়।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর।

কে যেন দরজা খুলে ঢোকার চেষ্টা করছে!

আট

খুলে গেল দরজা।

একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল কিশোর। আবছা আলোয় লোকটাকে চিনতে পারার আগেই পেছনে লেগে গেল পাল্লা। ঘরে ঢুকেছে লোকটা।

বিছানার পাশের টেবিলের দিকে ঝটকা দিয়ে চলে গেল কিশোরের হাত, টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টেপার জন্যে। কিন্তু অপরিচিত ঘরে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিল। নাড়া লেগে উল্টে পড়ে গেল ল্যাম্পটা।

'কি! কি হয়েছে!' চিৎকার শুরু করল রবিন আর মুসা, জেগে গেছে।

ঘরে লোক ঢুকেছে, মুসা টের পেল প্রথমে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে ধরতে গেল ওকে। অন্ধকারে শুরু হয়ে গেল জাপটাজাপটি।

কিশোরও নেমে পড়েছে। ঘুসি মারতে গিয়েও সামলে নিল। সরিয়ে আনল হাত। কার গায়ে লাগবে ঠিক নেই। রবিন কিংবা মুসার গায়েও লাগতে পারে। দ্বিধায় পড়ে গেল সেজন্যে।

কিন্তু লোকটার সেই অসুবিধে নেই। যাকেই মারবে, যার গায়েই লাগবে, সে-ই শত্রু। কাজেই এলোপাতাড়ি মেরে চলল সে, আর মারতে লাগল গায়ের জোরে।

আগে বাড়তে গিয়ে পেটে লাথি খেল কিশোর। হুঁক করে উঠে চেপে ধরল পেট। প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁসফাঁস করতে লাগল।

পেট চেপে ধরেই দেয়ালের দিকে রওনা হলো। 'সুইচবোর্ডটা খুঁজে বের করতে হবে···'

গাঁক করে উঠল একটা কণ্ঠ। তার পরেই শোনা গেল রবিনের চিৎকার, 'পালাচ্ছে! ব্যাটা পালাচ্ছে!'

অন্ধকারে আরও কিছু বিচিত্র শব্দ শোনা গেল।

সুইচবোর্ডটায় হাত ঠেকল কিশোরের।

জ্বলে উঠল ছাতে ঝোলানো ঝাড়বাতি। আলোয় ভেসে গেল ঘর। দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা।

দরজার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা।

প্রথম মোড়টার কাছে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে রহস্যময় লোকটা। মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোড় পেরিয়ে এল ছেলেরাও। গেল কোথায় লোকটা? সামনে লম্বা বারান্দা, এত তাড়াতাড়ি দৌড়ে সেটা পেরোতে পারার কথা নয়।

'নিশ্চয় কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। কোমরের কাছটায় চেপে ধরে রেখেছে, লাথি খেয়েছে ওখানে।

মুসা দৌড়ে গেল 'একজিট' সাইন লেখা একটা দরজার কাছে। একটানে পাল্লা খুলতেই কানে এল দ্রুত পদশব্দ।

'ইমারজেন্সি সিঁড়ি দিয়ে নামছে ও!' চিৎকার করে বলল সে, 'জলদি এসো!'

দুপদাপ করে নামতে শুরু করল তিনজনে। পদভারে কাঁপছে লোহার সিঁড়ি। ওরা যে পিছু নিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয় লোকটার। বুঝুক। কি আর করা? নিঃশব্দে তো নামার উপায় নেই।

লোকটাকে যেভাবেই হোক, ধরতে চায় কিশোর। একটা বোঝাপড়া আছে। চোরাই কমিকগুলো উদ্ধারের ব্যাপারটা তো আছেই, এখন যোগ হয়ে হয়েছে পেটের লাথি। আপনা থেকেই হাত মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল ওর।

মাটির নিচে গ্যারেজের প্রবেশ মুখের কাছে শেষ হয়েছে সিঁড়ি।

প্রায় একযোগে এসে দরজার গায়ের প্যানিক বারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। বড় বড় থামের জন্যে ছাতের আলো ঠিকমত পৌঁছতে পারে না ওখানে। দরজার ওপরের বাল্বটাও ভাঙা। কাজেই অন্ধকারই বলা চলে জায়গাটাকে।

দৌড় দিল মুসা। কংক্রীটের মেঝেতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। কেয়ারই করল না সে। বাঁয়ে মোড় নিয়ে চিৎকার করে সঙ্গীদেরকে জানাল, 'এদিকে!'

সামনে ছুটছে মূর্তিটা। গতি বাড়িয়ে দিল মুসা। দেখতে দেখতে পেছনে ফেলে এল রবিন আর কিশোরকে।

লম্বা লম্বা পায়ে এগোল মুসা। লোকটার গায়ে গিয়ে পড়ার ইচ্ছে কিন্তু আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ঘুসি চালাল।

একটা থামের আড়ালে চলে গেল মুসা।

'মুসা!' থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'এই মুসা, ঠিক আছ তুমি?'

'আমার দম বন্ধ করে দিয়েছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে থামের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আরিব্বাপরে বাপ!'

সবার পেছনে ছিল কিশোর। মুসা অদৃশ্য হওয়ার পর রবিনকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখল। সাবধানে থাম ঘুরে এগোল সে। পাঁচ কদম এগোতেই জ্বলে উঠল গাড়ির হেডলাইট, চোখেমুখে পড়ে যেন অন্ধ করে দিল তাকে।

একটা মাত্র আলো, আরব্য রজনীর সিন্দাবাদের গল্পের একচোখো দানব সাইক্লপসের মত। আলোটার আকার দেখে অনুমান করল, ভ্যান জাতীয় গাড়ি।

একটা হেডলাইট কাজ না করলেও ইঞ্জিন ঠিকই কাজ করছে গাড়িটার। গ্যাস বাড়াতেই ভীষণ গর্জন করে খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল কিশোরের দিকে।

চিৎকার দিয়ে রবিন আর মুসাকে হুঁশিয়ার করেই পাশে লাফ দিল সে। থামের এপাশে বেরোতে গিয়ে হেডলাইট চোখে পড়ল, ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝেতে। টায়ারের তীক্ষ্ণ শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

লাফিয়ে উঠেই ওটার পেছনে দৌড় দিল কিশোর। ততক্ষণে একজিট র‍্যাম্পে

উঠে পড়েছে গাড়ি, দ্রুত ডানে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সে র‍্যাম্পের মাথায় উঠতে উঠতে যানবাহনের ভিড়ে ঢুকে গেল ওটা, হারিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

হতাশ ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল তার কাঁধ। অন্য দু'জন পৌঁছলে জিজ্ঞেস করল, 'লাইসেন্স প্লেট দেখেছ? নাম্বার?'

'ইয়ার্কি করছ নাকি!' মুসার জবাব।

রবিন বলল, 'দেখার জন্যে থেমে থাকলে এতক্ষণে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম, চাকার নিচে পড়ে।'

'আমিও দেখতে পারিনি,' কিশোর বলল। 'ড্রাইভারকেও না। তোমরা কিছু দেখেছ?'

'গাড়িটা গাঢ় রঙের ছিল,' রবিন বলল। 'যদ্দুর মনে হলো, ধূসর।'

'না, কালো,' মুসা বলল।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার কাছে লাগল কালচে সবুজ।'

'একটা হেডলাইট নষ্ট।'

মুসার এই কথাটায় একমত হল কিশোর। 'ঠিক। তার মানে একটা সাইক্লপস ভ্যান পাওয়া গেল সূত্র হিসেবে। এরকম গাড়ি লস অ্যাঞ্জেলেসে খুব বেশি নেই।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'খুঁজে বের করতে তেমন সমস্যা হবে না।'

'সেই সমস্যার কথা পরেও ভাবা যাবে,' রবিন বলল। 'উপস্থিত যে সমস্যা রয়েছে সেটার সমাধান করা দরকার আগে।'

কিশোর আর মুসা দু'জনেই তাকাল রবিনের দিকে। 'কি সমস্যা?'

'আমাদের ঘরের চাবি কেউ এনেছ? পাল্লা বন্ধ করলে তো আপনাআপনি তালা লেগে যায়।'

নিজের পরনের পাজামার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর মুসা আর রবিনের দিকে। একজন পরেছে দৌড়ের পোশাক, আরেকজন পাজামা। পকেট নেই। চাবি রাখার জায়গা নেই। 'হুঁম!' মাথা দোলাল সে, 'রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে গিয়ে আরেকটা চাবি চাইতে হবে আরকি। কিন্তু যা পোশাক পরে বেরিয়েছি! লোকে সত্যি সত্যি এবার থ্রী স্টুজেস ভাববে।'

সাইডওয়াকে উঠে পড়ল সে। 'চলো, যাই। রাতের হাওয়া মন্দ লাগবে না।'

একপাশে খাড়া হয়ে উঠেছে কংক্রিটের দেয়াল। কিছুদূর এগোতেই শেষ হয়ে এল, দেখা গেল সরু একটা প্রবেশ পথ, তার ওপাশে ছোট বাগান।

'এখান দিয়ে ঢুকে পড়া যাক,' প্রস্তাব দিল মুসা।

একটা রয়াল পাম গাছের কাছে আসতেই ছায়ার মধ্যে গুঙিয়ে উঠল কে যেন। মাটিতে পড়ে ছিল। উঠে বসল কোনমতে। পাতলা, রাগী চেহারা। চিনতে অসুবিধে হলো না। এডগার হুফার।

'কি হয়েছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঠোঁট ফুলে গেছে হুফারের। মুখের একপাশে কাটা দাগ। চোখের কোণে কালশিটে পড়ে গেছে। ভ্রূকুটি করে মুখ বাঁকাতে গেল সে, সাধারণত যা করে, উফ্ করে উঠল ঠোঁটে ব্যথা লাগতে।

'কি হয়েছে বলতে পারব না। ওই হট্টগোল ভাল্লাগছিল না, তাই বেরিয়ে

এসেছিলাম খোলা বাতাসে। কে জানি এসে পড়ল গায়ের ওপর।' উঠে দাঁড়াল হুফার। ব্যথার ভয়ে আস্তে আস্তে খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে। 'ভালমত পেটাল আমাকে সে। চেহারা দেখার সুযোগ পেলাম না। তবে কে, আন্দাজ করতে পেরেছি।'

'কে?' জানতে চাইল রবিন।

'কে আমাকে পেটাতে চেয়েছিল? ঘুসি মেরেছিল হলঘরে?' হোটেলে ঢোকার গেটের দিকে পা বাড়াল হুফার। 'নীল বোরাম।'

ভেতরে ঢুকল হুফার। পেছনে তিন গোয়েন্দা । ছেলেদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে আর্টিস্ট, ওদের পোশাক অবাক করেছে তাকে।

রিসিপশন ডেস্কের দিকে ঘুরতে গেল রবিন। মাথা নেড়ে তাকে মানা করল কিশোর, 'আপাতত চাবির কথা ভুলে যাও।'

হুফারকে অনুসরণ করে লবি ধরে চলল ওরা। নজর সামনের দিকে। আশেপাশে কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মুখ টিপে হাসছে লোকে, টিটকারি দিচ্ছে, মন্তব্য করছে ওদের উদ্দেশে। এলিভেটরের কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

চারজনেই এলিভেটরে উঠলে তিন নম্বর লেখা বোতামটা টিপল হুফার।

'সম্মেলনের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই হচ্ছে দোতলার ঘরগুলোতে,' হুফার বলল। আরও ওপরে উঠছে কেন, সেটা জানাল সে, 'নীল বোরামের ঘরের নম্বর তিনশো পঁয়তিরিশ। শুনে ফেলেছি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন এখন আমার।' মুঠো হয়ে গেল তার আঙুল।

এলিভেটর থেকে নেমে বারান্দা ধরে এগোল সে। পেছনে ছায়ার মত লেগে রইল তিন গোয়েন্দা।

৩৩৫ নম্বর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাবা দিল হুফার।

ভেতর থেকে সাড়া দিলেন বোরাম। দরজা খুললেন। টাইয়ের নট ঢিলা করা। সুট এখনও পরাই রয়েছে।

সোজা কলার চেপে ধরল হুফার। ঝাঁকাতে শুরু করল। চিৎকার করে বলল, 'ভেবেছ পার পেয়ে যাবে! সেটি হচ্ছে না!'-

'আরি, হুফার, করো কি! করো কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন বোরাম।

ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল। দু'জনকে ছাড়ানর চেষ্টা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দৌড়ে এলেন লুই মরগান। পেছনে কয়েকজন লোক, কমিকের কোন না কোন কাজ করে সবাই, হাতে গেলাস।

'কি করি!' ব্যাঙ্গ ঝরল হুফারের কণ্ঠে। 'এখনই বুঝবে! তোমার চেহারাটাকে আরেক রকম করে না দিয়েছি তো আমার নাম হুফার নয়। আমারটাকে যেমন করেছ!'

'কি···কি বলছ তুমি···কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' গলায় চাপ, দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে বোরাম, কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

'ন্যাকা! বুঝতে পারছ না!' মুখ ভেঙচাল হুফার। 'আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছিলে কেন? মারলে কেন?'

বোরাম কিছু বলার আগেই মরগান জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন মারল?'

'এই তো কয়েক মিনিট আগে! ওকেই জিজ্ঞেস করুন না!'

মাথা নাড়তে লাগলেন মরগান। 'কি করে গেল? ওর ঘরে আমরা এসেছি বেশ কিছুক্ষণ হলো। বেরোয়নি। আমাদের দাওয়াত করে এনেছে।'

'পার্টি চলেছে,' কিশোর মুখ খুলল এবার, 'কাজেই সবার চোখ এড়িয়ে চট করে বাইরে থেকে ঘুরে আসাটা অসম্ভব নয়।'

'হয়তো।' জোর দিয়ে বললেন মরগান, 'কিন্তু গত আধ ঘণ্টায় যে বেরোয়নি এটা আমি বলতে পারি।' ঘরের মাঝখানের বড় একটা কাউচ দেখিয়ে বললেন, 'ও আর আমি ওখানে বসে ছিলাম এতক্ষণ। কথা বলছিলাম।'

সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন তিনি। 'বাইরে বেরোলে আমার চোখ এড়িয়ে কিছুতেই যেতে পারত না।'

নয়

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল কিশোর। ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে তখনও রবিন আর মুসার, ঘুমোচ্ছে। শব্দ করল না সে, ওদের ঘুম ভাঙাল না। ব্যাগ থেকে সাঁতারের স্যুটের একটা পাজামা বের করে পরল। গায়ে দিল একটা ঢোলা শার্ট। চাবি নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে।

পুলের কিনারে যাওয়ার জন্যে বেরোচ্ছে। তার ধারণা, ওখানে এই কেসটা নিয়ে ভাবলে জবাব মিলবে তাড়াতাড়ি। মগজটা ভালমত কাজ করবে ওখানে গেলে।

পুলের পানিতে নেমে পড়বে। চুপ করে ভাসতে ভাসতে মনটাকে ছেড়ে দেবে বল্গাহীন ভাবে—যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াক। জট ছাড়াক রহস্যগুলোর। আজব এক জটিলতার মধ্যে পড়েছে। এক পা এগোলে দু'পা পিছিয়ে আসতে হচ্ছে।

যেমন ধরা যাক আইজাক হুফারের কথা। লোকটাকে কাছে থেকে দেখলে তার সম্পর্কে অন্য একটা ধারণা হয়ে যায়। ওর 'রাগী রাগী' ভাবটা আর ততখানি থাকে না। রাগী, সন্দেহ নেই, তবে হাস্যকর একটা ব্যাপারও রয়েছে ওর মাঝে, কিছুটা ভাঁড়ামি। ওকে চোর হিসেবে কিছুতেই ভাবতে পারছে না কিশোর।

শুধু তা-ই নয়, রাতে ওদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে, এটাও মানতে পারছে না। একটা ব্যাপার আলোচনা করে তিনজনেই একমত হয়েছে, যতটা জাপটাজাপটি ওরা করেছে ধরার জন্যে, তাতে আর যা-ই হোক, হুফারের চেহারার ওই পরিবর্তন হতে পারে না, ওভাবে মারেইনি ওরা। তাহলে ওসব দাগ কার কাছ থেকে সংগ্রহ করল হুফার?

সন্দেহ অন্য দিকে ঘোরানর জন্যে নিজেই নিজেকে পেটায়নি তো? নাহ্। ভ্যানে করে লোকটা পালিয়ে যাওয়া আর তিন গোয়েন্দার ওকে দেখে ফেলার মাঝে এতটা সময় পায়নি সে যে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারবে।

আরেকটা কাজ করতে পারে। গাড়ির গায়ে ঠুকে ঠুকে মুখে দাগ করে ফেলে তারপর গাড়িটাকে কোথাও রেখে দিয়ে চলে আসা। ভাবতে গিয়ে এতটাই

হাস্যকর মনে হলো কিশোরের, হেসেই ফেলল। উঁহু, এই যুক্তি ধোপে টেকে না। ওরকম কাণ্ড আর যে-ই করতে পেরে থাকুক, হুফার পারবে না। ওরকম লোকই নয় সে।

বেশ। তা যদি না হয় তাহলে কে পেটাল তাকে? কেন? কমিক চুরির সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? ডাকাতির ব্যাপারে এখনও সন্দেহের বাইরে নয় সে। কিন্তু যেহেতু পিটুনি খেয়েছে, আরও কেউ যে এসবে জড়িত রয়েছে, এটা স্পষ্ট। আরেকটা নতুন রহস্য এসে যোগ হল আগের রহস্যগুলোর সাথে।

এলিভেটরে করে নিচে নেমে এল কিশোর। লবি পেরোতে যাবে, এই সময় নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল তাড়াহুড়া করে আসছেন লুই মরগান।

'এত সকালে উঠলে,' বললেন কনভেনশন চীফ।

'আপনিও তো উঠেছেন। কাল রাতে পার্টির পর ঘুমোতে নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে।'

'বাধ্য হয়েই উঠতে হয়েছে,' হাসলেন মরগান। 'সম্মেলনের কাজ। অনেক ঝামেলা। কত রকম গোলমাল হতে পারে। আগেই সেগুলো বুঝে নিয়ে সাবধান থাকা দরকার। পারলে মিটিয়ে ফেলা দরকার, যাতে না হয়। ভাগ্যটা বরং ভালই মনে হচ্ছে। কিছুটা তো ঘুমিয়ে নিতে পেরেছি। গোল্ড রুমে গিয়ে দেখ, লাল লাল চোখ হয়ে আছে কতজনার। বিশ ঘণ্টা ধরে শুধু তাকিয়েই রয়েছে, রক অ্যাসটারয়েডের দিকে। সম্মেলন করতে এলে ঘুম-নিদ্রা সব বাড়িতে রেখে আসতে হয়।'

তবে, মরগানকে দেখে মনে হলো না ঘুমের বিশেষ অসুবিধে হয়েছে। ভালই বিশ্রাম নিয়েছেন। নতুন ধোয়া জিনস পরনে, গায়ে নতুন ইনটারকমিকন টি-শার্ট। বগলে চেপে রেখেছেন একটা ক্লিপবোর্ড। চকচকে চোখ। কাজ করার জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছেন।

নিজের চেহারা না দেখেও আন্দাজ করতে পারছে কিশোর, তার মুখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে আছে।

'তোমার কেসের খবর কি?' জিজ্ঞেস করলেন মরগান, 'তদন্ত কতটা এগোল?'

'করছি। নতুন নতুন সব ব্যাপার বেরিয়ে আসছে, অবাক করার মত। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, হুফারকে সন্দেহ করছি আমরা। বিশেষ করে তার অ্যালিবাইটাকে আপনি যখন ফুটো করে দিলেন। কিন্তু একটা কথা, সে যদি চোরই হবে, তার ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করতে গেল কে, কেন? তাকে মারলই বা কেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মরগান। কৌতূহলী মনে হচ্ছে। 'তোমার কি মনে হয়?'

'এখনও কিছু ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হঠাৎ করেই কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে হুফারের জীবনটাকে হেল করে দেয়ার জন্যে। কোন একটা ঘাপলা কোথাও নিশ্চয় আছে, যেটা এখনও ধরা পড়েনি আমাদের চোখে। অবস্থা দেখে তো মনে হয় হুফার শিকারি নয়, শিকার।'

ঘড়ি দেখলেন মরগান। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা-ই হোক, তোমার সঙ্গে আমিও

একমত।' রওনা হয়ে গেলেন তিনি। এক পা গিয়েই ঘুরে তাকালেন। 'আমার মনে হয়, হুফারকে নিয়ে যা ঘটছে তার অন্য ব্যাখ্যা আছে।'

'যেমন?'

'সেই যে পুরানো প্রবাদঃ চোরের সঙ্গে থাকতে থাকতে চোরই হয়ে যায়।'

এই শেষ কথাগুলো নাড়িয়ে দিল কিশোরকে। পুলের কাছে পৌছল চিন্তা করতে করতে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

পানি তার খুব ভাল লাগে। এর একটা কারণ, পানিতে নাক ডুবিয়ে চুপচাপ ভেসে থেকে কিংবা চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে সাঁতরানো যায়, আর এই সময়ে মগজটাকে খাটানো যায় পুরোদমে। জটিল সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়, কারণ ভাবনায় একাগ্রতা আসে।

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে শান্ত হলো কিশোর। চুপ করে নাক ডুবিয়ে ভাসতে লাগল। চালু হয়ে গেছে মগজ। ভাবছে। কেউ হামলা করেছিল হুফারকে। তার ঘরে মুসাকেও আক্রমণ করেছিল একটা লোক। তারপর গত রাতে তিনজনকেই এলোপাতাড়ি পিটিয়েছে কেউ। তিনটে ঘটনাই কি একই লোকের কাজ? সেই লাল আলখেল্লা পরা লোকটা করেছে এসব, যে কমিকগুলো ছিনতাই করেছে?

মুখোশের জন্যে লোকটার মুখ দেখতে পারেনি মুসা, তবে শরীরের অনেকটাই দেখেছে। পেশীবহুল শরীর লোকটার। ডাকাতির ব্যাপারে যাদেরকে সন্দেহ করা যায়, তাদের সঙ্গে এই লোকটার শরীরের মিল নেই। হুফার লম্বা, পাতলা; ডুফার মোটা, বোরাম ভুঁড়িওয়ালা। আর মিরিনা জরডানকে তো মেলানোই যায় না কোনমতে।

কাজেই চোরটা এমন কেউ, যাকে ওরা চেনেই না, কিংবা ওই ডাকাতির সঙ্গে একাধিক লোক জড়িত। জটগুলো ছাড়ানর চেষ্টা করছে কিশোর, এই সময় পেছনে ঝপাং করে শব্দ হলো। ডাইভ দিয়ে পড়েছে কেউ।

মাথা তুলল মেয়েটা। পরনে লাল সাঁতারের পোশাক। খাট বাদামী চুল মাথা এবং গালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সাঁতরাতে শুরু করল সে। পিছু নিল কিশোর।

সে যখন পুলের প্রান্তে পৌছল, মেয়েটা তখন ফিরে সাঁতরাতে শুরু করেছে আরেক প্রান্তের দিকে।

যাবে নাকি আবার? ভাবল কিশোর। যাওয়াই ঠিক করল। জোরে জোরে সাঁতরে চলে এল মেয়েটার পাশাপাশি। ভাল করে দেখার জন্যে মুখের দিকে তাকাল। বেশ সুন্দরী। রোদে পোড়া চামড়া। তার দিকে একবার তাকিয়েই গতি বাড়িয়ে দিল মেয়েটা।

প্রতিযোগিতা করতে চাইছে মনে হলো। লেগে গেল কিশোর কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই বুঝে গেল পারবে না মেয়েটার সঙ্গে। অনেক আগেই আরেক প্রান্তে চলে গেল মেয়েটা, ঘুরে আবার আসতে শুরু করল। প্রায় মাঝপথে কিশোরকে পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল।

আর চেষ্টা করল না কিশোর। লাভ নেই। পারবে না। অহেতুক পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া ক্লান্ত হলে মগজও ঠিকমত কাজ করতে

চায় না। ভেসে থেকে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে।

পানি থেকে উঠে পড়ল মেয়েটা। চুলে আঙুল চালিয়ে পানি ঝরাল, তারপর গিয়ে বসল একটা লাউঞ্জ চেয়ারে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে লাগল। কয়েক ডলা দিয়ে তোয়ালেটা রেখে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। আরাম হচ্ছে না বোধহয়। আবার উঠে চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে রোদের দিকে মুখ করে বসল।

চেয়ারের হেলানে ঝোলানো ছিল ব্যাগটা। নাড়া লেগে মাটিতে পড়ে গেল। মুখ খুলে ছড়িয়ে পড়ল ভেতরের জিনিস। লক্ষ্যই করল না মেয়েটা। সে রোদ নিয়ে ব্যস্ত। কিভাবে ঠিকমত গায়ে লাগে সেটা দেখছে।

কিশোর তাকিয়ে রয়েছে ব্যাগ থেকে বেরোনো জিনিসগুলোর দিকে। কমিকের বই। অনেকগুলো।

খুবই অবাক হয়েছে সে। কি করবে ঠিক করতে পারল না একটা মুহূর্ত। ডুব দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে নিল যেন। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল তীরের দিকে। পানি থেকেই দেখতে পেল কমিকগুলোর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড। না না, একটা নয়, আরও আছে! আশ্চর্য! ওদের কমিকের বই আর কার্ডগুলো তো থাকার কথা হোটেলের ঘরে, একটাও তো বিক্রি করেনি এখনও। তাহলে মেয়েটা পেল কোথায়?

এর একটাই মানে হতে পারে। এই কমিক ওদের ঘরেরগুলো নয়। ম্যাড ডিকসনের স্টল থেকে যেগুলো ছিনতাই হয়েছে সেগুলো। বাক্সে অনেক কার্ড ছিল। কিছু ঢুকে গিয়েছিল হয়তো বইগুলোর মাঝে।

কিন্তু মেয়েটার কাছে এই জিনিস এল কোথা থেকে?

দশ

ভূতে তাড়া করেছে যেন, এমন তাড়াহুড়ো করে পানি থেকে উঠে এল কিশোর। তার কাণ্ড দেখে অবাক হলো মেয়েটা। পিঠ সোজা করে বসে তাকিয়ে রইল।

পানিতে নড়াচড়া করছিল বলে ততটা ভাল করে মেয়েটাকে দেখতে পারেনি কিশোর। এবার দেখল। বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। রোদে শুকানোর পর চুলের রঙও আরেক রকম হয়ে গেছে। বাদামী নেই আর এখন, সোনালি।

'মিরিনা!' বলে উঠল কিশোর, 'তুমি এখানে কি করছ?'

চারপাশে তাকাল মিরিনা। অপরাধী অপরাধী একটা ভাব। অনুনয়ের সুরে বলল, 'বলো না, প্লীজ। আমি ভেবেছিলাম কেউ দেখতে পাবে না...'

চেয়ারের পায়ের কাছে পড়ে থাকা কমিকগুলোর দিকে তাকাল আবার কিশোর। 'কেন বলব না?'

ওর হাত চেপে ধরল মিরিনা। 'প্লীজ! জানলে আম্মা আমাকে খুন করে ফেলবে!'

এটা আশা করেনি কিশোর। চুপ করে রইল।

আবার বলল মিরিনা, 'এত সকালে কেউ আসবে এখানে কল্পনাও করিনি।

কাজেই ভাবলাম, এই সুযোগে চট করে একবার সাঁতারটা দিয়েই আসি। আম্মা জানতে পারলে...'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। 'কিসের কথা বলছ?'

'ওর সোনালি পরচুলাটার কথা। বিচ্ছিরি জিনিস! খোলার সুযোগ পেলেই খুলে রাখি। ওই ফালতু জিনিস কে মাথায় দিয়ে বেড়ায়! ভাবলাম, এভাবে কেউ চিনতে পারবে না আমাকে। ভুল করেছি।'

আরও সোজা হয়ে বসতে গিয়ে চেয়ারের একেবারে কিনারে চলে এল সে। 'তুমি ডুবে ছিলে, তাই পানিতে নামার আগে দেখতেই পাইনি তোমাকে। আশা করি, কাউকে কিছু বলবে না, আমাকে বকা শোনাবে না। কি আর করব! কপালটাই খারাপ! পড়লাম তো পড়লাম, একেবারে গোয়েন্দার সামনে!'

মুখ তুলে তাকাল মিরিনা। কিশোরের চোখে চোখ। দৃষ্টিতে অনুনয়। 'আম্মা যদি শোনে, আমি এই কাণ্ড করেছি, ভীষণ রেগে যাবে। স্টেলারা স্টারগার্লের মডেল হওয়া আর কোন দিনই হবে না হয়তো আমার। আম্মা সাহায্য না করলে...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'শোনো, আমি এসেছি জিজ্ঞেস করতে, এগুলোর ব্যাপারে।'

মাটি থেকে ব্যাগ আর কমিকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মিরিনার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

'এগুলো...!' বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মিরিনা, 'এগুলো এখানে এল কিভাবে!'

'আমিও সেটাই জানতে চাই,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর।

'ওগুলো আমার নয়!' আজব কমিকগুলো দেখে প্রথমে অবাক হলো মিরিনা। কার্ডগুলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এই ভেবে যে কমিকের মালিকের নাম লেখা রয়েছে। তারপর রেগে গেল যখন দেখল কার্ডে কিশোরের নাম লেখা রয়েছে। 'এগুলো তো তোমাদের! তোমাদের কার্ড এর মধ্যে গুঁজে দিয়েছে! আমাকে ভয় দেখালে কেন...!'

থেমে গেল আচমকা। গোল গোল হয়ে গেল চোখ। 'সর্বনাশ! শুনেছি তোমাদের কমিকও চুরি হয়েছে! এগুলো নয় তো?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এটা যদি অভিনয় হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে মিরিনার অসকার পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে এতটা বাস্তব অভিনয় করতে পেরেছে বলে মনে হলো না তার। সত্যি কথাই বলছে মেয়েটা।

'হ্যাঁ, এগুলোই আমাদের চুরি যাওয়া কমিক,' কিশোর বলল। 'তিনশো ডলার দাম উঠে গেছে। তোমার ব্যাগে এল কি করে?'

হেলান দিল মিরিনা। বিস্ময় রয়ে গেছে চোখে। কোলের ওপর রাখা হাতের আঙুল মুঠো হয়ে গেছে। বলল, 'আমি জানি না।' জোর নেই গলায়।

কি বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছে মিরিনা। এখন আর কেবল মায়ের বকা শুনেই পার পাবে না, আরও দুর্গতি আছে কপালে। সে চোর, এটা জানাজানি হলে ক্যারিয়ার শেষ। মডেলিঙের এখানেই ইতি।

আবার মুখ তুলে তাকাল মিরিনা। বিধ্বস্ত চেহারা। মেকআপ নেই বলেই যে ওরকম লাগছে, তা নয়।

'এটা তোমার ব্যাগ, তাই না?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চিরুনি বের করল মিরিনা। চুলে চালাতে চালাতে বলল, 'ব্যাগটা আমার, স্বীকার করছি। তবে ভেতরের জিনিসগুলোর খবর জানি না। কসম খেয়ে বলছি, কমিকগুলো আমি ঢোকাইনি।'

'আজ সকালে কারও সাথে দেখা হয়েছিল, এখানে আসার আগে? কিংবা ব্যাগটা কোথাও রেখে গিয়েছিলে?'

মাথা নাড়ল মিরিনা। 'না। দেখা যাতে না হয় সেটাই চাইছিলাম। সাবধান ছিলাম। আমি চাইনি কেউ আমাকে চিনে ফেলুক। ঘর থেকে বেরোনোর পর সারাক্ষণই আমার সঙ্গে ছিল ওটা।' একটু থেমে বলল, 'একটা সময় বাদে। যখন আমি পানিতে ছিলাম।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। যে কেউ চুরি করে কমিকগুলো মিরিনার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে পারে। এটা এমন কোন কঠিন কাজ না। যেন দেখতে পাবে লোকটাকে, এমন ভঙ্গিতে পুলের চারপাশে নজর বোলাল সে। কেউ নেই। এমনকি লাইফগার্ডও না।

পানিতে মিরিনার তো বটেই, কিশোরেরও নজর ছিল না এদিকে। সে-ও ওর সঙ্গে সাঁতরাচ্ছিল। ওই সুযোগে যে কেউ এসে ওগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে যেতে পারে ওদের অলক্ষ্যে, এতটাই মগ্ন হয়ে ছিল ওরা। হয়ত তা-ই করেছে লোকটা।

মিরিনার কথায় চমক ভাঙল কিশোরের, 'তুমি নিশ্চয় এগুলো ফেরত চাও।' কমিকগুলো কিশোরের দিকে তুলে ধরল মেয়েটা। 'জিনিসগুলো তোমার। কিন্তু আমার ব্যাগে রাখল কে?'

'বিস্মিত ভাবটা কেটে গিয়ে হাসি ফুটল মিরিনার মুখে। 'ওই পচা স্পাই স্টোরিগুলোর মত ঘটনা। যাকে ফাঁসাতে চায় তার অজান্তে শত্রুপক্ষের লোক এসে বেআইনী জিনিস ঢুকিয়ে রেখে যায়। পুলিশ এসে ধরে তখন লোকটাকে, এবং ভুলটা করে।'

মিরিনার তোয়ালেটা চেয়ে নিল কিশোর। গা মুছতে লাগল। ভাবছে, আসলেই কি এই ব্যাপার ঘটেছে? মিরিনাকে ফাঁসানর জন্যেই একাজ করেছে কেউ?

কমিকগুলো হাতে নিয়ে এক এক করে দেখতে লাগল সে। 'হুঁ, এগুলোই চুরি হয়েছিল। হতে পারে, অন্যের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে এগুলো সরিয়ে দিতে চেয়েছে চোরটা। হয়তো তার কাজে লাগবে না, কিংবা বিক্রি করার সাহস করতে পারেনি। কিন্তু সরানর জন্যে তোমাকে বেছে নিল কেন?'

জবাব দিতে পারল না মিরিনা।

হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। মিরিনার মা! সাংঘাতিক চালাক মহিলা। বিজ্ঞাপনের জাদুকর বলা চলে। বর্ন পাবলিসিটি হাউস। মিরিনার কাছে চোরাই কমিক পাওয়া গেছে, মেয়ের জন্যে এর চেয়ে বড় বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে?

সেটা করার জন্যেই হয়তো কমিকগুলো চুরি করেছেন মিসেস জরডান।

নিজেও করে থাকতে পারেন।

মিরিনার দিকে তাকাল কিশোর। ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। নিষ্পাপ চাহনী। নাহ্, ওই মেয়ে একাজ করেনি। যা বলছে সত্যিই বলছে। মিরিনা আর লাল আলখেল্লাকে একসাথে দেখেছে ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে। মিসেস জরডান কি ছিলেন তখন ওখানে? থাকলেও হয়ত মেয়ের অলক্ষ্যে। তাঁর পরিকল্পনার কথা কিছুই জানাননি মেয়েকে।

আরেকটা প্রশ্ন করতে যাবে কিশোর মিরিনাকে, এই সময় পেছনে হিসিয়ে উঠল রাগী কণ্ঠ, 'ও, তাহলে এখানে এসে বসে আছ!'

ঘুরে তাকাল কিশোর। জ্বলন্ত চোখে মিরিনার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মিসেস জরডান।

'এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার মানেটা কি?' কড়া গলায় আবার শুধালেন মিসেস জরডান। 'আমি ওদিকে সারা হোটেল খুঁজে মরছি। কি করছ এখানে? এই পোশাকে, একটা সো-কলড ডিটেকটিভের সাথে?'

নিজের জিনিসপত্র তুলে নিতে লাগল মিরিনা। এই সময়টায় তার মায়ের অগ্নিদৃষ্টি সহ্য করতে হল কিশোরকে। ইতিমধ্যে একবার মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বলল মিরিনা, 'সরি, আম্মা, ভুল হয়ে গেছে···'

'হয়েছে!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন মা, 'জলদি যাও!' নিজের মাথার হ্যাট খুলে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পর এটা! কেউ দেখে ফেলার আগেই। সানগ্লাস পর। ইস্সি রে, কেউ দেখেই ফেলল কি-না···'

মেয়ের হাত চেপে ধরলেন মিসেস জরডান। টান দিলেন হাঁটার জন্যে। 'মিরা, কি যে করিস, কিছু বুঝি না! ভূত চাপে নাকি তোর মাথায়! এত করে বললাম, টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছি আজ। বুঝেসমঝে চলবি। সকালে উঠেই তৈরি হবি। তা না করে চলে এসেছিস এখানে! জানিস না, এভাবে ভিজিয়ে উঠে রোদে শুকালে চামড়ার সর্বনাশ হয়ে যায়? কত আর শেখাব! বিরক্ত হয়ে গেছি!'

চরকির মত পাক খেয়ে হঠাৎ কিশোরের দিকে ঘুরলেন মহিলা। 'ইয়াং ম্যান, আমি আশা করব, আমার মেয়ে সম্পর্কে যেন কোন গুজব ছড়ানো না হয়। ওর ভাল হোক, এটাই তোমার চাওয়া উচিত। একটা কথা বিশেষ ভাবে বলে দিচ্ছি, সে রকম কিছু যদি ঘটে, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার। আমি তোমাকে ছাড়ব না। মনে রেখো কথাটা।'

মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা। মরমে মরে যাচ্ছে যেন। আবার তার হাত ধরে টানলেন মিসেস জরডান। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মিরিনা। অসহায়ের হাসি।

জোরে জোরে হাঁটছেন মিসেস জরডান। তাঁর পোশাকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। পোশাকের ঝুলটুল সব মিলিয়ে বিচিত্রই লাগছে। আলখেল্লার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। ওপরের পোশাকের নিচে আরেকটা পোশাক রয়েছে মহিলার২। আলখেল্লার মত অনেকটা।

সেদিকে তাকিয়ে কিশোর ভাবছে, লাল আলখেল্লা পরে যে এসেছিল স্টলের

কাছে, তাকে পুরুষ হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

এগারো

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কিশোর। মুসা আর রবিনের ঘুম তখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। শব্দ শুনে দু'জনেই চোখ মেলে তাকাল। কিশোরের হাতের কমিকগুলো দেখে পুরো সজাগ হয়ে গেল।

'খাইছে!' বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল মুসা, 'কোথায় পেলে?'

'পানির কাছে।' খুলে বলতে যাচ্ছিল কিশোর, তার আগেই ফোন বাজল।

'জ্বালাল!' গিয়ে রিসিভার তুলল মুসা। কানে ঠেকিয়ে শুনে ভুরু উঁচু হয়ে গেল। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আব্বা।'

উঠে এসে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল রবিন। 'বাবা, কি ব্যাপার···ও, তাই নাকি?···আচ্ছা, দেখি···' রিসিভার নামিয়ে রেখে বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার বার্টলেট লজ। ভ্যান নুইজে একটা ব্যাণ্ড পার্টি হবে, একটা ক্যাসেট পাঠাবেন, সে-জন্যেই বাড়িতে ফোন করেছিলেন আমাকে। যেতে হবে।'

'দিয়ে আসতে হবে নাকি আমাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'যদি দয়া করো,' হেসে বলল রবিন।

'আমিও আসছি তোমাদের সঙ্গে,' কিশোর বলল। 'যেতে যেতে বলব সব।'

'আচ্ছা।' আবার রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল রবিন। মিস্টার লজকে ফোন করে বলল, এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছে সে।

কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোল তিনজনে। নিচে নামার জন্যে রওনা হলো এলিভেটরের দিকে। ৩১৪ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন লোক। শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল। হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বড় বাক্স। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে ভেতরে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, চলি। নিচে নিয়ে যাচ্ছি এগুলো।'

লোকটা ওদের পেছনে পড়ে গেল। এলিভেটর এল। উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ডেকে বলল লোকটা, 'অ্যাই, দাঁড়াও, চলে যেও না।'

'ওপেন' লেখা বোতামটা টিপে দিল মুসা।

ভেতরে ঢুকল লোকটা। 'থ্যাংকস। এই জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বাপরে বাপ, পাথর!'

বাক্সটা পিছলে গেল। খসে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল কিশোর। এই সুযোগে ভেতরে তাকানোর সুযোগ হয়ে গেল। ভিডিও টেপে বোঝাই।

আরেকবার ধন্যবাদ দিল লোকটা। জিজ্ঞেস করল, 'লবিটা একটু টিপবে, প্লীজ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। টিপে দিল বোতামটা।

লবিতে এলিভেটর থামতেই আর যাতে পিছলাতে না পারে এমন ভাবে বাক্সটা শক্ত করে ধরে বেরিয়ে গেল লোকটা। তিন গোয়েন্দা রয়ে গেল। আণ্ডারগ্রাউণ্ড

গ্যারেজে নামবে ওরা।

বেলা বেশি হয়নি। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় কম। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে এল ওরা রকি বীচে বার্টলেট লজের অফিসে। বাড়িতেই অফিস করেছেন তিনি। ওরা থামতে না থামতেই ভেতর থেকে বিরিয়ে এলেন ট্যালেন্ট এজেন্ট, পরনে ফুটবল খেলোয়াড়ের জারসি, চোখে সানগ্লাস। ব্যায়াম করতে যাচ্ছিলেন। রবিনকে দেখে বললেন, 'এসেছ। এক মিনিট। আসছি।' আবার ভেতরে চলে গেলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে। সেটা রবিনের হাতে দিয়ে বললেন, 'ঘুম থেকে জাগিয়েছে আমাকে ক্লাবের মালিক। এটা চায়। দিয়ে আসতে পারবে?' হাই তুললেন তিনি। 'বলো, সারা রাতে কাজ করে এত সকালে ওঠা যায়? ব্যবসাটাই নিশাচরদের।'

যেন তাঁর হাইয়ের জবাবেই হাই তুলল মুসা। রবিনও। দেখে হেসে ফেললেন তিনি। 'বাহ্, তোমাদেরও দেখি একই অবস্থা! জেগে ছিলে নাকি সারারাত?' জবাবের অপেক্ষা না করেই রবিনকে বললেন, 'প্যাকেটের গায়ে ঠিকানা আছে। যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। কিছু মনে করো না। আর কাউকে...'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'না না, ঠিক আছে।'

প্যাকেটে গানের টেপ রয়েছে, ক্লাবের মালিকের দরকার। পৌঁছে দিতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের। স্যান ডিয়েগো ফ্রিওয়ে ধরে আবার লজ অ্যাঞ্জেলেসে ফেরার সময় ট্র্যাফিকের ভিড় দেখতে পেল।

ফ্রিওয়ে থেকে সরে এল মুসা। বিকল্প রাস্তা হিসেবে বেছে নিল সেপুলভেডো বুলভারকে। সান্তা মনিকার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আবার রাস্তা বদল করে পিকো ধরে চলল সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রবিন, 'যাচ্ছ নাকি কোথাও?'

'এলামই যখন,' জবাব দিল মুসা। 'আরেকবার ম্যাড ডিকসনের দোকানটা ঘুরে যেতে চাই। কাল রাতের একটা ব্যাপার খচখচ করছে মনের মধ্যে।'

পুরানো একটা সবুজ ভ্যানের কাছে এসে গাড়ি রাখল সে। সেই গাড়িটাই, আগের দিন যেটাতে করে কমিক নিয়ে গিয়েছিলেন ডিকসন।

'কাল রাতে একটা ভ্যান আরেকটু হলেই চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাদেরকে, নিজেকেই যেন বলছে মুসা। 'আমার কাছে তখন অন্য রকম রঙ লেগেছে। কিন্তু কিশোর বলল সবুজ, তাই একবার দেখতে এলাম।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে সবুজ ভ্যান অনেক আছে,' কিশোর বলল।

'কিন্তু একটা সূত্র আছে আমাদের হাতে।' গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে গাড়ির সামনের দিকে চলে গেল মুসা। ফিরে এল একবার দেখেই। গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল, 'আমাদের সাইক্লপসকে পেয়েছি। একটা হেডলাইট ভাঙা।'

বাকি পথটা আলোচনা করল ওরা ব্যাপারটা নিয়ে।

'তার মানে,' রবিন বলল, 'কাল রাতে আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন ডিকসনই। কেন? আমরা তো তাঁর হয়েই কাজ করছি, তাই না? তিনি আমাদের মক্কেল।'

'হতে পারে,' কিশোর বলল, 'আমাদেরকে একটা কভার হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।'

ঝট করে তার দিকে ফিরল রবিন। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। 'তুমি বলতে চাইছ, তিনিই কমিকগুলো চুরি করেছেন, আমাদের বোকা বানিয়েছেন, কাজে লাগিয়ে দিয়ে সবাইকে দেখাতে চেয়েছেন তিনি নিরপরাধ। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে!' মাথা ঝাঁকাল সে। 'চমৎকার একটা মোটিভও রয়েছে তাঁর। বিজ্ঞাপন।'

'ডিকসনের স্টলের ডাকাতির কথা কনভেনশনে আসা প্রতিটি মানুষ শুনেছে,' কিশোর বলল। 'বাজি রেখে বলতে পারি, সবাই ওরা স্টলে গিয়েছে দেখার জন্যে।'

একমত হয়ে মুসাও মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। এবং এটাই চেয়েছিলেন ম্যাড। তৈরি থেকেছেন ওদের জন্যে। কাল আরও কত বই আনিয়েছেন, মনে আছে?' ভ্রূকুটি করল সে। 'কিন্তু ডাকাতির সময় স্টলেই ছিলেন। তিনি ক্রিমসন ফ্যান্টম নন।'

'না। কিন্তু তাঁর সহকারী থাকতে বাধা কোথায়? কাজ শেষ করে লোকটাকে দ্রুত সরে পড়তে বলে রেখেছেন।'

'হ্যাঁ, এইবার মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে,' মাথা দোলাল মুসা। 'আর একটা প্রশ্ন। কোন্ লোকটাকে সহকারী বলে মনে হয় তোমার?'

রবিন বলল, 'জেনেই যখন ফেলেছি, আর তাঁকে ব্যবসার সুযোগ দেব কেন?' দুষ্ট হাসি ফুটল তার মুখে। 'চলো, তাঁর ঘাম ছুটিয়ে দিই। হারিয়ে যাওয়া কমিকগুলো রহস্যময় ভাবে আবার আমাদের হাতে চলে এসেছে, সেটা জানলে ভিড়মি খেয়ে পড়বেন পাগল সাহেব।'

হাসল কিশোর। 'কথাটা মন্দ বলোনি। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখেই অনুমান করতে পারব, কাজটা তিনিই করেছেন কি-না। আবার চোরের সন্ধানে বেরোতে হবে কি-না আমাদেরকে। 'হোটেলের ঘর থেকে কমিকগুলো নিয়ে কনভেনশন ফ্লোরেই চলে যাব, চলো।'

হোটেলে পৌঁছে নিজেদের ঘরে চলল ওরা। এই বার ৩১৪ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় লুই মরগান স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। 'এই যে, তোমাদেরই খুঁজছিলাম! কথাটা কি সত্যি? মিরিনা জরডান নাকি চোরাই কমিকগুলো খুঁজে পেয়েছে?'

'সবগুলো নয়, কিছু,' মরগানের কথায় হাসি চেপে রাখতে পারছে না কিশোর, 'কেবল আমাদেরগুলো।' তাহলে যা আন্দাজ করেছিল, তা-ই ঠিক। মিসেস জরডান এভাবে বিজ্ঞাপনই করতে চেয়েছিলেন।

কিশোরের মনের কথা পড়তে পেরেই যেন মরগান বললেন, 'মিরিনার মা কিছুই বলছে না। তবে তার মেয়ের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল ভালমত। যা-ই হোক, তোমাদের খুঁজছিল মহিলা। কমিকগুলোর জন্যে, ওগুলো হাতে নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে মিরিনা।'

নাক ঘোঁত ঘোঁত করলেন তিনি। 'খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন সাংবাদিক হাজির হয়ে গেছে। মিসেস জরডানের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে গন উইথ দ্য উইণ্ডের মত আরেকটা ছবি তৈরি করতে যাচ্ছেন তিনি।'

'লোকের ভিড় জমে যাবে তো হোটেলে!' কিশোর বলল। 'মিরিনাকে দেখার

জন্যে…

'এটাই চেয়েছেন মহিলা। কি করে কাজটা করলেন তিনি, জানি না, ম্যানেজারকে রাজি করিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মেয়ের জন্যে আলাদা এলিভেটরের ব্যবস্থা হয়েছে, সাথে থাকবে ইউনিফর্ম পরা আর্দালি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন তিনি, 'ভাব একবার অবস্থাটা! এই হোটেলে ঢুকেছিল স্টারগার্লের সাধারণ মডেল হয়ে, ফেরত যাবে রীতিমত স্টার হয়ে।'

এই সময় দেখা গেল মিরিনাকে। এলিভেটরের দিকে চলেছে। পরনে আবার সেই স্টেলারা স্টারগার্লের পোশাক। কিশোরের ওপর চোখ পড়তে অস্বস্তি ভরা হাসি হাসল। বুঝতে পারল কিশোর, মঞ্চ-ভীতিতে ধরেছে মেয়েটাকে। আরেকটা ব্যাপার, মিরিনা একা।

'আমার মনে হয়,' ব্যাপারটা মরগানও লক্ষ্য করেছেন, 'আগেই নিচে চলে গেছেন মিসেস জরডান। রিপোর্টারদের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছেন। একটা বিষয়ে অন্তত শিওর হলাম, আগাগোড়া মিথ্যে বলেননি মহিলা।'

ঘরে ফিরে গেলেন মরগান।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ভাবছে। ঘটনাটা কি? এরকম করলেন কেন কনভেনশন চীফ? এটা তো তাঁর সম্মেলনের জন্যেও একটা বিরাট বিজ্ঞাপন।

'মিরিনাকে কমিকগুলো দেয়া যায়, কি বল?' দুই সহকারীর মতামত জানতে চাইল কিশোর।

শ্রাগ করল শুধু মুসা।

রবিন বলল, 'অসুবিধে নেই।'

ঘরে ঢুকল ওরা। কমিকগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রওনা দিল এলিভেটরের দিকে।

ব্যক্তিগত এলিভেটরের সামনে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে মিরিনা। নিঃসঙ্গ। পরনে নীল আলখেল্লাটা শেষ বারের মত টেনেটুনে ঠিক করল। এলিভেটরের দরজার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন আলিবাবার ডাকাতের পাহাড়ের দরজা খুলতে যাচ্ছে। ভেতরে গিয়ে ধনরত্নও পেতে পারে, আবার ডাকাতের তলোয়ারে মুণ্ডও কাটা যেতে পারে।

ওর কাছ থেকে দশ ফুট দূরে রয়েছে কিশোর, এই সময় এলিভেটর এল।

'মিরিনা,' ডাকল কিশোর। মেয়েটা ফিরে তাকাতেই হাতের কমিকগুলো তুলে দেখাল।

কিশোরকে দেখে খুশি হলো মিরিনা। একা যেতে ভয় করছিল যেন। পরিচিত একটা মুখ দেখে সাহস পেল।

এবং এদিকে তাকিয়ে ছিল বলেই এলিভেটরের গোলমালটা চোখে পড়ল না তার। দরজা খুলে গেছে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো থাকার কথা। অথচ আলোই নেই। অন্ধকার।

বেরিয়ে এল একটা হাত। আর্দালির নয়। ধরে, এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল মিরিনাকে।

বারো

এলিভেটরের দিকে ছুটে গেল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা। ওরা এসে পৌছতে পৌছতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মাঝপথে আটকে গেল মিরিনার চিৎকার।

হাতে কমিকগুলো ধরাই রয়েছে। পাঁই করে ঘুরল কিশোর। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। দুই সহকারীকে বলল, 'এসো!'

ঘোরানো লোহার সিঁড়িটার দিকে দৌড় দিল সে। আগের রাতে এটা দিয়েই পালিয়েছিল ওদের ঘরের চোর। এক টানে দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। একেক লাফে দু'তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে নামতে লাগল।

তার সাথে পাল্লা দিতে মুসার অসুবিধে হল না, তবে রবিন পেরে উঠল না। পিছিয়ে পড়তে লাগল।

পা ব্যথা শুরু হয়েছে কিশোরের। মাংসপেশীতে খিঁচ ধরছে এভাবে নামতে গিয়ে। কেয়ার করছে না। তার এক চিন্তা, মিরিনাকে ধরতে পারবে তো? নামতে পারবে এলিভেটরের আগে?

অসম্ভবই মনে হলো। তবু হাল ছাড়ল না। গতি কমাল না। নেমে চলল একই ভাবে।

লবিতে পৌছেও থামল না কিশোর। টিভির সাংবাদিক সহ অনেকেই রয়েছে এখানে। এতগুলো মানুষের সামনে কিছুতেই বেরোবে না লোকটা মিরিনাকে নিয়ে। অন্য কোন তলায় নামারও সাহস করবে না। এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে যে কেউ, দেখে ফেলার ভয় আছে।

লোকটার জন্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা হলো গ্যারেজে নামা।

সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ যেন উড়ে নেমে এল কিশোর। আগের রাতের মতই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যানিক বারের ওপর। লোকটা বেরিয়ে গিয়ে মিরিনাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পরার আগেই ধরতে না পারলে···

এলিভেটর ব্যাংকের দিকে দৌড় দিল সে। ধস্তাধস্তি আর চিৎকারের চাপা শব্দ যেন মধুবর্ষণ করল তার কানে। এর অর্থ এখনও এলিভেটরের ভেতরেই রয়েছে মিরিনা। মুক্তির চেষ্টা করছে।

'তুমি থামবে!' ধমক শোনা গেল। 'গায়ে হাত তুলতে চাই না আমি। আমার জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়েছ বলে দাও, ছেড়ে দেব।'

পরিচিত কণ্ঠস্বর। দরজা খুলে বেরিয়ে এলে কিশোর দেখল, তার অনুমান ঠিক। মিরিনাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যাড ডিকসন।

কমিক হাতে কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেলেন তিনি। আপনাআপনি ঢিল হয়ে গেল মিরিনার গলা পেঁচিয়ে ধরা হাতের বাঁধন।

এটাই চেয়েছিল কিশোর। টেনে সরিয়ে আনল মিরিনাকে। এক ধাক্কায় ডিকসনকে ফেলে দিল কংক্রিটের দেয়ালের ওপর। দেয়ালে দুপ করে বাড়ি খেলো কমিক বিক্রেতার শরীর। ক্ষণিকের জন্যে অসাড় হয়ে গেল যেন।

টলমল করছে মিরিনার পা। শরীরের ভার রাখতে পারছে না যেন। একবার

দুলে উঠেই পড়তে শুরু করল কাটা কলাগাছের মত।

কমিকগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরতে গেল কিশোর। এই সময় ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন ডিকসন। জুডোর প্যাঁচ কষার সময় নেই। সরাসরি ঘুসি মারল তাঁর চোয়ালে কিশোর। আবার গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলেন কমিক বিক্রেতা।

রবিন আর মুসা পৌঁছে গেছে। মিরিনাকে ধরল রবিন। মুসা এগোল কিশোরকে সাহায্য করতে। এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ডিকসনকে।

পাশে চলে এল কিশোর। কমিক বিক্রেতার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'মেয়েমানুষের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার চেয়ে পুরুষমানুষের সঙ্গে করা অনেক কঠিন, তাই না?'

মিরিনাকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন। ডিকসনকে ধরে রেখেছে মুসা। মিরিনার কাছে এসে কিশোর সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আর ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ও আর কিছু করতে পারবে না তোমার।'

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল মিরিনা। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়তে চিৎকার করে বলল, 'হায় হায়, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে! আম্মা আমাকে মেরে ফেলবে...'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ওর শরীরে। রবিনের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝট করে বসে পড়ে কমিকগুলো কুড়াতে লাগল। তুলতে তুলতেই কিশোরের দিকে তাকাল একবার। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।...বলো তো, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? ক্যামেরার সামনে যেতে পারব?'

'ঠিকই আছে সব,' রবিন বলল। 'পারবে।'

'যা ঘটল সেটা সবার সামনে আম্মাকে বলা যাবে না। যাই। তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা করব।'

কমিকের বই হাতে এলিভেটরের দিকে এগোল মিরিনা।

ডিকসনের দিকে নজর দিল আবার কিশোর। অনেক কথা বের করতে হবে পেট থেকে।

'এভাবে আমাদের দেখে নিশ্চয় চমকে গেছেন,' হেসে বলল রবিন।

'চমকাব কেন?' আরেক দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডিকসন। চুলগুলো আগের চেয়ে এলোমেলো, সত্যি সত্যিই এখন পাগল মনে হচ্ছে তাঁকে। মাথা নাড়তে লাগলেন। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুসা কি আর ছাড়ে।

'ও, চমকাননি,' ব্যঙ্গ করে বলল কিশোর। 'তা চমকাবেন কেন? কাল রাতে তো আর আপনি আমাদের ঘরে ঢোকেননি। আমরা যখন পিছু নিয়ে এখানে নামলাম, তখন আমাদেরকে মারেনওনি।'

'কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'তা তো পারবেনই না,' মুসা বলল। 'পেরেছেন কেবল ভ্যানে করে পালাতে। হেডলাইট ভাঙা সবুজ গাড়িটাতে চড়ে। চমৎকার একটা নাম দিয়েছি আমরা ওটার, জানেন। সাইক্লপস।'

'আমি...মানে...আমি...'

'মানে মানে না করে ঝেড়ে ফেলুন না,' কিশোর বলল। 'নাকি আমরাই বলে দেব কি কি অকাজ করেছেন। চুরি, খুনের চেষ্টা, অপহরণের চেষ্টা...

'অভিযোগগুলো সব সত্যি নয়!' গলা কাঁপছে ডিকসনের। 'শুনলাম, স্টারগার্লের পোশাক পরা মেয়েটা কমিকগুলো খুঁজে পেয়েছে। ভাবলাম, সবই বুঝি পেয়েছে। তারপর শুনলাম, না, শুধু তোমাদেরগুলো পেয়েছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল আমার কাছে।'

রাগত ভঙ্গিতে চোখ মিটমিট করছেন তিনি। 'কমিকগুলো চুরি যাওয়ার আগে আমার স্টলের সামনে তাকে দেখেছি। তারপর হঠাৎ করেই কয়েকটা কমিক পেয়ে গেল সে। ধরেই নিলাম, সবগুলোই আছে তার কাছে। অল্প কয়েকটা বের করেছে। কাজেই তাকে একা ধরার জন্যে ওত পাতলাম। কোথায় কমিকগুলো লুকিয়েছে বের করার জন্যে। টাকা খাইয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে আর্দালিটার কাছ থেকে এলিভেটরটা চেয়ে নিয়েছি। বের করে দিয়েছি তাকে।'

একটা মুহূর্তের জন্যে কিশোরের মনে হলো, মিরিনাকে একা ছেড়ে দিয়ে ভুল করল না তো? কমিকগুলো নিয়ে পালাল? হয়তো মিরিনাই আসল চোর। পরক্ষণেই দূর করে দিল সন্দেহটা। কমিকগুলো দেখার পর মিরিনার চমকে যাওয়াটা অভিনয় হতেই পারে না। বলল, 'ভুল মানুষকে ধরেছিলেন আপনি, মিস্টার ডিকসন। কমিকগুলো পাওয়ার সময় আমি ছিলাম মিরিনার সামনে। কে জানি তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।'

উদভ্রান্ত দৃষ্টি ফুটল ম্যাডের চোখে। পাগলই হয়ে যাচ্ছেন যেন। অনুনয়ের সুরে কিশোরকে বললেন, 'চুরি করে কমিকগুলো নিয়ে গিয়ে মাথা খারাপ করে দিল আমার লোকটা। তোমরাও সুবিধে করতে পারলে না। বের করতে পারলে না ওগুলো। তখন আমিই খুঁজতে শুরু করলাম। কাল রাতে তোমাদের ঘরে সেজন্যেই ঢুকেছিলাম।'

'কিন্তু আমাদের ঘরে কেন ঢুকলেন?' মুসার প্রশ্ন।

'তোমরা যে আছ ওখানে, তা-ই জানতাম না। শুধু জানি, ওটা দিয়ে তিনশো চোদ্দ নম্বরে ঢোকা যায়, তাই ঢুকেছিলাম...'

'লুই মরগানের ঘরে ঢোকার জন্যে?' ভুরু তুলল রবিন।

'লুই মরগান!' নিজের কপালে চাপড় মারল কিশোর। 'আজ সকালে ভিডিও টেপের বাক্স নিয়ে বেরোতে দেখলাম একটা লোককে, তাঁর ঘর থেকে। তখনই মনে পড়া উচিত ছিল আমার, কোথায় দেখেছি লোকটাকে। সুমাতো কমিকের স্টলে গরম গরম কার্টুনের ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করছিল।'

ডিকসনের দিকে তাকাল সে। কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছেন ম্যাড, যেন বুঝতে পেরেছেন জ্যান্ত পোড়ানো হবে না আর তাঁকে, রেহাই পেয়ে গেছেন।

'মরগানের সঙ্গে সুমাতো কমিকের সম্পর্ক কি, বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জায়গাটার মালিক সে,' জবাব দিলেন ডিকসন। 'কেন, তুমি জানো না? এজন্যেই তো কনভেনশনটা করতে পেরেছে এখানে। বহুদিন ধরে কমিকের ব্যবসা করে আসছে লোকটা।'

'কমিকের ব্যবসা,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। কয়েকটা ছিন্ন সুতো ছেঁড়া দেয়ার চেষ্টা চালাল মনে মনে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, ম্যাড ডিকসন চুরিটা করেননি।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। একজন সন্দেহভাজন কমল। তবে রহস্য যেখানে ছিল, মোটামুটি সেখানেই রয়ে গেছে। সমাধান হয়নি।

আরেকটা প্রশ্ন করা দরকার ডিকসনকে। 'ফ্যান ফানের একটা কপি চুরি যাওয়ার পর আরেকটা যেটা এনে রাখা হল তার জায়গায়, সেটাতে প্রাইস ট্যাগ দেখলাম দু'শো পঞ্চাশ ডলার। অথচ যেটা চুরি গেছে সেটা যখন কিনতে এলেন নীল বোরাম, দাম চাইলেন ছ'শো ডলার, এবং তাতেই তিনি কিনতে রাজি হয়ে গেলেন। কেন? ওটার এত বেশি দাম হওয়ার কারণ কি?'

কালো ছায়া নামল ম্যাড ডিকসনের মুখে। 'ওটাতে আইজাক হুফারের সই ছিল। আসল আইজাক হুফার। সংগ্রাহকের জিনিস। কারও পছন্দ হলে যত দাম হাঁকতাম, তত দিয়েই কিনে নিত।'

তেরো

'অটোগ্রাফ দেয়া?' কিশোর বলল, 'আমি কমিক সংগ্রহ করি না, তার পরেও আমি জানি আইজাক হুফার কোন ক্রিমসন ফ্যান্টম বইতে সই করেনি। এডগার ডুফার আমাকে সমস্ত গল্প বলেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, হুফার সই করেনি।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' ডিকসন বললেন। গোঁফের নিচে দেখা দিল এক চিলতে হাসি। 'তবে সে যাতে সই করেছে, তাতে ছিল ফ্যান ফান আর গ্রে ফ্যান্টম। ক্রিমসন ফ্যান্টমের অনেক আগে আঁকা হয়েছিল ওই কমিক। আমার মনে হয়, বোরামের সঙ্গে গণ্ডগোলের আগে ওই অটোগ্রাফ দিয়েছিল হুফার।' হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল হাসিটা। 'চুরি করে নিয়ে গেল শয়তান চোরটা।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'হুফারকে ওটা দেখানর সুযোগই আপনি পাননি, তাই না?'

মাথা নাড়ল ডিকসন। 'বইটা চুরি হওয়ার আগে দেখাই হয়নি ওর সঙ্গে আমার। আর যখন হলো, তখনও তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। বরং জড়িয়ে গেলাম ডুফারের সঙ্গে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ডিকসন। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তো, আমাকে নিয়ে কি করবে?'

'কাল রাতের কথা জিজ্ঞেস করছেন তো?' কিশোর বলল, 'ওই যে, যে সব ছোটখাট শয়তানিগুলো করলেনঃ জোর করে লোকের ঘরে ঢোকা, মারধর করা, গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টা, এসব?'

'হ্যাঁ,' ঘামতে শুরু করেছেন ডিকসন। 'ওগুলোর কথাই বলছি।'

শ্রাগ করল কিশোর। 'আমরা অভিযোগ করব না। আপনি হেডলাইটটা ঠিক করে নিন। থানায় গিয়ে বড়জোর একটা এন্ট্রি করিয়ে নিতে পারেন, বাড়ি লেগে ওটা ভেঙেছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডিকসন।

কিন্তু রবিন আবার চিন্তায় ফেলে দিল তাঁকে। বলল, 'তবে মিরিনা যদি পুলিশকে রিপোর্ট করে, বিপদে পড়বেন। আমাদের না জানিয়ে হয়তো যাবে না। কিন্তু যদি যায়, কি বলবেন পুলিশকে, ভেবে ঠিক করে রাখবেন।'

কিশোর আশা করল, পুলিশের কাছে না যাওয়ার জন্যে বোঝাতে পারবে মিরিনাকে। তবে সেকথা বলল না ডিকসনকে।

শুকনো হাসি হাসলেন কমিক বিক্রেতা। 'দেখা যাক, কি হয়। আমি স্টলে যাচ্ছি। প্রয়োজন পড়লে ওখানে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। পারলে মিরিনাকেও নিয়ে এসো। সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলে মাপটাপ চেয়ে নেব, যাতে পুলিশের কাছে না যায়।'

'সেটাই করবেন,' মুসা বলল। এলিভেটরের বোতাম টিপে দিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কি করছি আমরা?'

'চলো, হুফারকে খুঁজি। অটোগ্রাফের ব্যাপারটা আলোচনা করা দরকার।'

লবিতে উঠে এল ওরা। মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে চলল। প্রবেশ পথের কাছে, টেবিলের সামনে কমিক ক্রেতাদের ছোট একটা লাইন। ওদের হাতে সিল মেরে দিচ্ছে দুই রঙা চুলওয়ালা মেয়েটা।

দ্রুত স্টলের দিকে চলে গেলেন ডিকসন। তিন গোয়েন্দা গেট পেরোতে যেতেই ওদেরকে আটকাল বিশালদেহী সেই দারোয়ান। 'সরি। হবে না।'

হাতের ছাপ দেখাল কিশোর।

'এটা তো কালকের,' দারোয়ান বলল। 'মুছে গেছে। যাই হোক, চেষ্টাটা ভালই করেছিলে। পারলে না আরকি। আমাকে ফাঁকি দেয়া অত সোজা না।'

মানি ব্যাগের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। 'দেখুন, টিকেটের পয়সা মারার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই। জানতাম না। আমরা মনে করেছিলাম, একদিন টিকেট করে নিলেই হবে।'

কয়েক মিনিট পরে, হাতের উল্টোপিঠে 'ইন্টারকমিকন-২' ছাপ মেরে কনভেনশন রুমের ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল।

'কোথায় পাওয়া যাবে হুফারকে?' মুসার প্রশ্ন।

'টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি,' কিশোর বলল। 'ওখানে না পেলে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করব। কেউ হয়তো বলতে পারবে।'

হুফারের সীট খালি।

অনেককেই জিজ্ঞেস করা হলো—দোকানদার, হুফারের ভক্ত, কিন্তু কেউ বলতে পারল না লোকটা কোথায় আছে। এমনকি অন্যান্য আর্টিস্টেরাও জানে না ও কোথায় আছে। পেন্সিল দিয়ে ওয়াকি উডেন্টের ছবি আঁকছেন একজন বৃদ্ধ আর্টিস্ট। প্রশ্ন শুনে বললেন, 'একটু আগে তো ছিল। কোথায় যে গেল...কিছুই বলে যায়নি।'

'এবার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এসব ক্ষেত্রে,' মাথা চুলকে জবাব দিল কিশোর, 'হোটেলের রিসিপশনিস্টকে

জিজ্ঞেস করলে ফল পাওয়া যায়।'

'না,' মাথা নেড়ে বলল রিসিপশন ক্লার্ক, 'এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। জরুরি একটা মীটিঙে রয়েছেন।'

'কখন দেখা করা যাবে,' জানতে চাইল কিশোর। 'বলেছেন কিছু?'

'হয়তো আজ বিকেলে কোন এক সময়,' জানাল রিসিপশনিস্ট।

'তার জন্যে কি একটা মেসেজ রেখে যেতে পারব?' রিসিপশনিস্ট সম্মতি জানালে তার কাছ থেকেই কাগজ আর কলম নিয়ে নোট লিখে, ভাঁজ করে, সেটা দিয়ে বলল, 'মুখে বলবেন, আমরা তার সঙ্গে ম্যাড ডিকসনের স্টলে দেখা করব।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, 'এখন আমরা জানি, বিকেলটা কোথায় কাটাতে হবে।'

আবার কনভেনশন হলে ফিরে চলল ওরা। ওদেরকে দেখে অস্বস্তি ফুটল ডিকসনের চোখে। 'মেয়েটা এল না?'

'কথা বলিনি এখনও।' কোথায় গিয়েছিল, জানাল কিশোর। ডিকসনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভাববেন না, ব্যবস্থা একটা হবেই।'

এই সময় একটা ছেলেকে আসতে দেখা গেল। বিরাট একটা বাক্স হাতে, কিশোর যে বাক্সটা এনেছিল, তার চেয়ে অন্তত তিন গুণ বড়। ভারের চোটে বাঁকা হয়ে গেছে ছেলেটা, হাঁটতে পারছে না ঠিকমত। ওদেরকে বললেন ডিকসন, 'আমার ব্যবসা আসছে মনে হয়।'

টেবিলের সামনে এসে বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল ছেলেটা। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল ডিকসনের দিকে। টেবিলে হেলান দিয়ে মৃদু হাঁপাতে লাগল ছেলেটা। স্লাইম ম্যান নম্বর ওয়ান আছে? দ্য আউরেজিয়াস ওজনের নম্বর ওয়ান এবং নম্বর টু পেয়ে গেছি। স্লাইম ম্যানটা দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন ডিকসন, 'আছে।'

পেছনের র‍্যাক থেকে স্লাইম ম্যানের একটা কপি নামাতে গেলেন তিনি। ছেলেটা বাক্সটা তুলে ধপাস করে ফেলল টেবিলের ওপর।

কমিকটা ছেলেটার হাতে দিতে গিয়েই চিৎকার করে উঠলেন ডিকসন, 'ধর, ধর!' তবে কিছু করার আগেই পড়ে গেল কোলপসিবল টেবিলটা।

'দূর, কাণ্ডটা কি করলাম! দাঁড়ান, আমি ঠিক করে দিচ্ছি,' বলে হাঁটু গেড়ে বসে বই তুলতে শুরু করল ছেলেটা।

ডিকসন আর তার সহকারী মিলে আবার টেবিলটা খাড়া করতে লাগলেন।

জমাতে জমাতে এক জায়গায় কমিকের স্তূপ করে ফেলল ছেলেটা। তারপর নিজের বাক্সটা ঠেলে সরাতে গেল।

পা দিয়ে আটকালেন ডিকসন। 'এক মিনিট।' বলেই বাক্সের ডালা ফাঁক করে ভেতর থেকে বের করে আনলেন একটা স্লাইম ম্যানের কপি। 'এটা আমার। ওখানে গেল কি করে?' ছেলেটার মুখের কাছে বইটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এবার ছেড়ে দিলাম, যাও। আর যদি এদিকে দেখি ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।'

বিরাট বোঝাটা তুলে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল ছেলেটা, বোঝার তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি গেল।

সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করে বললেন ডিকসন, 'ভাল করে দেখা উচিত ছিল। আমার আরও বই নিয়ে গেছে কি-না কে জানে! এই জন্যেই, বুঝলে,' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দামি জিনিসগুলো পেছনে সরিয়ে রাখি, হাতের কাছ থেকে দূরে। চোরের অভাব নেই।' তিক্ত হাসি হাসলেন। 'একটা চোরকেও কিচ্ছু না বলে ছেড়ে দিলাম। অথচ আমাকেই চোর ভাবে ডুফার, গলাকাটা ডাকাত ভাবে!'

এডগার ডুফারের নাম শুনে ঝট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। লোকটার ওপর থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল তার। টেবিলটা পড়ে যাওয়া থেকেই বুঝেছে। লাল আলখেল্লার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে আসতে পারলেও বিশাল বপু নিয়ে ওই টেবিল ডিঙিয়ে যেতে পারবে না সে কোনমতেই। তাহলে অবশ্যই ধসে পড়ত টেবিলটা। তাহলে কে কাজটা করল? মিসেস জরডান?

'অ্যাই যে, তোমরা এখানে।'

ফিরে তাকাল কিশোর। হাতে একগাদা কমিক বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা। বলল, 'এখানেই পাব জানতাম। ভাবলাম, ফেরত দিয়েই যাই।'

'থ্যাংকস।' মিরিনার হাত থেকে কমিকগুলো নিল কিশোর। 'সাক্ষাৎকার কেমন হলো?'

'ভাল। আম্মা বলল, এতদিনে নাকি আমি কিছু শিখতে পেরেছি। সাংবাদিকদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রেখে ভাল করেছি। এরকমই নাকি করতে হয়, তাতে দাম বাড়ে। আমার দেরি হওয়ার আসল কারণটা যদি জানত···' ডিকসনের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল সে।

কমিক গোছাচ্ছেন ডিকসন। হাত কাঁপছে। তাকাতে পারছেন না মিরিনার দিকে। হঠাৎ কেন কথা থামিয়ে দিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বললেন, 'মিরিনা, আমি দুঃখিত, সত্যিই দুঃখিত! বড় অন্যায় করে ফেলেছি!'

নরম হয়ে গেল মিরিনা। 'না না, আমি কিছু মনে করছি না! ভুল হয়েই যায় মানুষের।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কিশোর, তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি তখন। সাংঘাতিক ছেলে তুমি, বাব্বাহ্!' বলে ওর হাত চাপড়ে দিল সে।

লাল হয়ে গেল কিশোর। এরকম খোলাখুলি প্রশংসায় লজ্জা পায় সে, তার ওপর করেছে একটা মেয়ে। ঢোক গিলে বলল, 'ও কিছু না···আমি···আমরা···' চুপ হয়ে গেল সে। দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে রবিন আর মুসা। মেয়েদের ব্যাপারে কিশোরের অস্বস্তির কথাটা জানা আছে ওদের।

ওকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিল মিরিনা। বলল, 'ফাইট করতে পারো বটে তুমি!' কিশোরের হাত ধরে বলল, 'এসো না, আজ একসঙ্গেই লাঞ্চ খাই?' কিশোরের নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে বলল সে, 'তাহলে ওই কথাই রইল। হোটেলের সাইড গেটের কাছে বাগানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। বিশ মিনিটের মধ্যে।'

চলে গেল মিরিনা।

দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে কিশোর বলল, 'কি করা যায়, বলো তো? ও আমাকে একা যেতে বলল!'

'কি আবার,' রবিন বলল। 'যাবে। কথা বলার এটাই তো সুযোগ। দেখো না, কিছু বের করতে পারো কি-না।'

'ঠিক,' মুসাও একমত। 'লাল আলখেল্লার সঙ্গে কোন যোগাযোগ থেকে থাকলে...'

'বেশ,...' বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল কিশোর, বুঝতে পারল না অন্য দু'জন। রওনা হলো নিজেদের ঘরের দিকে, কমিকগুলো রেখে আসার জন্যে।

পোশাক বদলে এল মিরিনা। পরনে শর্ট, গায়ে টি-শার্ট, মাথায় উইগ নেই, বেরিয়ে আছে খাট বাদামি চুল। স্বাভাবিক লাগছে তাকে এই পোশাকে, আরও বেশি সুন্দর।

'বাহ্, দারুণ লাগছে তোমাকে,' প্রশংসা করল কিশোর। 'এটাই কি তোমার আসল রূপ?'

হাসল মিরিনা। 'কেন, আরও কিছু আছে ভাবছ নাকি?' কিশোরের হাতের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে সাইডওয়াকের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে। 'পোশাক তো না, পাগলামি! আহ্, বাঁচলাম!'

পাশাপাশি হাঁটছে দু'জনে।

আবার বলল মিরিনা, 'কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে। বারগার আর সালাদ খুব ভাল করে। ওখানে গিয়ে আরামে বসতে পারব আমরা, স্টেলারা স্টারগার্লের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাবে না।'

পচুর আলোবাতাস রয়েছে রেস্টুরেন্টটার ভেতরে। চারদিকে প্রচুর কাচ, ভেতরে অসংখ্য টবে গাছ। ভিড় কম। খাবারের অর্ডার দিল মিরিনা।

খাওয়ার ফাঁকে একসময় তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে পড়ল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা? অপরাধী খুঁজে বেড়াও?'

কিশোর বলল, 'বহু বছর ধরে একাজ করছি।'

'আর এর প্রতিষ্ঠাতা হলে গিয়ে তুমি। অন্য দু'জন তোমার সহকারী।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কাঁটা চামচের মাথায় গেঁথে তোলা মাংসের টুকরোটা খসে পড়ে গেল পিরিচে। আবার গেঁথে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে লাগল।

'দারুণ একটা টিম তোমাদের,' মিরিনা বলল। 'অনেক খোঁজখবর নিয়েছি তোমাদের ব্যাপারে। তুমি হলে দলটার মাথা। তোমার নিগ্রো বন্ধুটির গায়ে জোর বেশি, তাই তাকে দেয়া হয় সাধারণত বিপজ্জনক কাজের ভার। আর আমেরিকান বন্ধুটি বইয়ের পোকা, তাই বই ঘেঁটে তথ্য জোগাড় আর গবেষণার ভার পড়ে তার ওপর। ঠিক বলেছি না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, খোঁজখবর সত্যিই নিয়েছ।'

তারপর কিছুক্ষণ প্রশ্ন করে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে নানা কথা জেনে নিল মিরিনা। অবশেষে কাজের কথায় এল কিশোর, 'ওই অদ্ভুত পোশাক কেন পরো তুমি?'

'কঠিন প্রশ্ন করলে।' চিবিয়ে মুখের খাবারটুকু গিলে নিল মিরিনা। এক ঢোক পানি খেলো। তারপর বলল, 'কমিক খুব পছন্দ আমার। কিন্তু আম্মা একদম দেখতে পারে না। হাতে দেখলেই বকাবকি করে। শেষে একদিন চোখ পড়ল

স্টেলোরা স্টারগার্লের ওপর। আমাকে দিয়ে মডেলিং করানর ভাবনাটা তখনই এল মাথায়

'ভে মার কেমন লাগে মডেল হতে?'

'ভাল না। আমার ইচ্ছে কমিক আর্টিস্ট হওয়া।'

হাসল কিশোর। 'স্লাইম ম্যানের ছবি আঁকবে?'

'আঁকলে ক্ষতি কি? তবে স্টেলোরা স্টারগার্লকেই আমার বেশি পছন্দ।'

আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না কিশোর। খাওয়া শেষ করে উঠল।

হোটেলের পাশের গেট দিয়ে আবার বাগানে ঢুকল দু'জনে।

কিশোর বলল, 'ভাল খাবার খাইয়েছ। ধন্যবাদ।'

'আবার দেখা হবে,' হাত বাড়িয়ে দিল মিরিনা। 'কাল পর্যন্ত থাকছ তো?'

মিরিনার হাতটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কি যেন ভাবছে। তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়াল। বলল, 'কতদিন থাকব বলতে পারছি না। তবে এ কেসের সমাধান না হওয়াতক আছি, এটা বলতে পারি।' চোখ আটকে গেল মিরিনার হাতের দিকে। 'আরি!'

'কী?' হাতটা টেনে নেয়ার চেষ্টা করল মিরিনা। কিন্তু কিশোর ছাড়ল না। তাকিয়ে রয়েছে হাতের উল্টো পিঠের সিলটার দিকে।

'কিশোর, কি হলো?'

বিড়বিড় করছে কিশোর, 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! অনেক আগে!'

'ডাকাতির কথা বলছ?'

আরেক হাতে মিরিনার হাতটা চাপড়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'বলছি, ক্রিমসন ফ্যান্টমের কথা। স্মোক বম্বগুলো ফেলার সময় লোকটার দুটো হাতই আমি দেখেছি।'

'তাতে কি?'

'তাতে? অনেক কিছু। প্রথমেই বলা যায়, লোকটার কোন হাতেই সিল ছিল না।'

চোদ্দ

মিরিনার হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে ছুটল কিশোর। 'রবিন আর মুসাকে একথা জানানো দরকার!'

'আহ্, ছাড় না!' হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মিরিনা। 'এই পোশাকে কনভেনশন ফ্লোরে যেতে পারব না আমি। কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে। আর তাহলে আম্মা আমার...'

'ছাল ছাড়াবে,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর।

'হাতে সিল না থাকাটা এমন কি জরুরি?'

'অনেক জরুরি। এতে প্রমাণ হয়, কাজটা করেছে ভেতরের কোন লোক। তুমি, আমি, দোকানদার, যে-ই ঢুকি না কেন, প্রবেশ মূল্য দিতে হয়, হাতে সিল মেরে নিতে হয়। নইলে দরজায় আটকে দেয় দারোয়ান। কিন্তু যে লোকটা বোমা

ফেলল তার হাতে সিল না থাকলেও ঢুকতে পারল। কি করে? কেন তাকে আটকাল না দারোয়ান? একটাই কারণ, ও এখানকার লোক।'

'হুঁ, বুঝলাম,' দ্বিধা করছে মিরিনা। লবিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে এলিভেটর ব্যাংকের দিকে। 'দেখ, এই কেসে তোমাদের আমি সাহায্য করতে চাই, যদি সম্ভব হয়। এখন তো আর আমাকে এড়াতে পারবে না, জড়িত হয়ে গেছি। ওপরে গিয়ে পোশাক বদলে আসি। ম্যাড ডিকসনের দোকানের সামনে থেক, দেখা হবে।'

'তোমার সাথে আসব?'

হাসল মিরিনা। 'দরকার নেই। এখন আর এলিভেটরে কিছু হবে বলে মনে হয় না। একাই যেতে পারব।'

মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে রওনা হলো কিশোর। কয়েকবার দেখা হয়েছে, ইতিমধ্যে তাকে চিনে ফেলেছে দারোয়ান, তার পরেও হাতের সিল না দেখে ছাড়ল না। ভিড়ের ভেতর দিয়ে সোজা ডিকসনের স্টলের দিকে এগোল সে। ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর মুসা।

ওকে দেখেই বলে উঠল মুসা, 'কয়েক যুগ তো লাগল আসতে। স্টেলারা স্টারগার্ল তোমাকে আরেক গ্যালাক্সিতে নিয়ে গিয়েছিল নাকি?'

রবিন রসিকতা করল না। কিশোরের চেহারা দেখেই অনুমান করে ফেলেছে কিছু হয়েছে। 'কি ব্যাপার?' ভুরু কোঁচকাল সে। 'ওখানেও রহস্য পেলে?'

'একটা সূত্র পেলাম,' কিশোর বলল। 'শুনলে তোমাদেরও চোখ কপালে উঠবে। আইজাক হুফারের দেখা পেলে?'

'আমাকে কি দরকার?' পেছন থেকে বলে উঠল হুফার। 'সময় মত এসে গেছি, তাই না?' হাসল সে। 'এইমাত্র এলাম। একটা উৎসবের আয়োজন করব ভাবছি।' জ্যাকেটের পকেটে চাপড় দিয়ে বলল, 'একটা কন্ট্রাক্ট আছে এখানে। নতুন একটা কমিকের জন্যে চুক্তি করে এলাম।'

'কে ছাপছে?' সব কথাই কানে গেছে ডিকসনের।

'হ্যারিস ডিমলার। এ শহরেই আছেন। কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছেন। দেখা হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে গেলেন ঘরে। আলাপ-আলোচনা করে পছন্দ হলো, কাজ করতে রাজি হয়ে গেলাম। মীটিং থেকে চলে গিয়েছিলাম সে জন্যেই।'

'কাল ডাকাতির সময় কি সেখানেই ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল হুফার। 'হ্যাঁ। ওখান থেকে এসে কনভেনশন ফ্লোরে ঢুকে দেখি ধোঁয়া।'

'আপনার নতুন চুক্তির কথা কেউ জানে?'

'কেউ না। বকবক করে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে মেজর মেহ্যামের বারোটা বাজাতে চাই না এখনই।'

'মেজর মেহ্যাম?' ডিকসনের গোঁফ কাঁপছে। 'কি ধরনের হিরো হবে? মুষ্টিযোদ্ধা? ইনটেলিজেন্ট এজেন্ট? মারসেনারি? নাকি স্পেসম্যান?'

তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল হুফার। 'একটা কপি কিনে নিজেই পড়ে দেখবেন। আগে থেকেই বলতে যাব কেন?' কিশোরের দিকে তাকাল সে। চুক্তির

কথা কেউ জানে কি-না, এ প্রশ্ন করলে কেন?'

কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে কিশোর বলল, 'আপনার কি ক্ষতি করেছে, জানি আমি। সে কথাই ভাবছি। ছবিগুলো নষ্ট করল, হামলা চালাল··· যে করেছে, সে জানেই না, যে এখানে থাকার একটা জোরাল কারণ আছে আপনার।'

সামনে ঝুঁকল রবিন। 'কিশোর, কেবলই জটিল করে তুলছ সব কিছু। দয়া করে একটু সহজ করো। এমন ভাবে বলছ, যেন কেউ হুফারকে তাড়াতে চাইছে এখান থেকে।'

'ঠিক, তা-ই বলছি।' হুফারের দিকে তাকাল কিশোর। 'এই চুক্তি না হলে কি এখনও এখানে থাকতেন আপনি?'

'না। এমনকি সেদিন বক্তৃতাও দিতাম না। আমি বুঝতে পেরেছি, ঘটনাটা কোনভাবে আঁচ করে ফেলেছে বোরাম, তাই তাকে আরেকটু খুঁচিয়ে দিতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি বললে···'

'কেউ জানে না আপনার চুক্তির কথা,' কিশোর বলল। 'তাহলে মিস্টার ডিমলারের ওপরও হামলা চলত। বিরক্ত করা হত তাঁকেও। আঘাতটা শুধু আপনার ওপরই হয়েছে, হুফার। আমার বিশ্বাস এর সঙ্গে ফ্যান ফান চুরির ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। থাকতেই হবে!'

ডিকসনের দিকে তাকাল কিশোর। 'অটোগ্রাফের কথা জিজ্ঞেস করেছেন না কেন?'

'অটোগ্রাফ?' সতর্ক হয়ে উঠলেন হুফার। 'কোন কিছুতে সই করতে বলবেন না তো···'

'সই করে দিয়েছেন, এমন কিছুর কথাই বলব,' ডিকসন বললেন।

'যদি হুফার করে থাকেন আরকি,' মাঝখান থেকে বলল কিশোর।

'মানে?' হুফারের চোখে সংশয়।

'আমি দেখেছি, আপনি ক্রিমসন ফ্যান্টমে সই করেননি। পুড়িয়ে ফেলতেও দেখেছি। আপনার হিরোয়িক কমিক আমলের কোন কিছুতেই সই আপনি আর করতে চান না।'

'ও, সবই দেখেছ তাহলে। কোন কিছুই চোখ এড়ায় না। খেপামি ভাবতেই পার। তবে কেন এই খেপামি করি কারণটা জানলে আর ওরকম ভাববে না। হিরোয়িক কমিক, বিশেষ করে নীল বোরাম আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে।'

'জানি আমরা,' কিশোর বলল। 'এডগার ডুফার সবই বলেছে আমাদের।'

পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল আর্টিস্ট। 'তার মানে কোন কথাই আর গোপন থাকে না। যা-ই হোক, বুঝতেই পারছ কেন আর আমি ওদের প্রকাশিত কোন কিছুতে সই করি না। আমি সই দিয়ে ওদের ব্যবসা কেন বাড়াব?'

'সব সময় তো ওদের ওপর খাপ্পা ছিলেন না,' ডিকসন বললেন। 'সে সময় নিশ্চয় সই করতেন।'

হেসে উঠল হুফার। 'সে সময় এত কাজ আমাকে দিত হিরোয়িক কমিক, করতে করতেই জান বেরোত, সম্মেলনে যোগ দেয়ার আর সময় পেতাম না। সই করব কি?'

'তারও আগে? ফ্যান ফানের আমলে?'

'গ্রে ফ্যান্টমের কথা বলছেন?' মাথা নাড়ল হুফার, 'না, তখনও দিইনি। এতটা বিখ্যাত হইনি তখনও যে লোকে আমার অটোগ্রাফ চাইতে আসবে।'

'যা-ই হোক, আপনি নিশ্চয় কথাটা ভুলে গেছেন। একআধটা সই করেই থাকতে পারেন। কাউকে উপহার দেয়া কোন কপিতেঃ মাকে দিতে পারেন, বোনকে দিতে পারেন, বন্ধুকে...কিংবা যেখানে কাজ করতেন সেখানকার কাউকে...'

'মনে করতে পারছি না।' ভুরু কোঁচকাল হুফার। 'কেন? এটা নিয়ে এত প্রশ্ন কেন?'

'আপনার সই দেয়া ফ্যান ফানের একটা কপি ছিল আমার কাছে,' জোর দিয়ে বললেন ডিকসন।

'থাকতেই পারে না,' ঠিক একই রকম জোর দিয়ে বলল হুফার। 'আমি ফ্যান ফানের কোন কপিতে সই করিনি।'

'দেখুন, আপনার নামটাই ছিল। স্পষ্ট পড়া যায়। যে পৃষ্ঠা থেকে গল্প শুরু হয়েছে...'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল হুফারের। 'দেখলে বুঝতে পারতাম।'

'তা আর পারবেন না। কপিটা চুরি হয়ে গেছে।'

ডিকসনের দিকে তাকাল হুফার। 'সইটা দেখতে কেমন, বলতে পারবেন? এখন আমার সই অনেক বদলে গেছে, তখনকার সঙ্গে মিলবে না। ইদানীংকার কোন সই থেকে জাল করতে গেলে ধরা পড়ে যাবে, অন্তত আমি দেখলে বুঝে ফেলব। আমি সই করিনি ওরকম কোন কপিতে, এটা বলতে পারি। মনে থাকতই...'

'হয়তো মনে করতে চান না এটার কথা। আমি শিওর হচ্ছি, তার কারণ, যে লোকটা ওই কপি আমার কাছে বিক্রি করেছে, সে আপনার সই ভালমতই চেনে।'

'কে লোকটা?' জানতে চাইল মুসা।

'নীল বোরাম।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ডিকসনের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

'ওই শয়তানটা!' ফেটে পড়ল হুফার। 'তার কপিতে দেব আমি সই!'

'দিতেই পারেন। একটা সময় তো বন্ধুত্ব ছিল আপনাদের। যখন একসঙ্গে কাজ করতেন,' ডিকসন বললেন।

'কোন কালেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল হুফার। 'ওটা একটা ধাড়ি শয়তান, আর আমি ছিলাম অল্পবয়েসী, তার তুলনায় কচি খোকা, যাকে ঠকানর সুযোগ পেয়েছিল সে। আমাকেই বরং একটা অটোগ্রাফ দিয়েছিল একবার। হিরোয়িক কমিক ছাড়ার পর সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'তাহলে বইটা পেলেন কোথায় বোরাম?' রবিনের প্রশ্ন।

নীল-সোনালি রঙের ঝিলিক তুলে এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো মিরিনা।

'কিছু মিস করলাম না তো?'

'না,' কিশোর বলল, 'সময়মতই এসেছ। আলাপটা সবে গরম হচ্ছে। নীল বোরামের কথা বলছি আমরা।'

'ওই হারামজাদার মুখে একটা ঘুসি মারতে পারলে এখন খুশি হতাম আমি!' মুঠো তুলে ঝাঁকাল হুফার।

'পারলে মারুনগে, আমি আপনাকে আটকাব না,' ডিকসন বললেন। 'লোকটা আপনাকে যদি ঠকিয়েই থাকে, রাগ হবেই। হাজার হোক, আপনারটা ভাঙিয়ে তো আর কম খাচ্ছে না। একটা খবর নিশ্চয় জানেন, পুরানো। জনপ্রিয় কমিকগুলো আবার ক্ল্যাসিক হিসেবে ছাপছে হিরোয়িক কমিক'।'

'তার মানে,' মুসা বলল। 'আমরা যেগুলো পড়তাম, সেগুলোই রিপ্রিন্ট করছে?'

'হ্যাঁ। ক্রিমসন ফ্যান্টম ক্ল্যাসিক খুব চড়া দামে বিক্রি হবে।' ব্যাপারটা ডিকসনেরও পছন্দ নয়। 'এতে আসল বইগুলোর দাম অনেক কমে যাবে। যেগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার কাছে অনেক আছে, যেখানে যা পেয়েছি কিনে ফেলেছি। লস দিতে হবে আমাকে।'

'বোরামের কাছে ফ্যান ফান বিক্রি করেননি কি এই রাগেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' তিক্ত হাসি ফুটল ডিকসনের ঠোঁটে। 'অনেক দিন ধরেই কেনার জন্যে আমার পেছনে লেগে ছিল সে। দিইনি।'

'নীল বোরামের সঙ্গে কথা বলা দরকার,' বলল কিশোর। 'দেখি, তাঁর কি বলার আছে?'

হিরোয়িক কমিকের এলাকায় পৌছল ওরা। আরেকটা প্রেস কনফারেন্স দিতে তৈরি হচ্ছে কোম্পানি। মিরিনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন বোরাম। পেছনে কারা আসছে, দেখেই হাসিটা মুছে গেল মুখ থেকে।

'হুফার!' জোর করে পাতলা একটা হাসি দিলেন বোরাম। 'অভিযোগ করতে এসেছ তো আমার নামে? গালাগাল করবে?'

'না,' জবাবটা দিল কিশোর। 'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি যে বইটা কিনতে চেয়েছিলেন ডিকসনের দোকান থেকে, সেটার ব্যাপারে। মনে আছে নিশ্চয়? ফ্যান ফানের কপি। সংগ্রাহকের জিনিস।'

'কি বলছ বুঝতে পারছি না!' টাকের চামড়া লাল হয়ে যাচ্ছে সম্পাদকের। চোখে অস্বস্তি। বার বার তাকাচ্ছেন ডিকসনের দিকে।

'ফ্যান ফান নাম্বার ওয়ানের কপিটা, যেটা সেদিন কিনতে চেয়েছিলেন,' মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'মিস্টার ডিকসন বললেন, আপনিই নাকি তাঁর কাছে ওটা বিক্রি করেছিলেন।'

'তাতে কি?' সম্পাদকের গালে দুটো লাল রক্তবিন্দু জমল। 'এটা কোন অভিযোগ নয়। কমিক আমি বিক্রি করেই থাকতে পারি। ওটাই আমার ব্যবসা।' কিশোরের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। 'নাকি চোর ভাবছ আমাকেই?'

'আরে না না, কি যেন বলেন,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'বোমা যখন ফাটল, তখন আপনি ছিলেন ডুফারের সঙ্গে, গোল্ড রুমের বাইরে। আমরা কেবল

জানতে এলাম, কপিটার জন্যে এত আগ্রহ কেন আপনার?'

'শুনতে চাও? আরও বেশি দামের অফার পেয়েছিলাম আমি কপিটার জন্যে। লাভের এই সুযোগ ছাড়ব কেন? তাই কিনতে গিয়েছিলাম। অন্যায় হয়েছে?'

'তা হয়নি। মিস্টার ডিকসন যা চাইলেন, তা দিয়েই আনলেন না কেন তাহলে?' লাভ তো হতই।'

'না, হত না। দাম বাড়াতে বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, বেচে লাভ হত না। তাই আর কিনিনি।'

'কে কিনতে চেয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভিজিয়ে নিলেন ব্যেরাম।

'চাইলেও এখন আর লোকটার কাছে কপিটা বিক্রি করতে পারছেন না, মিস্টার বোরাম,' রবিন বলল।

'সে পাট ঘুচে গেছে। কাজেই এখন বলতে আর অসুবিধে কি?'

'সুমাতো কমিক,' ফাঁদে আটকা পড়েছেন যেন বোরাম, ভাবভঙ্গিতে সে রকমই লাগছে।

'বইটা পেলেন কোথায়?' হুফার জানতে চাইল। 'আমি তো দিইনি।'

হাল ছেড়ে দিলেন বোরাম। বুঝলেন, মিথ্যে বলে সুবিধে হবে না আর। বললেন, 'সুমাতোর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম।'

কিশোর বলল, 'মিস্টার বোরামকে আর বিরক্ত করার দরকার নেই। চলো।'

সারি বেঁধে স্টলটার কাছ থেকে সরে এল ওরা সবাই।

'ভেরি, ভেরি ইনটারেসটিং,' কিশোর বলল, 'ঘরের ইঁদুরেই বেড়া কেটেছে। একটা কোম্পানি, যে কমিকটা বিক্রি করেছে, হঠাৎ করে তারাই আবার ফেরত চাইছে ওটা। অবশেষে জোড়া লাগতে আরম্ভ করেছে এক এক করে। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্নের জবাব, তাহলেই আমাদের চোরটাকে ধরে ফেলতে পারব।' রহস্যময় কণ্ঠে বলল সে। 'আমি এখন জানি, কোথায় খুঁজতে হবে তাঁকে।'

পনেরো

'দাঁড়াও,' কিশোরের হাত ধরে ফেলল মিরিনা। 'আসলে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'যেখান থেকে সমস্ত গোলমালের উৎপত্তি,' জবাব দিল কিশোর। 'সুমাতো কমিকসের খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে।

ভিড়ের জন্যে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। গায়ে গায়ে লেগে যেন মানুষের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে।

'ঢোকা যাবে?' ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'যাবে,' এদিকে তাকিয়ে বলে উঠল একটা ছেলে, লাল হয়ে গেছে চোখ, ঠেলাঠেলি করার পরিশ্রমেই বোধহয়। 'কাল ছিল তিরিশ, আজি নিজে কিনেছি, আজ হয়ে গেছে দশ। এখনি সব বিক্রি শেষ হয়ে যাবে।'

'তারপরেও দাম অনেক বেশি,' নিচু গলায় বলল কিশোর। টেপের কথা

বলছে ছেলেটা। অন্যান্য জিনিসের দামও কমিয়ে দেয়া হয়েছে জানা গেল। কেন? অবাক লাগছে কিশোরের। হঠাৎ করে কেন এভাবে দাম কমাল?

কারণটা জানার জন্যে এগিয়ে গেল সে। ভিড় ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করল। কয়েক মিনিট একটানা মানুষের শরীরের চাপ আর কনুইয়ের গুঁতো খাবার পর বেরিয়ে আসতে পারল প্রাচীরের অন্যপাশে, কাউন্টারের কাছাকাছি। কমিক আর ভিডিও টেপ বিক্রি করে কূল পাচ্ছে না সেলসম্যানেরা। দাম কমে যাওয়ায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে ক্রেতারা। কিনেই চলেছে। সোনালি, শজারুর কাঁটার মত চুলওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'কি দেব?'

'ইয়ে...স্টেলারা স্টারগার্ল!' প্রথম যে নামটা মনে এল বলে দিল কিশোর।

'ভাল জিনিস চেয়েছ। অনেকগুলো আছে আমাদের কাছে, স্পেশাল, এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত। পাঁচ ডলার করে সবগুলোর দাম হয় পঁচিশ,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। 'তবে তোমার জন্যে পনেরো। দশই বাদ, যাও।'

টাকা বের করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। দেয়ার সময় লোকটার হাতের দিকে তাকাল। না, এই লোক ক্রিমসন ফ্যান্টম নয়। আঙুলগুলো মোটা মোটা, খাটো, নখের মাথা কামড়ে কেটে ফেলেছে। হাতের উল্টো পিঠে স্পষ্ট ছাপ দেয়া।

টাকাটা নিয়ে আরেক জনের হাতে দিল সোনালি চুল, দাম রেখে বাকিটা ফেরত দেয়ার জন্যে। টাকা গুনছে দ্বিতীয় লোকটা, কিশোর তাকিয়ে রয়েছে তার হাতের দিকে। নাহ্, ওর হাতেও ছাপ রয়েছে।

'এই যে, নাও, থ্যাংকস,' টাকাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল দ্বিতীয় লোকটা। তারপর তাকাল সহকারীদের দিকে। একজনকে ডেকে বলল, 'ডেভ, স্পেশাল কিছু নিয়ে এসো তো।'

আরেক প্যাকেট স্টেলারা স্টারগার্ল কমিক বের করল ডেভ। 'এগুলো?' দামটা দেখতে পেল কিশোর। দশ ডলার লেখা রয়েছে।

'না, গাধা, এগুলো কি স্পেশাল হলো নাকি? না থাকলে দোকান থেকে নিয়ে এসোগে। আজকেই দরকার।'

আবার ভিড় ঠেলে ফিরে চলল কিশোর। ঢুকতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, বেরোতে তার চেয়ে কিছুটা কম হলো। কি কিনে এনেছে সে, দেখেই হাসতে লাগল মিরিনা।

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, 'পরে তোমার অটোগ্রাফ নিয়ে নেব এগুলোতে, যখন তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে স্টারগার্ল হিসেবে। এখন অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

'অন্য জায়গায়?'

'এখানে সব ফালতু জিনিস বিক্রি করছে সুমাতোরা।' হাতের প্যাকেটটা দেখাল কিশোর, 'এসব জঞ্জাল। তবে দোকানে স্পেশাল কিছু রয়েছে। ভাবছি, ওগুলো এতই স্পেশাল কিনা, যা চুরি করে জোগাড়ের দরকার পড়ে?'

'দেখতে চাও তো? চলো, ভ্যান আছে আমার,' ম্যাড ডিকসন বললেন। 'কিছুক্ষণের জন্যে সেলসম্যানদের ওপর দোকানের ভার দিয়ে যেতে পারব।'

'আমিও যাব,' মিরিনা বলল। সোনালি পোশাকের দিকে তাকাল। 'তবে এই কাপড়ে...'

'নাও,' নিজের গায়ের জ্যাকেটটা খুলে দিল হুফার। 'এটা গায়ে চড়াও। অনেকখানিই ঢাকতে পারবে।'

আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজে নেমে এল ওরা। হুফার, মিরিনা আর ডিকসন উঠলেন সবুজ ভ্যানে। তিন গোয়েন্দা উঠল মুসার ইমপালায়।

'সত্যিই জানো তো দোকানটা কোথায়?' গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানি,' মুসা বলল। 'ডিকসন কি বলল শুনলে না? ওয়েস্টার্নের কাছে, হলিউডে। বলল তো দেখতে পাবই। আমিও একবার দেখেছিলাম মনে পড়ে। বের করে ফেলতে পারব।'

ঠিকই পারল সে। একবারেই। চার তলা একটা পুরানো বাড়ির গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রয়েছে সুমাতো কমিকস। সামনের দিকটায় উজ্জ্বল রঙে দোকানটার বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছে। আর এঁকেছে প্রচুর ছবি। হলুদ' পটভূমিতে ফুটে আছে কমিকের নানা রকম হিরোরা। জাপানী হিরোদের সঙ্গে আমেরিকান সুপারম্যানের লড়াইটা চমৎকার।

হেসে ফেলল রবিন। 'সুমাতো কমিকস যখন, এর চেয়ে ভাল আর কি দেখাতে পারত?'

দুটো গাড়িই পার্ক করে নেমে এল সবাই।

ডিকসন বললেন, 'কমিক জোগাড় যখন শুরু করেছিলাম, তখন প্রায় সারাটা দিনই এখানে কাটাতাম। সব চেয়ে কম দামে বিক্রি করত এরা।'

'আর সব চেয়ে কম ভাড়ায় দোকান পাওয়া যেত তখন,' পাশের মলিন ঘরগুলোর দিকে তাকাল হুফার।

'ওই সময়,' কথার পিঠে আবার বললেন ডিকসন, 'বাড়িটার মাটির তলার দোকানগুলোতে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পেপারব্যাক বই বিক্রি হত। এখন আর দোকান নেই, গুদাম করে ফেলা হয়েছে। আমরা যেটার খোঁজে এসেছি, সেটা ওখানে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সিঁড়িটা চিনি, কিন্তু নামতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি।'

হাসল মিরিনা। হুফারের জ্যাকেটটা খুলতে শুরু করল। 'আমার মনে হয়, ওদের নজর আরেক দিকে সরানর ব্যবস্থা আমি করতে পারব।'

কিভাবে কি করবে দ্রুত একটা ছক ঠিক করে ফেলল কিশোর। কাজ শুরু হলো সেই মত। পরের পাঁচটা মিনিট হুফার, ডিকসন আর কিশোর ঘুরে বেড়াতে লাগল, সাধারণ খরিদ্দারের মত। পাঁচ মিনিট পর পিছু নিল মিরিনা। বাইরে রয়ে গেল মুসা আর রবিন, কোন গণ্ডগোল দেখা দিলে সেটা সামলানোর চেষ্টা করবে।

কনভেনশন হলের তুলনায় অর্ধেক বেচাকেনাও এখানে আশা করেনি কিশোর। তবে যা দেখল, সেটাও আশা করেনি। র‍্যাকে কমিক ঘাঁটাঘাঁটি করছে চারজন কাস্টোমার। উদাস, শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জন সেলসম্যান।

দেয়াল ঘেঁষে প্রচুর বাক্স ছিল, দাগ দেখেই অনুমান করতে পারল কিশোর। মেঝেতে ধুলোর মাঝে মাঝে চারকোণ দাগ, ওসব জায়গায়ও বাক্স ছিল। র‍্যাকেও

বই তেমন নেই। ব্যবসা খারাপ হয়ে এলে কিংবা দোকান বিক্রি করে দেয়ার সময় যে অবস্থা হয় সে রকম লাগছে। তবে বেশি তাড়াহুড়া যেন করেছে মালিক।

ঘুরে তাকিয়ে ডিকসনের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। দোকানের পেছনের অংশে একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। দোকান খালি হয়ে যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে ওদের। অনেক বাক্স সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খোলা হয়েছে, বই বের করে নিয়ে বাক্সগুলো ওখানেই ফেলে রেখেছে। র‍্যাকের কমিক দেখার ভান করতে করতে ওখানে চলে এল কিশোর। হুফারও এল।

খুলে গেল সামনের দরজা, ভেতরে ঢুকল মিরিনা। পোশাকের মতই মুখেও হাসি ঝলমল করছে। কনভেনশন হলে যেভাবে আকৃষ্ট করেছে মানুষকে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সব কটা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

'এই-ই সুযোগ। মাটির নিচের ঘরে ঢোকার দরজাটা আস্তে করে খুলে ফেললেন ডিকসন। ঢুকে পড়ল তিনজনে। ধুলো পড়া চল্লিশ ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বলছে সিঁড়িতে, আলো-আঁধারি তৈরি করেছে।

নিচে নেমে সুইচবোর্ডটা খুঁজল কিশোর। পেল না। সিঁড়ির আলো আবছা ভাবে আসছে এখানে, তাতে ভাল করে জিনিসপত্র চোখে পড়ে না। তবে দেখার তেমন কিছু আছে বলেও মনে হলো না। কয়েকটা ছোট ছোট বাক্স আর খুলে রাখা কোন মেশিনের কিছু যন্ত্রপাতি বাদে।

যন্ত্রাংশগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এরকম জিনিস দেখেছে কোথাও আগেও। কোথায়? ধীরে ধীরে স্মৃতিতে স্পষ্ট হলো। দেখেছে ওদেরই স্যালভিজ ইয়ার্ডে। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ছাপাখানা থেকে কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা। 'কি মেশিনের জানেন?' ফিসফিস করে বলল সে, 'পুরানো অফসেট প্রিন্টিং মেশিন। কিন্তু কি ছেপেছে ওরা এই মেশিন দিয়ে?'

সামনে পা বাড়াতেই পায়ে লাগল দলামোচড়া করে ফেলে রাখা কাগজ। লাথি লেগে কাগজের বলটা ছুটে গেল হুফারের দিকে। তুলে নিল সে। টেনেটুনে সমান করল কাগজটা। দেখে বলল, 'এই ম্যাড, জানেন এটা কি?'

সাদা-কালোয় ছাপা হয়েছে কাগজটাতে।

ডিকসনও দেখে চিনতে পারলেন। 'জানব না কেন? আগে খবরের কাগজে সাদা-কালোয় ছাপা হত কমিক। বইও ছাপত। এই পাতাটা নিশ্চয় পঞ্চাশ বছরের পুরানো।'

'আমার মনে হচ্ছে নতুন,' পাতাটা দেখিয়ে বলল হুফার। 'পুরানো হলে হলুদ হয়ে যেত, কিনারগুলো হত ফাটা ফাটা। খোলার সময় মুড়মুড় করে ভেঙে যেত।'

'এখন বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল, 'স্পেশাল জিনিস বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে।'

'ভাল কথা,' বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'এখন বলো তো, তোমাদের নিয়ে কি করা যায়?'

সিঁড়ির দিকে তাকাল ওরা। আবছা আলোয় তিনটে মূর্তিকে দেখা গেল। নেমে আসতে লাগল একজন। তাকে চিনতে পারল কিশোর। কনভেনশন ফ্লোরের সেই বিশালদেহী দারোয়ান।

'মনে করেছিলাম,' লোকটা বলল, 'তোমার কালো বন্ধুটা উড়াল দিয়ে পুলে নামার পর থেকেই সাবধান হয়ে যাবে। হলে না। ঘুরঘুর করতেই থাকলে, যাকে পেলে তাকেই প্রশ্ন করলে, আরও সহকারী জোগাড় করলে, শেষমেষ এখানেও এসে হাজির হলে। আশা করি, চেঁচামেচি করার কথা ভাবছ না। লাভ হবে না। দোকানটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা। দেয়ালগুলোও অনেক পুরু। বাইরে থেকে শোনা যাবে না।'

'নরিস,' বলল একজন সেলসম্যান, কণ্ঠে অস্বস্তি, 'কি করব এদের?'

'হ্যাঁ,' লোকটার সঙ্গে গলা মেলাল কিশোর, 'কি করা হবে আমাদের? নরিস, জানলেন কি করে আমরা এখানে আসছি?'

'ওই বোরাম ছাগলটা লাফাতে লাফাতে এল বসের কাছে, তোমরা নাকি নানা রকম কথা জিজ্ঞেস করেছ, এটা বলার জন্যে। সে আন্দাজ করে ফেলেছিল, তোমরা এখানে আসছ। হাসল নরিস। 'তারপর আর কি? আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল তোমাদের তিন গাধাকে ধরার জন্যে।'

অন্ধকারে ভালমত আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, ভাবল কিশোর। ডিকসন আর হুফারকে মুসা আর রবিন বলে ভুল করছে ব্যাটা। 'ও, লুই মরগানের হয়ে অনেককেই ধরতে যান তাহলে আপনি,' বলতে বলতে তার দিকে এগোল সে। আলোয় বেরিয়ে এল। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে নেড়ে ইশারা করল ডিকসন আর হুফারকে, যাতে না এগোয়।

'এখন আমার মনে পড়ছে,' বলছে কিশোর, 'মুসা যখন ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়েছিল, তখন আপনি ছিলেন না গেটে পাহারায়। আপনার জায়গায় বসেছিল যে মেয়েটা হাতে সিল দেয় সে। ছুটি ছিল নাকি তখন আপনার? নাকি ছুটি দেয়া হয়েছিল আইজাক হুফারের ঘরে ঢোকার জন্যে?'

ভয় পাচ্ছে কিশোর, তার কথা শুনে লোকটা মেজাজ না খারাপ করে বসে। সময় চাইছে সে। দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। যাতে মুসা আর রবিন চলে আসার সময় পায়। ওপরে মিরিনারই বা কি হলো?

'ডিনারের সময়ও আপনি ছিলেন ওখানে,' কথা থামাল না কিশোর। 'বোরাম আর হুফার যখন হাতাহাতি শুরু করলেন, তাঁদের ছাড়াতে গেলেন। কেন? পরে সুযোগ করে গিয়ে হুফারকে শেষ করে দেয়ার জন্যে? নাকি বোরাম যে কাজটা করতে চেয়েছিলেন, সেটা করার জন্যে? বেচারা হুফারকে দুরমুজ করার জন্যে?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল নরিস। 'এতক্ষণে বুঝলাম, তোমাদের নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন বস্। মাথাটা বড় বেশি পরিষ্কার তোমাদের। অনেক কিছুই বুঝে ফেল।'

'তবে সব বুঝতে পারি না। আমি ভেবেছিলাম, আপনিই বুঝি ক্রিমসন ফ্যান্টম সেজেছেন। পরে বুঝলাম, আপনি না। আপনার হাতের আঙুল বেশি মোটা, প্রায় চাঁপাকলের মত।' সময় ফুরিয়ে আসছে, বুঝতে পারছে কিশোর। নরিস আর তার দুই সহকারী আর বেশিক্ষণ থাকবে না এখানে, কাজ সেরে সরে পড়তে চাইবে।

'চাঁপাকলা, না?' রাগ প্রকাশ পেল নরিসের কণ্ঠে। 'চাঁপাকলার গাট্টা খাওনি

তো মাথায়, খেলে বুঝতে পারবে!'

বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হলো কিশোর। 'বেশি আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছেন না? আমি একা নই। আপনারাও তিনজন, আমরাও তিনজন।'

আবার হাসল নরিস। বেরিয়ে পড়ল ভাঙা দাঁত, ম্লান আলোতেও দেখতে পেল কিশোর। 'তাতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের তিনজনকে একাই কাবু করে ফেলতে পারি...'

কথা শেষ করল না সে। পেছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এল। হাতে একটা বেসবল ব্যাট। ব্যাটের মোটা অংশটায় চাপড় দিল বাঁ হাতে।

ভয় পাচ্ছে তার দুই সহকারী। ওরাও হাত সামনে আনল। দু'জনের হাতেই একটা করে ব্যাট।

নরিসের ইঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল তারাও।

ষোলো

মুঠো শক্ত করল কিশোর। লড়াই না করে কিছুতেই ধরা দেবে না। হেরে গেলে যাবে, সে পরে দেখা যাবে। কোনমতে নরিসকে কাবু করে ফেলতে পারলেই হলো, বাকি দু'জন আর এগোবে না। লেজ তুলে দৌড় দেবে, বোঝাই যায়। নিজের ইচ্ছেয় আসেনি ওরা, নিশ্চয় জোর করে নিয়ে এসেছে নরিস।

তবে বিশালদেহী লোকটাকে কাবু করা অত সহজ নয়। গায়ে যে শুধু মোষের জোর তাই নয়, কি করে ব্যাট ব্যবহার করতে হয়, তা-ও জানে। ধরার কায়দা দেখেই অনুমান করা যায়। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, পেছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে তার দুই সহকারী।

সমস্ত দুশ্চিন্তা আর ভয় জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল কিশোর। জুডো ক্লাসে শেখানো হয়েছে এটা করতে। শত্রুর ওপর কড়া নজর, প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে ভারি দম নিতে লাগল।

কাছে আসতে নরিসদের আরও অর্ধেক পথ বাকি, এই সময় সিঁড়ির মাথায় আরও দুটো মূর্তি চোখে পড়ল কিশোরের।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিল সে, 'মুসা, এই সামনের লোকটাই তোমাকে ঘুসি মেরেছিল! পুলে ফেলে দিয়েছিল!'

হেসে উঠল নরিস। 'ওসব পুরানো কৌশল অনেক দেখা আছে আমার। আমি তাকাচ্ছি না পেছনে।'

ওরা কথা বলছে, এই সুযোগে নিঃশব্দে নেমে চলে এল রবিন আর মুসা। ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই সেলসম্যানের ওপর। একটা লোকের কানের সামান্য নিচে ঘাড়ের ওপর কারাতে কোপ মারল রবিন। টুঁ শব্দ করতে পারল না লোকটা। হাত থেকে ব্যাট খসে পড়ল। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সে।

অন্য লোকটার ব্যাট ধরা হাতটা চেপে ধরে মুচড়ে পেছনে নিয়ে এল মুসা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ব্যাট কেড়ে নিল বিস্মিত লোকটার হাত থেকে। তারপর সেটা দিয়ে আক্রমণ করল নরিসকে।

'বোঝাপড়াটা এই ব্যাটের সঙ্গেই হবে আমার,' বলল সে।

চমকটা সামলে নিতে সময় লাগল না নরিসের। চিৎকার করে উঠে ব্যাট তুলল সে, বাড়ি মারল মুসার মাথা সই করে। সেটা ঠেকানোর জন্যে ব্যাট তুলল মুসা। ঠেকালও। তবে ব্যাটটা ধরে রাখতে পারল না, ছুটে গেল। সে যে লোকটার কাছ থেকে ব্যাট কেড়ে নিয়েছিল সে-ও এগিয়ে এল ওকে ধরার জন্যে। রবিন বাধা দিল তাকে।

মুসার দিকে যেই নজর দিয়েছে নরিস, অমনি লাফ দিয়ে আগে বাড়ল কিশোর। তবে টের পেয়ে গেল সেটা বিশালদেহী লোকটা। মুসাকে বাড়ি মেরে তার হাত থেকে ব্যাট ফেলে দিয়েই ঘুরল, সই করার সময় পেল না, কিশোরকে আসতে দেখেই বাড়ি মারল।

ঠিকমত লাগাতে পারল না। ব্যাটের মাথা কিশোরের মুখ ছুঁয়ে গেল। তারপর গিয়ে লাগল পুরানো কাঠের রেলিংটাতে। মড়াৎ করে কাঠ ভাঙার আওয়াজ হলো। আরেক কদম এগোল কিশোর। এক হাতে ব্যাট আটকানোর চেষ্টা করতে করতে আরেক হাতে কব্জি চেপে ধরল নরিসের।

কিন্তু ভারি শরীর দিয়ে ধাক্কা মেরে কিশোরকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল সে। রেলিঙে লেগে ব্যথা পেল কিশোর, উফ্ করে উঠল। কব্জি থেকে আঙুল ছুটে গেল। রেলিং আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল।

ব্যাটটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠল নরিস। আবার ঘুরল মুসা আর রবিনকে বাড়ি মারার জন্যে। ওদের চিত করেই ঘুরবে কিশোরকে কাবু করার জন্যে।

ওদেরকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে আবার ঘুরল কিশোরের দিকে। কিন্তু ওকে যেখানে আশা করেছিল, সেখানে পেল না। তার পরেও বাড়ি মারল। ব্যাটের নিচ দিয়ে ডাইভ দিল কিশোর। মাথা নিচু করে উড়ে এসে পড়ল নরিসের ওপর। মাথা দিয়ে ভীষণ জোরে গুঁতো মারল পেটে।

হুঁক করে উঠল লোকটা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর। দু'দিক থেকে তাকে ধরে ফেলল মুসা আর রবিন। সাংঘাতিক জোর লোকটার গায়ে। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে, তবু দু'জনের ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাড়া দিয়ে মুক্ত করে নিল নিজেকে। শুধু মুক্ত করেই ক্ষান্ত দিল না, পাশে ঘুরে ঘুসি মারল রবিনের ঘাড়ে।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলেই ঝাঁপ দিল মুসা। গড়াতে গড়াতে পড়ল নরিসকে নিয়ে। গড়ানো থামল যখন, সে থাকল ওপরে।

কাহিল হয়ে পড়েছে নরিস। তাকে টেনে দাঁড় করাল মুসা। হেসে বলল, 'তোমার ঘুসিতে দারুণ শক্তি, জানা হয়ে গেছে আমার। এবার দেখ তো, আমারটা কেমন লাগে?'

বলেই মেরে বসল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সেলসম্যানকে কাবু করে ফেলেছে কিশোর। দু'জনেই বসে পড়েছে সিঁড়ির ওপর। হাঁপাচ্ছে পরাজিত কুকুরের মত। মারপিটের বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আর নেই ওদের।

'দারুণ, বুঝলে!' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোরকে বলল রবিন, 'শেষ মারটা

বড় চমৎকার দিলে। কি মার? জুডো?'

মাথা ডলছে কিশোর। 'ছাই!' একজায়গায় ফুলে উঠেছে, সেখানে আঙুলের চাপ দিয়েই উফ্ করে উঠল। 'ছাই হোক আর যা-ই হোক, কাজ হয়েছে,' নরিসের ওপর প্রতিশোধ নিতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছে মুসা। 'তোমাদেরকে মারতে এল কেন?'

সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। শুনেটুনে মুসা বলল, 'ভাল। পুলিশকে খবর দেব?'

'তাতে এই তিনটেকে জেলে ভরতে পারব বটে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু গভীর জলের মাছটা ফসকে যাবে। লুই মরগানকে আটকাতে পারব না আমরা।'

'কেন নয়? জালিয়াতি যে করেছে এটা তো ঠিক?'

'কমিক বুক জালিয়াতি,' হুফার বলল, 'এই অপরাধে জেলে ঢোকানো যাবে বলে মনে হয় না। উকিলই ভাল বলতে পারবে।'

'কিন্তু আইন তো ভঙ্গ করেছে সে?'

'পাবলিশিং কপিরাইট অমান্য করেছে, এটা বলা যায়,' কিশোর বলল। 'এধরনের অপরাধে লোকের শাস্তি হয় বটে, তবে জেলে যায় না। জরিমানা টরিমানা দিয়েই খালাস পেয়ে যায়।'

'শহর ছেড়ে চলে যাবে সে,' ডিকসন বললেন।

'দেশ ছেড়েও চলে যেতে পারে,' বলল কিশোর। 'তাহলে জরিমানাও দিতে হবে না। দেখি, আগে জেনে নিই, কি ধরনের শয়তানি চলছিল এখানে। তারপর বুঝেশুনে কিছু একটা করা যাবে।'

ধমক দিতেই যা জানে গড়গড় করে বলে দিল এক সেলসম্যান। এখানে, এই মাটির নিচের ঘরে কমিক বই ছেপে নকল জিনিসটা আসল বলে ধরিয়ে দেয়া হত সংগ্রাহকের হাতে।

'ভাল আয় করেছে,' হুফার বলল। 'শ' খানেক কমিক ছাপতে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে বড় জোর হাজার দুয়েক ডলার লাগে। প্রতিটি বই কম করে হলেও পঞ্চাশে গছাতে পারবে বোকা সংগ্রাহকগুলোকে। তাতে লাভ থেকে যাবে তিন হাজার। সোজা কথা নয়। লেখক কিংবা আর্টিস্টকে কমিশনের জন্যে একটা পয়সাও দিতে হবে না। লাভ সবটাই নিজের পকেটে পুরতে পারবে প্রকাশক।'

'কিন্তু সব কিছু বন্ধ করে দিচ্ছে মরগান,' কিশোর বলল। 'প্রেসও বন্ধ করে দিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়ার মতলব। তারমানে আরও কোন ব্যাপার আছে।' একজন সেলস-ম্যানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, বলুন তো?'

'আরেক ফন্দি করেছে,' লোকটা বলল। 'এবারে কালারে ছাপবে।'

'কালার?' ভুরু কোঁচকাল হুফার। 'তাতে তো অনেক খরচ। একশো ছাপতেই বেরিয়ে যাবে বারো হাজার। চুরি করে ছাপতে গেলে অন্য প্রেস থেকে তো আর পারবে না, নিজেকেই করতে হবে সব কিছু। এসটাবলিসমেন্ট কস্ট অনেক। এত টাকা পাবে কোথায়?'

'তাইওয়ান,' সিঁড়ির গোড়া থেকে জবাব দিল নরিস। হাত-পা বাঁধা হয়ে বসে আছে। চারপাশে তাকাল বিরক্ত চোখে। 'ওরই মত আরেক শয়তান প্রিন্টারের

সঙ্গে ওখানে যোগাযোগ হয়েছে মরগানের, চুক্তিও করেছে। ওখানে ছেপে চোরাচালান হয়ে চলে আসবে আমেরিকায়। আপাতত চিনামাটির জিনিসের বাক্সে করে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মরগান। পুরো উপকূলে ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে তার। আমাদের সবাইকে ব্যবসায় লাগাবে বলে লোভ দেখিয়েছিল। টাকার অঙ্ক হিসেব করে দেখিয়েছিল। রাজি না হয়ে পারিনি।'

'এখন আর কি,' কিশোর বলল, 'জেলে গিয়ে পচুনগে। বেশি লোভ করলে এরকমই হয়।'

সেলারেই তিনজনকে বেঁধে ফেলে রেখে বেরিয়ে এল ওরা। দোকানের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। গাড়িতে বসে আছে মিরিনা। এরকম একটা পরিবেশে এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না ওর। ওদের দেখে অস্বস্তি দূর হলো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কি তোমাদের? সব ভাল? চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে বের করে দিল সেলসম্যানগুলো। চুরি করে ঢুকতে হয়েছে তখন মুসা আর রবিনকে।'

'আমরা ভাল।' কি কি ঘটেছে মিরিনাকে জানাল কিশোর। 'এখন গিয়ে মরগানকে ধরতে হবে, পালানোর আগেই।'

'কি করে আটকাব?' মুসার প্রশ্ন।

'ডাকাতির অভিযোগে,' সমাধান দিল রবিন। 'যদি কোনভাবে ওটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারি ওকে, চোরাই কমিকগুলো খুঁজে বের করতে পারি, তাহলেই হবে।'

সন্তুষ্ট হতে পারল না মিরিনা। বলল, 'অনেকগুলো "যদি" এসে যাচ্ছে।'

কনভেনশনে ফিরে কোলাহল আর লোকের হুড়োহুড়ি যেন জোর একটা ধাক্কা মারল ওদের। আশা করেছিল, সুমাতো কমিকের মতই এখানেও দেখবে ভাঙা মেলা, লোকজন কম, সবাই পোঁটলাপুঁটলি গোছগাছ করে বাড়ি ফেরার তোরজোর করছে।

দুই রঙা চুলওয়ালা মেয়েটার শোচনীয় অবস্থা। কুলিয়ে উঠতে পারছে না আর বেচারি। একই সাথে দুটো কাজ করতে হচ্ছে। হাতে সিলও মারতে হচ্ছে, দারোয়ানের কাজও করতে হচ্ছে। ফুরসত পেলেই তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, নিশ্চয় নরিসকে দেখার আশায়। নরিস যে আর ফিরবে না, জানলেই মুষড়ে পড়বে মেয়েটা, তাই তাকে কিছু বলল না কিশোর।

'এবার?' কনভেনশন ফ্লোরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমাদেরকে দেখে ফেলার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,' মুসা বলল। 'গরিলাটাকে পাঠিয়েছে আমাদেরকে বন্দি করার জন্যে। এখন আমাদেরকে ঘুরঘুর করতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে।'

'ঠিক,' একমত হয়ে বলল কিশোর। 'মরগানকে খুঁজে বের করতে হবে, চোরাই কমিকগুলোও বের করতে হবে।'

'এই তো, পেলাম,' শোনা গেল বাজখাই কণ্ঠ। মোটা শরীর দিয়ে ধাক্কা মেরে ভিড় সরাতে সরাতে এগিয়ে এল ডফার। 'খুব উত্তেজিত লাগছে! ব্যাপারটা কি?'

খপ করে তার হাত চেপে ধরল হুফার। 'এড, মরগানকে দেখেছ?'

হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ডুফারের। দাড়ি নেড়ে বলল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছি! খুব উত্তেজনা। হয়েছেটা কি? আবার কিছুতে হাত দিল নাকি?'

সে হাসছে, আর কিশোর ভাবছে মরগানের হাতের কথা। ডাকাতির পর পর হাজির হয়েছে লোকটা, লম্বা আঙুলওয়ালা পাতলা হাতজোড়া ডলতে ডলতে। ওই হাতের উল্টো পিঠে সিল ছিল না। কনভেনশন বস্ হিসেবে তার টিকেট লাগে না।

'মরগানের হাত ডাকাতটার হাতের সঙ্গে মিলে যায়,' কিশোর বলল, 'ওর হাতেও কোন সিল নেই। আমার বিশ্বাস, ডাকাতিটা সে-ই করেছে। কিন্তু দু'জন লোক তাকে গোল্ড রুমে যেতে দেখেছে, ডাকাতির সময়।' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। ভাবছে।

'আমি তাকে গোল্ড রুমে দেখেছি,' ডুফার বলল। 'ঘরে ঢুকে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল প্রোজেকশনিস্ট তখনও আসেনি বলে। সে নিজেই প্রোজেকটরটা চালানর চেষ্টা করল, পারল না। যন্ত্রটা এমনকি পর্দার দিকেও সেট করা ছিল না, যে ছবি ফেলা যাবে। মজার কাণ্ড করেছে। ওটাকে চালানোর জন্যে ব্যাগ ব্যবহার করেছে সে।'

'ব্যাগ? কিসের ব্যাগ?' জানতে চাইল কিশোর।

শ্রাগ করল ডুফার। 'কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ছিল। এই কনভেনশনের অর্ধেক লোকের কাঁধেই ওরকম ব্যাগ আছে।'

মুসা বলল, 'কিন্তু আমাদের সাথে যখন দেখা হলো, তখন ছিল না।'

রবিন যোগ করল, 'আর সেটা ডাকাতির বেশি আগেও নয়।'

'আসল কথা হলো,' কিশোর বলল, 'কি ছিল ব্যাগটার ভেতর?'

'তোমার কি মনে হয়?' মিরিনার প্রশ্ন। 'কসটিউম?'

'হতে পারে,' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কিন্তু সময়ের ব্যাপারটা মিলছে না। পোশাক খুলে এত তাড়াতাড়ি গোল্ড রুমে পৌছল কি করে?'

'ভাল প্রশ্ন,' মুসা বলল।

'গোল্ড রুমে দেখা দরকার। এসো।'

দল বেঁধে রওনা হলো সবাই। কনভেনশন ফ্লোর থেকে বেরিয়ে প্রথমে বাঁয়ে মোড়, তারপর আরেকবার বাঁয়ে মোড় নিতে লম্বা একটা করিডর পড়ল।

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?' হুফার বলল, 'কনভেনশন ফ্লোরে এদিক দিয়ে যাওয়ার পথটা বড় জটিল। বেশি ঘোরপ্যাচ।'

শেষ মাথায়, ডানে গোল্ড রুমের প্রবেশ পথ। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আসছে জমজমাট বাজনা। চিৎকার করল একটা মহিলা কণ্ঠ, গান নিয়ে একটা মন্তব্য করল।

বাঁয়ে আরেকটা দরজা, তাতে ডোরনব নেই। ঠেলা দিল কিশোর। নড়ল না পাল্লা। 'এটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?' নিজেকেই যেন করল প্রশ্নটা।

'ওটা একটা ইমারজেন্সি একজিট,' ডুফার বলল। 'জরুরি অবস্থায় বেরোনোর পথ। এর অন্য পাশেই কনভেনশন ফ্লোর।'

দরজায় কান পেতে ওপাশে অসংখ্য মানুষের নড়াচড়া আর কোলাহল শুনতে

পেল কিশোর। চকচক করে উঠল চোখ। 'তাহলে এই ব্যাপার। এটা দিয়ে সহজেই কনভেনশন ফ্লোর থেকে ডাকাতি করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ক্রিমসন ফ্যান্টম'। মিস্টার ডিকসনের দোকান থেকে খুব কাছেই হবে মনে হয়।'

'তার পরেও কথা থাকে,' প্রশ্ন তুলল ডুফার। 'কাপড় বদলাল কোথায় সে?'

'যেখানে ডাকাতি করেছে সেখানেই,' জবাব দিল কিশোর। 'পোশাক বদলের ঘর তো ওখানেই তৈরি করে নিয়েছিল। ধোঁয়া। ধোঁয়ার মধ্যেই কাজটা সেরেছিল।' মিরিনার দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ধোঁয়ার ভেতরে তাকিয়ে কি দেখতে পেয়েছিলে তুমি, বলো তো আবার?'

শ্রাগ করল মিরিনা। 'এক ঝলক লাল। মনে হলো কাঁধের ওপর। ধোঁয়ার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন সে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কোন দিকে গিয়েছিল?'

ভেবে নিল মিরিনা। 'তখন তো মনে হয়েছিল, মানে আমি ভেবেছি আরকি, সামনের দরজার দিকেই গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এই দরজাটার দিকেও আসতে পারে।'

হাসল কিশোর। 'লাল ঝিলিকের মানে হতে পারে, তখন ওটা খুলে ফেলছিল মরগান, ব্যাগে ঢোকানোর জন্যে। কমিক ভরে আনতে যে ব্যাগটা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল।'

ডুফার বলল, 'কিন্তু ডাকাতির আগের ক্ষণে যে তাকে আমি গোল্ড রুমে দেখেছি...'

বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'তা দেখেননি। ডাকাতির খবর শোনার আগের মুহূর্তে তাকে দেখেছেন, ডাকাতি হওয়ার আগের ক্ষণে নয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ডুফার। 'তাই তো! এটা তো হতেই পারে...হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি...বুঝতে পারছি...'

'আমি পারছি না,' মুসা বলল।

'সামনের দরজা দিয়ে ডাকাতির খবরটা বাইরে বেরোতে মিনিট দুই লেগে গেছে,' বুঝিয়ে দিল রবিন।

'ঠিক।' কিশোর আরও ব্যাখ্যা করে বোঝাল, 'পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মরগান, খবরটা হলরুম থেকে বাইরে বেরোনোর আগেই। ছুটে চলে এসেছিল গোল্ড রুমের কাছে। যাতে তাকে লোকে দেখতে পায়, অ্যালিবাই তৈরি হয়, তাকে সন্দেহ না করতে পারে কেউ।'

থামল কিশোর। এক আঙুল তুলল। আর একটা ছিন্ন সূত্র রয়ে গেল: সাথে করে ব্যাগটা গোল্ড রুমে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ভাবছি, এখনও প্রোজেক্টরের গায়ে কোথাও ঝুলছে না তো?'

ডুফার বলল, 'গিয়ে দেখলেই তো হয়।'

'সব চেয়ে ভাল হয়,' কিশোর বলল, 'মরগান যদি যায়। গিয়ে বের করে ওটা। এক কাজ করা যাক। প্রোজেকশনিস্টকে দিয়ে একটা খবর পাঠানো যাক তাকে।'

'প্রোজেকটর চালাচ্ছে এখন পিটার, আমার বন্ধু,' ডুফার বলল। 'ওই যে,

আমাদের পাশে বসে খাচ্ছিল যে লোকটা সেদিন।'

'বুঝতে পেরেছি,' কিশোর বলল। 'তাকে দিয়ে কিছু করানো যায় না?'

'খবর পাঠাতে চাও তো? যাবে। কি বলতে হবে?'

'প্রোজেকটর ভীষণ গরম হয়ে গেছে, আগুন লেগে যেতে পারে,' হাসল কিশোর, 'এরকম কিছু?'

সতেরো

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গোল্ড রুমের দরজা। নাছোড়বান্দা কিছু কমিকের ভক্তের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আলো। টেরই পেল না ওরা। গভীর ঘুমে অচেতন। যারা জেগে রয়েছে তারা তাকিয়ে রয়েছে পর্দার দিকে। আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠল দু'চারজন, 'এই, বন্ধ করো! দরজা বন্ধ কর!'

পর্দায় তখন মাকম্যানের রাজা গুঙের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়ছে রক অ্যাসটারয়েড।

দর্শকদের আপত্তির পরোয়াই করল না দরজায় দাঁড়ানো লম্বা মানুষটা। সোজা এগোল প্রোজেকটরের দিকে। যাওয়ার সময় ঘষা লাগল পিটারের গায়ে। টেবিলে রাখা ক্যানভাসের ব্যাগটা ধরে টান দিল নিজের দিকে। একপাশে সরে গেল প্রোজেকটর, আলো অর্ধেক পড়ছে এখন পর্দায়, বাকি অর্ধেক বাইরে।

দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে রে গান বের করছে রক, কিন্তু যার উদ্দেশে বের করেছে, সেই শত্রুই গায়েব। আলো অর্ধেক সরে যাওয়ায় বাইরে পড়ে গেছে গুঙ।

'অ্যাই, কি হলো? ছবির কি হলো?' চিৎকার করে উঠল কয়েকজন দর্শক। এমনকি যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও জেগে উঠে চেঁচামেচি শুরু করল। লোকটা যখন টান দিয়ে প্রোজেকটরের নিচ থেকে ব্যাগটা বের করল, তখন চিৎকার চরমে উঠেছে। কারণ প্রোজেকটরের আলো তখন পর্দা থেকে এতটাই নিচে নেমে গেছে, রক আর গুঙের কেবল মাথাটা দেখা যাচ্ছে। রকের হেলমেট আর গুঙের মাথার অ্যান্টেনা এপাশ ওপাশ করছে প্রোজেকটরের আলো নড়ার সাথে সাথে।

চেঁচামেচিতে ছবির শব্দই শোনা যায় না। কয়েকজন ভক্ত চেঁচিয়ে উঠল যারা চিৎকার করছে তাদেরকে চুপ করানোর জন্যে। তাতে চিৎকার বাড়লই শুধু, কমল না।

সব চিৎকারকে ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার, 'অ্যাই, তোমরা চুপ করবে! কিচ্ছু তো শুনতে পাচ্ছি না!'

নিঃশব্দে এগিয়ে এল ওরা সাতজন, ঘিরে ফেলল টেবিলের কাছে দাঁড়ানো মানুষটাকে। এই সাতজন হলো তিন গোয়েন্দা, ম্যাড ডিকসন, আইজাক হুফার, এডগার ডুফার আর মিরিনা জরডান। আবছা আলোতেও স্পষ্ট চেনা গেল লুই মরগানকে।

ব্যাগটা হাতে আঁকড়ে ধরে একটা মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মরগান। তারপর শ্রাগ করে ব্যাগ থেকে বের করলেন ছোট একটা বল।

'থামুন!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। কিন্তু ততক্ষণে বলটা মেঝেতে পড়ে

গেছে।

ঘন ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। চিৎকার করে বললেন মরগান, 'আগুন! আগুন!'

আসল ভক্তেরা কথাটা কানেই তুলল না। ছবি ঠিক করতে বলছে পিটারকে। ধোঁয়া বাড়ছে, তাতে ঠিক করা ক্রমেই মুশকিল হয়ে উঠছে। যারা একটু কম ভক্ত, তারা গোয়েন্দাদের দলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। এই সুযোগটা কাজে লাগালেন মরগান। আক্রমণ করে বসলেন মিরিনাকে। ব্যাগ ঘুরিয়ে বাড়ি মারতে গেলেন।

বাড়ি লাগল না, ধাক্কায়ই টলে উঠে পিছিয়ে গেল মিরিনা। তার পাশ কাটিয়ে খোলা দরজার দিকে দৌড় দিলেন মরগান।

পড়ে যাচ্ছিল মিরিনা, কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে আটকাল কিশোর। চিৎকার করে বলল অন্যদেরকে, 'আসুন! জলদি!'

দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরোল ওরাও। হলের অর্ধেক পেরিয়ে গেছেন ততক্ষণে মরগান। সামনে কেউ পড়লে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন। পিছু নিল তিন গোয়েন্দা। সামনে একটা ছেলেকে দেখে সোজা ঘুসি মেরে বসলেন মরগান, সরানর জন্যে। চরকির মত পাক খেয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেল ছেলেটা।

লবিতে বেরোলেন মরগান। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ছুটলেন, লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে, কনুইয়ের গুঁতো মেরে সরিয়ে। সাধারণত যেদিক দিয়ে বেরোনর কথা—সামনের দরজা কিংবা এলিভেটরের দিকে না গিয়ে যাচ্ছেন অন্য দিকে।

বুঝে ফেলল কিশোর। 'সিঁড়ি! লোহার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছেন তিনি!'

আগে চলে গেল মুসা। দ্রুত কমে আসছে তার আর মরগানের মাঝের দূরত্ব। অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকে।

মোড়ের কাছে গিয়ে যেন ব্রেক কষলেন মরগান। পরক্ষণেই ঘুরে গেলেন সিঁড়ির দিকে। একটু পরেই দড়াম করে সিঁড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।

হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে ফেলল মুসা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে এসে ঢুকল কিশোর আর রবিন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

'মুসা,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'সোজা তোমার গাড়িতে গিয়ে উঠবে। মরগানকে ধরার চেষ্টা কোরো না!' আগের বার কিভাবে ওদের দৌড়ে পরাজিত করে দিয়েছিলেন কনভেনশন চীফ, মনে আছে তার।

পার্কিং গ্যারেজে নেমে এল ওরা। ওরাও নামল, মরগানও উঠে পড়লেন লাল একটা করভেট গাড়িতে।

ইমপালার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। মুসা ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে চলতে শুরু করল করভেট, ঘুরে রওনা হয়ে গেল এক্‌জিট র‍্যাম্পের দিকে। এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে গাড়িটার পিছু নিল মুসা।

'খোলা রাস্তায় যদি চলে যায়,' বলল সে। 'তাহলে আর ধরতে পারব না। ওর গাড়ির ধুলো খাওয়া ছাড়া তখন আর কিছুই করার থাকবে না আমাদের।'

কিন্তু থামাবেই বা কি করে লোকটাকে? র‍্যাম্পে যেতে কোন বাধা নেই।

তারপর, হঠাৎ করেই কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল টায়ার। দেখা গেল, একটা থামের আড়াল থেকে বেরোচ্ছে ম্যাড ডিকসনের সবুজ ভ্যান। মরগানের গাড়ির পথরোধ করতে ছুটল একচোখা সাইক্লপস।

গতি বাড়াল করভেট। শাঁই করে একপাশে কেটে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সাইক্লপসকে। পুরোপুরি পারল না। ধ্রাম করে এসে ওটার পেছনের ডান ফেণ্ডারে গুতো মারল সবুজ ভ্যান।

থামলেন না মরগান। গতিও কমালেন না। ভাঙা ফেণ্ডার বিচিত্র শব্দ তুলছে।

কয়েক জায়গায় রঙ চটে গেল সাইক্লপসের। কেয়ারই করল না। তীক্ষ্ণ মোড় নিতে গিয়ে কাত হয়েই আবার সোজা হলো। দুলে উঠল একবার। থামল না। করভেটের লেজে লেগে রইল। কাছাকাছি চলে এল ইমপালা।

সেঞ্চুরি বুলভারে বেরিয়েই গতি বাড়াল করভেট। যানবাহনের ভেতর দিয়ে পথ করে ছুটতে গিয়ে যেন মাতালের মত দুলছে। খানিক পর পরই কিঁইচ কিঁইচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার। রাস্তায় ঘষা লেগে জ্বলে যাচ্ছে। ডানের ফেণ্ডারটা চেপে লেগে রয়েছে চাকার সঙ্গে, ক্ষতি করে চলেছে টায়ারের।

মুসার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয়নি। গতি বাড়িয়ে ওদেরকে ধুলো খাইয়ে সরে পড়তে পারেননি মরগান। গতি বাড়ালেই মাতাল হয়ে যায় গাড়ি, নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় আছে এভাবে চললে। গতি কমাতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। আশা হলো তিন গোয়েন্দার। ধরার সুযোগ আছে!

করভেটের পেছনে লেগেই রয়েছেন ডিকসন। গালাগাল করছে অন্যান্য ড্রাইভাররা, সরতে বলছে, কানেই তুলছেন না তিনি। থ্রী লেনের দিকে ঘুরে গেল মুসা। সামনে দিয়ে গিয়ে করভেটকে আটকানোর চেষ্টা করল।

আরেকবার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেন মরগান। আবার বাধা দিল আহত ফেণ্ডার। পেছনের বাম্পারে গুঁতো মারল কয়েকবার সাইক্লপস।

সব রকমে চেষ্টা চালিয়েও করভেটকে থামাতে কিংবা রাস্তা থেকে সরাতে পারল না সাইক্লপস আর ইমপালা। কিছুতেই পাশ কাটিয়ে পেরোতে দিলেন না ওদেরকে মরগান। একবার বাঁ পাশে এগিয়ে প্রায় সমান সমান হয়ে গেল সাইক্লপস। ধাঁ করে এসে ওটাকে বাড়ি মারল করভেট, কয়েক জায়গার রঙ তুলে দিল। তুবড়ে গেল বডির ওসব জায়গা। রাস্তায় এই কাণ্ড চলতে দেখে হতবাক হয়ে গেছে অনেক ড্রাইভার। জোরে জোরে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে।

রবিন বলল, 'করভেট বেচারার স্যালভিজ ইয়ার্ডে যেতে আর দেরি নেই।'

ভুল বলেনি সে। চমৎকার গাড়িটার করুণ চেহারা হয়েছে। দুই পাশে রঙ চটে গেছে অনেক জায়গায়, তুবড়ে গেছে শরীর। বাম্পারের একটা পাশ খুলে ঝুলছে, রাস্তায় ঘষা লেগে আগুনের ফুলকি ছিটাচ্ছে। বসে যাওয়া ফেণ্ডারের চাপে একনাগাড়ে আর্তনাদ করে চলেছে চাকাটা।

ঘষা লেগে রাবার ক্ষয়ে গিয়ে পাতলা হয়ে এল টায়ার, আর সইতে পারল না। বিকট শব্দ করে ফাটল। পাগল হয়ে গেল যেন করভেট। হুঁশজ্ঞান সবকিছু

হারিয়ে রাস্তার গাড়িগুলোকে গুঁতো
মারার জন্যে ছুটে যেতে লাগল এদিক ওদিক। সবাই সরে যেতে চাইছে পাগলা গাড়ির নাকের সামনে থেকে। ব্রেক কষার ফলে একাধিক টায়ারের কর্কশ শব্দ হলো। হর্ন বাজল। রাগত চিৎকার শোনা গেল ড্রাইভারদের। অবশেষে গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন মরগান।

ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইক্লপস। বাঁ পাশে চেপে আসছে ইমপালা। কোণঠাসা করে ফেলল করভেটকে।

এখন আর কিছুই হারানোর নেই মরগানের। দুটো গাড়ির মাঝখান দিয়ে ভয়ানক ভাবে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে তাঁর গাড়ি। থামলেন না এত কিছুর পরেও। দুই সারি গাড়িকে মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে চলে যেতে চাইছেন ডানের রাস্তায়। কিন্তু যেতে দিলেন না ডিকসন।

করভেটের গায়ে প্রায় ঘষা লেগে বেরিয়ে গেল সাইক্লপস। সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল লাল গাড়িটার। থামতে বাধ্য হলেন মরগান। তবে সেটা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই শাঁই শাঁই স্টিয়ারিং কেটে নাক ঘোরাতে শুরু করলেন গাড়ির।

ভ্যান থামতে না থামতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। লাফিয়ে রাস্তায় নামল মিরিনা। ভয় পাচ্ছে বোঝা যায়, তবে ছাড়তেও রাজি নয়। টান দিয়ে গা থেকে খুলে ফেলল আলখেল্লা। বুলফাইটারদের লাল কাপড়ের মত করে ধরল। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল করভেট। সোজা ওটার ডান উইণ্ডশীল্ডে আলখেল্লা ছুঁড়ে মারল সে।

সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না মরগান। মোড় নিতে ব্যর্থ হলেন তিনি। অন্ধের মত রাস্তা হাতড়ে বেড়াতে গিয়ে দড়াম করে লাইটপোস্টে গুঁতো লাগিয়ে বসল করভেট।

পুলিশ যখন হাজির হলো, দেখল, মরগানকে ঘিরে রেখেছে সাতজন লোক। বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে কনভেনশন চীফের, তবে জখম হয়নি কোথাও। হাতে ধরা রয়েছে তখনও ব্যাগটা, যেটাতে রয়েছে ডাকাতির মাল।

আঠারো

ডাকাতির দায়ে জেলে যেতে হলো মরগানকে। তবে কনভেনশন চীফের জন্যে কনভেনশন থেমে থাকল না। চলল শেষ দিন পর্যন্ত, যতদিন চলার কথা। রবিবারে তো প্রচণ্ড ভিড় হলো, সব চেয়ে বেশি ভিড়। সুমাতো কমিকের স্টল খালি, চুটিয়ে ব্যবসা করল অন্য স্টলগুলো।

বেশি ভিড় হলো ম্যাড ডিকসনের দোকানের সামনে, লোক জেনে গেছে একটা অপরাধ চক্রকে ভাঙতে সাহায্য করেছেন তিনি। বিরাট বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে এটা তাঁর জন্যে। বই বিক্রি করে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে বাড়তি লোক নিয়োগের পরেও।

এরই মাঝে এক ফাঁকে কতগুলো কমিক উল্টেপাল্টে দেখলেন, কেনার জন্যে। বললেন, 'আরও ভাল অবস্থায় পেলে ভাল হত। দুটো পাতা দুমড়ে গেছে। মলাটটায় একটু টান লাগলেই খুলে চলে আসবে। আরও যত্ন করে রাখা উচিত ছিল তোমার।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।

'পারতাম,' হেসেই জবাব দিল কিশোর। 'একটা সুন্দরী মেয়ের বিপদ তো, সাহায্য করতেই হলো। এগুলোর দিকে আর নজর দিতে পারিনি।'

বিশ ডলারের তাড়া বের করে নোট গুনতে শুরু করলেন ডিকসন। কয়েকটা বের করে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। 'এই হলো গে কমিকের দাম,' বললেন তিনি। আরও কিছু নোট বের করে সেগুলোর সঙ্গে রেখে বললেন, 'আর এটা হলো গিয়ে বোনাস।'

তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। যা ইনভেস্ট করেছিল ওরা কমিকগুলোতে, তার অনেক গুণ বেশি ফেরত পেয়েছে। প্রায় আটশো ডলার!

টাকাগুলো পকেটে রাখতে রাখতে কিশোর বলল, 'মনে হয় অনেক বেশি দিয়ে ফেললেন, মিস্টার ডিকসন। চাইলে এখনও ফেরত নিতে পারেন। ব্যবসা করতে এসেছি আমরা, গলা কাটতে নয়।'

'কি যে বল! পনেরো মিনিটেই তুলে ফেলব ওই টাকা!' হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল তাঁর। 'আশা করছি তোমারগুলো থেকেই তুলে ফেলব। আর যদি লাভ তেমন না-ই হয়, কুছ পরোয়া নেই। ফ্যান ফানটা বিক্রি করে দিয়ে টাকা তুলব। যেটাতে জাল অটোগ্রাফ রয়েছে। ওটার জন্যে তো এখন পাগল হয়ে আছে সংগ্রাহকরা। পুলিশের কাছ থেকে ফেরত এলে আর একটা মিনিটও আটকাতে পারব না। চাই কি, বলেকয়ে হুফারের একটা আসল সইও করিয়ে নিতে পারি। তাহলে দাম আরও চড়ে যাবে।'

'অতটা আশা কোরো না,' পাশ থেকে বলে উঠল হুফার। কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি তিন গোয়েন্দা কিংবা ডিকসন। 'অন্য কমিকে সই করে দিতে রাজি আছি, ওটাতে নয়।'

'হুফার, প্লীজ,' অনুরোধ করলেন ডিকসন। 'এখন তো আর...'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হুফার। মাথা নেড়ে বলল, 'বেশ, দিতে পারি। তবে লাভের কমিশন দিতে হবে আমাকে।'

'আজব লোক, এই কমিকের মানুষগুলো,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন ডিকসন। 'টাকা ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না। খালি ব্যবসা...'

মাঝখান থেকে কিশোর বলল, 'একমাত্র এডগার ডুফার বাদে। তাকে তো দেখছি না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল হুফার, 'এডের লোভটোভ নেই। গোল্ড রুমে গেলেই পাবে তাকে। রক অ্যাসটারয়েডে ডুবে রয়েছে। প্রোজেকটরটা জায়গামত বসিয়ে ফেলা হয়েছে আবার। গিয়ে দেখগে, লোকের কি ভিড়।'

'লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করেছিল বটে মরগান,' রবিন বলল। 'সব তো

ফাঁস হয়ে গেছে। তার দলের এখন কি হবে? ধান্দাবাজি করে নিশ্চয় অনেক লোকের পকেট মেরেছে?'

'তা তো মেরেইছে,' ডিকসন বললেন। 'ভাঁওতা দিয়ে অনেক লোককে ঠকিয়েছে। টাকা এনেছে অনেক কমিক বিক্রেতা আর সংগ্রাহকের কাছ থেকে। আসল ভেবে সাদা-কালো যে সব কমিক কিনেছিল ওরা, সেগুলোর কথা ভেবে এখন কপাল চাপড়াচ্ছে। ওরা তো ভেবেছিল অনেক কমে অনেক দামি জিনিস পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে ঠকবে, কল্পনাও করতে পারেনি।'

গম্ভীর হয়ে গেল হুফার। 'ঠকিয়েই যেত, যদি বেশি লোভ করতে গিয়ে জাল অটোগ্রাফের শয়তানিটা না করত। তবে একটা ব্যাপার ভালই হয়েছে। ধরা না পড়লে আরও অনেক বেশি ঠকানোর ব্যবস্থা করত। রঙিন কমিক ছেপে তাতে জাল অটোগ্রাফ দিয়ে পাইকারী হারে ঠকাত মানুষকে।'

'ওদেরও দোষ আছে। অনেকেরই,' মুসা বলল। 'শুনেছি, জেনেশুনেই ঠকে ওরা। কয়েকজনকে নাকি গিয়ে বলেছে মরগান, দেখুন তো সইটা জাল কি-না? ওরা দেখেছে, চিনেছেও। বলেনি। জানে, জাল হলে আসলের চেয়ে দাম বেড়ে যাবে। বেশি দাম যদি চেয়ে বসে আবার মরগান, সে জন্যে বলেছে, না আসলই। তারপর তাড়াতাড়ি তার হাতে দামটা ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। ভেবেছে, আহা কি লাভটাই না করলাম!'

'ওদের এই লোভের জন্যেই খেলাটা খেলতে পেরেছে মরগান,' কিশোর বলল। 'অনেককেই দলে টেনেছে সে, এমন কি নীল বোরামকেও। ভুলটা করেছে হুফারকে কনভেনশনে দাওয়াত দিয়ে। অটোগ্রাফ দেয়া ফ্যান ফানটা বিক্রি করে দিয়েছে বোরাম, একথা যদি জানত মরগান তখন, তাহলে ভুলটা আর করত না।'

মাথা ঝাঁকাল হুফার। 'হ্যাঁ, তাহলে বুঝে যেত, ওই অটোগ্রাফ আমার চোখে পড়লেই সব ভেস্তে যাবে।'

'বইটা কেনার জন্যে দেখলে না, কি রকম পাগল হয়ে গিয়েছিল বোরাম!' হাসলেন ডিকসন।

'কিন্তু যেহেতু আপনি বেচলেন না,' কিশোর বলল। 'চুরি করতে বাধ্য হলো মরগান। এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল সে। হুফারকেও বের করে দিতে চেয়েছিল কনভেনশন থেকে। ডাকাতি হলে সবাই ভাববে, হুফারই কাজটা করেছে। মানে মানে তখন কেটে পড়বে সে, এই ছিল মরগানের ধারণা। যত ভাবে সম্ভব, হুফারকে ঠেকাতে চেয়েছিল, যাতে অটোগ্রাফটা তার চোখে না পড়ে। সে বুঝতে পেরেছিল, পড়লে তার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। লাটে উঠতে পারে অবৈধ ব্যবসা।'

'আমি যে এখানে আমার ধান্দায় এসেছি, এটাও জানত না সে,' হুফার বলল।

'ভুল আরও করেছে,' বলল রবিন। 'ডাকাতির পর আমাদের তিনজনকে, বিশেষ করে কিশোরকে উৎসাহিত করেছিল কেসের তদন্ত করার জন্যে। কিশোর পাশা যে কি চিজ সেটা কি আর ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল। এ কাজ করেছে সে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে। এবং সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে।'

'তবে ঘোলা পানি কম খাওয়ায়নি আমাদের,' স্বীকার করল কিশোর। 'মিরিনার ব্যাগে কমিকগুলো রেখে তো মহাদ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে।'

হেসে উঠল মুসা, 'কিন্তু বেচারা জানত না, দ্বিধায় পড়লে যে খেপা বাঘ হয়ে যায় কিশোর পাশা।'

'তোমরাও কি আর কম নাকি? এক ঘুসি খেয়েই তো পাগল হয়ে উঠলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।'

অনেক সময় নষ্ট করেছেন ডিকসন। ওদিকে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাঁর সেলসম্যানেরা। ওদেরকে সাহায্য করতে যেতে চাইলেন তিনি। ছেলেদের বললেন, 'যা-ই বলো, তোমাদের মত গোয়েন্দা আমি আর দেখিনি। সাংঘাতিক ছেলে তোমরা। তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভাল লেগেছে আমার। ইয়ে, পুরানো কমিক পেলেই চলে আসবে আমার দোকানে। দোকান তো চেনোই। কেনার মত হলে কিনে নেব।' এক এক করে তাকালেন ওদের মুখের দিকে। 'তো, এখন যে মাপ করতে হয় আমাকে?'

'নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কমিকগুলো কিনে নেয়ার জন্যে...'

'জলদি ভাগ,' হেসে রসিকতা করল হুফার। 'নইলে আবার তোমাদের অটোগ্রাফ চেয়ে বসবে। বাপরে বাপ, এমন ব্যবসায়ী আমি আর দেখিনি!'

ডিকসন আর হুফারকে 'গুড-বাই' জানিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ভিড় ঠেলে কিছুদূর এগোতেই দেখতে পেল ক্যামেরার ফ্ল্যাশারের ঝিলিক। মিরিনা জরডানের ছবি তুলছে উৎসাহী তরুণেরা।

কিশোরকে দেখেই উজ্জ্বল হলো মিরিনার মুখ। 'কিশোর!'

'উম্...হাই!' কোনমতে বলল কিশোর। এড়িয়েই যেতে চায়। কেস শেষ, মিরিনার ব্যাপারেও তার আগ্রহ শেষ।

কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিল না মিরিনা। এগিয়ে এল। 'আমাকে বিখ্যাত করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা, কিশোর। তবে আমি তো জানি, এ সবের পেছনে আসল ক্রেডিটটা কার। তোমার। নইলে বিখ্যাত হওয়া তো দূরের কথা, অপমানিত হয়ে এই হোটেল থেকে বিদেয় হতে হত আমাকে। তুমি আমাকে চুরির অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে কিডন্যাপ হওয়া থেকে রক্ষা করেছ। মরগানকে ধরার জন্যে ফাঁদটা তুমিই পেতেছ। কিশোর, কি বলব তোমাকে, তোমার মত মানুষ আমি সত্যিই দেখিনি! তুমি একটা লোক বটে!'

প্রমাদ গুনল কিশোর। সবার সামনে এখন প্রেম না নিবেদন করে বসে! তাহলে ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে। কৌতূহলী চোখে অনেকেই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দু'একজন। কিশোর বলল, 'থ্যাংকস, মিরিনা। এখন তো আমার সময় নেই। পরে কথা বলব। তা কোথায় থাক তোমরা?'

'পোর্টল্যাণ্ডে।'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। 'ওরিগনের পোর্টল্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক দূর...'

'অত দূরে যেতে হবে না তোমাকে! আরও কিছুদিন লস অ্যাঞ্জেলেসেই আ
আমরা। আর যদি মডেলিঙের কাজটা পেয়েই যাই, তাহলে তো এখানেই থাকতে
হবে। দেখা করতে পারব...'

ঘিরে ফেলছে ওদেরকে তরুণেরা। আর একটা মুহূর্তও এখানে নয়, ভাব
কিশোর। বলল, 'পরে কথা বলব, ঠিক আছে? চলি, গুড বাই।'

হলের বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বাপরে বাপ! বড়
বেঁচেছি!'

'তুমি যে কি কিশোর, বুঝি না,' রবিন বলল। 'মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে
গেলেই...'

'ওসব কথা থাক।' কিশোরের দিকে হাত বাড়াল মুসা। 'আমার ভা
টাকাটা এখনই দিয়ে দাও। পরে ভুলে যাব।'

'চলো, গাড়িতে গিয়ে দেব,' এলিভেটরের দিকে রওনা হলো কি
'এখানে বের করলে আবার কে কোনদিক দিয়ে ডাকাতি করে নেয়, ঠিক আছে

'আমাদের টাকা নিয়ে হজম করবে এতই সহজ?' বুকে চাপড় দিয়ে বল
মুসা, 'আমরা তিন গোয়েন্দা। মঙ্গল গ্রহে গিয়েও পার পাবে না ব্যাটা। ঠিক ধ
নিয়ে আসব।'

তার কথায় হাসল রবিন আর কিশোর।

—ঃশেষঃ—

ভলিউম-১৮

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা--
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলিসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

Banglapdf.net

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০